নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

লেখক পরিচিতি

ডক্টর রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিভাগের কৃতী অধ্যাপক এবং কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ও নরেন্দ্রপুরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। পদার্থবিদ্যার গবেষক হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিশেষ করে হিন্দু শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদির দর্শন, হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, পাণ্ডিত্য ও উপলব্ধি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা—৩৫.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা—১০.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম—১২.০০
কল্যব্দ ঃ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক হিন্দু কালগণনা—১৫.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি—৫০.০০
মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা—২৫.০০
স্কুলে যৌনশিক্ষা ঃ একটি গভীর চক্রান্ত—৬.০০
এক নজরে ইসলাম—২৫.০০
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত—২.০০
Three Decrees of Islam—১০.০০
ইসলামকে তিন সিদ্ধান্ত (হিন্দী)—১৫.০০
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত (বাংলা)—৫.০০
ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা—১২০.০০

নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন

২

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

লেখকের কথা

জাপানে একটি শিল্প প্রচলিত আছে যার নাম বনসাই এবং এর সাহায্যে একটা বড় গাছের বামন তৈরি করা হয়। একটা ছোট চারাগাছ নেওয়া হয় এবং তার মূল শিকড়টি কেটে দেওয়া হয়। তারপর চারাটিকে বিশেষভাবে তৈরি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ চারাই মারা যায়, তবে কয়েকটা বেঁচে যায়। যেটা বেঁচে যায় সেটা দেখতে আগল গাছটার মত হলেও তার আকার হয় খুবই ছোট। ধরা যাক যে,একটা বট গাছের চারাকে বনসাই করা হল। দেখতে তা বট গাছের মত হলেও তার আকৃতি হবে খুব ছোট, উচ্চতায় এক ফুট বা দেড় ফুট। এ থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, গাছের মূল শিকড়টি কেটে ফেললে যে গাছ তৈরি হয় তা দেখতে সেই গাছের মত হলেও আকৃতিতে তা হয় বামন। কারণ মূল শিকড়টি কেটে ফেলায় তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারেনি।

এই ব্যাপারটা মানুষের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোন মানব গোষ্ঠীকে যদি তার যদি তার পিতৃপুরুষের মূল সংস্কৃতি থেকে পৃথক করে অন্য কোন বিদেশী সংস্কৃতির পরিবেশে বড় করা হয়, তবে তারও স্বাভাবিক বৃদ্ধি হতে পারে না। তারাও ওই বনসাই-এর মতই বান তৈরি হয়। বুদ্ধিবৃত্তি, মানবিকতা ইত্যাদি ব্যাপারে তারও বৃদ্ধি হয় বনসাইর মতনই খর্বাকৃতি বা অপরিপুষ্ট। বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এই মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা প্রায় সকলেই এক কালে হিন্দু ছিলেন। কাজেই তাদের মূল শিকড়টি হল হিন্দু সংস্কৃতি। কিন্তু মুসলমান হবার ফলে আজ তারা আরবের পশুপালক সংস্কৃতি অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এটা একটি গাছের চারাকে বাংলার মাটি থেকে তুলে নিয়ে আরবের মরুভূমিতে রোপণ করার সামিল। এই কারণে মুসলমান সমাজ শিক্ষাদীক্ষা ও সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। অজকের অনেক শিক্ষিত মুসলমানই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। কারণ তা হলে তার গর্দানের বিপদ দেখা দেবে।

ইসলাম যেমন মুসলমানদের মূল শিকড়টি কেটে ফেলে তাদের আরবের অনুগত দেশদ্রোহীতে পরিণত করেছে, বিগত ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট শাসন এই বাংলার হিন্দু যুবকদেরও হিন্দু সংস্কৃতি নামক মূল শিকড়টি কেটে দিয়ে তাদের দেশীয় সমস্ত কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন করে দেশদ্রোহীতে পরিণত করেছে। এই নতুন প্রজন্মের যুবকরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে ভাল কিছুই দেখতে পায় না। তাদের মতে তারা হিন্দু সংহতি হল জাতপাত ও কুসংস্কারে পরিপূর্ণ এক জঘন্য সংস্কৃতি। তারা মনে করে হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম অনেক ভাল, কারণ তা সমাজতান্ত্রিক এবং তাতে জাতপাতের মত ঘৃণা বিদ্বেষ নেই।

একবার একটা টিভি চ্যানেল থেকে আমাকে ডেকে পাঠাল। মার্কসবাদী ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর কিছু সদস্যের সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। কিছুক্ষণ কথা বলার পরে আমি সেই ছেলেগুলোর মধ্যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা দেখে অতিশয় বিস্মিত হলাম। হিন্দু সংহতির প্রতি তাদের মার্কসবাদী সুলভ ঘৃণা ও নিন্দা শুনে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম এবং ভাবতে লাগলাম যে, এরা করবে দেশের মঙ্গল। যারা নিজের দেশ, নিজের ইতিহাস ও ধর্ম সম্পর্কে নিতান্তই অজ্ঞান, তারা দেশের মঙ্গল করবে কেমন করে? বুঝতে অসুবিধা হল না যে, এরা সবাই মূল শিকড় কেটে ফেলা বনসাই। তাই আমি চুপ করে গেলাম এবং তারাই সারাক্ষণ বলতে থাকল। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে থাকলাম— 'হে ভগবান, তুমি এদের মানুষ কর।'

শুধু তাই নয়, এই ঘৃণ্য মার্কসবাদীর দল ভারতের ইতিহাসকে এত বিকৃত করেছে যে, সেই ইতিহাস পড়ে কোন ছাত্রের মনে দেশপ্রেম বা দেশভক্তি জাগরিত হওয়া সম্ভব নয়। এই বিকৃত ইতিহাস বলছে যে, বিদেশী দখলদার মুসলমান শাসকরা ছিল অতিশয় উদার ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি। বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে তাদের উদারতা ছিল অকল্পনীয়। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নামে পরিচিত এক দল ঘৃণ্য ঐতিহাসিক তাদের চক্রান্ত অনুসারে ভারতের ইতিহাসকে নিরন্তর বিকৃত করে চলেছে। দিল্লীর জে এল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় হল এই সব চক্রান্তকারীদের সব থেকে বড় আড্ডা। এইসব ঘৃণ্য ঐতিহাসিকের দল তাদের মূল শিকড়টি কেটে ফেলে যে বনসাই হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। মুসলমান তোষণের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত হয়েই যে তারা এই সব লিখে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যে সব মুসলমান শাসকেরা একদিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল, ঐতিহাসিক নামধারী এই সব মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর দল তাদের প্রজানুরঞ্জক, প্রজাহিতৈষী ও ন্যায় বিচারক বলে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। যে সব মুসলমান শাসকের দল লক্ষ লক্ষ মন্দির ভেঙে মসজিদে রূপান্তরিত করল, এইসব ঘৃণ্য ঐতিহাসিকের দল তাদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করছে। যেই বর্বর মুসলমান শাসকের দল লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে বিদেশের বাজারে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করল, এই ঐতিহাসিকের দল তাদের অত্যন্ত কোমল হৃদয় মহাপ্রাণ শাসক বলে বর্ণনা করেছে। যেই সব দখলদারের দল হিন্দুর সব দুর্গ-প্রাসাদ ও অট্টালিকা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভোগ দখল করল, নিজেরা একখানা ইঁটও গাঁথল না, এই ঘৃণ্য ঐতিহাসিকের দল তাদের মহান স্থাপত্য-রসিক বা স্থপতি বলে বর্ণনা করে চলেছে। এখন শুধু অপেক্ষায় থাকা—কবে এই ভারতবর্ষে একটি সত্যিকারের জাতীয়তবাদী সরকার ক্ষমতায় আসবে, কবে এই মিথ্যার জঞ্জাল পরিষ্কার করে ভারতের সত্য ইতিহাস লেখা হবে।

উপরিউক্ত এই সমস্ত মিথ্যাচারের পিছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে সেই সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যেই লেখা শুরু করি। যদি এই প্রবন্ধ সংকলন পাঠ করে অন্তত একজন হিন্দুর মনেও হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধ জাগ্রত হয় তবেই এই প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করবো।

১লা বৈশাখ, ১৪২০ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

সূচী

ইসলাম পৃষ্ঠা

অগ্রগতির পথে ভারত

মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র

ইসলাম

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঃ কিভাবে হবে সমাধান

১৯৪৭ সালে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে দেশ স্বাধীন হল। দেশমাতৃকার দেহকে তিন টুকরো করার ফলে হিন্দুর মন হল ভারাক্রান্ত। কিন্তু মুসলমানরা হল আনন্দে উদ্বেল। কারণ দেশমাতৃকার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা প্রেম নেই। মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গে আরব হয়েছে তাদের শ্রদ্ধার কেন্দ্র। আর মাতৃভূমি ভারত হয়েছে শত্রুর দেশ—দার-উল-হার্ব। সেই শত্রুর দেশ থেকে খানিকটা খুবলে নিয়ে আল্লার দেশ পাকিস্তানে পরিণত করার চাইতে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে।

এই দেশভাগ নিয়ে অনেক গবেষণা, বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। অনেকের মতে, দেশভাগের জন্য দায়ী হল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি। অন্য অনেকে এজন্য তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের দায়ী করে থাকেন এবং বলেন, ক্ষমতার লোভে তাঁরা তড়িঘড়ি দেশ ভাগ মেনে নিয়েছিলেন। দেশভাগের জন্য কে দায়ী, এই প্রশ্নে দেশের মানুষের মনের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, দেশভাগের জন্য মূলত দায়ী হলে আরবে উদ্ভুত একটি বর্বর তত্ত্ব, যার নাম ইসলাম। এ ব্যাপারে জিন্নাই ঠিক কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, যে দিন প্রথম একজন ভারতবাসী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল সেই দিনই ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের বীজ রোপিত হয়েছিল। আরবের রক্তসিক্ত গ্রন্থ কোরানই সেই বর্বর তত্ত্বের বাহক, যা এই ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করে রক্তক্ষয়ী এক ভ্রাতৃবিবাদের সূত্রপাত করে। যার অন্তিম পরিণতি হল দেশজননীর অঙ্গচ্ছেদ। বিবাদ আজও বিদ্যমান রয়েছে। কারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত ভারতকে আল্লার দেশ দার-উল-ইসলাম-এ পরিণত করা। জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে খ্যাত মৌলানা আবুল কালাম আজাদও এই ইসলামী ধ্যান ধারণার বাইরে ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, "ভারতের মতো একটি দেশ, যা এককালে মুসলমান রাজত্বের অধীন ছিল, তাকে আবার জয় করে ইসলামী দেশ বানাতে হবে।" ভারতকে জয় করে দার-উল-ইসলাম বানানোর জন্যই যে পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র ও দূরপাল্লার মিশাইল মজুদ করছে তা বলাই বাহুল্য।

গত ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর 'টাইম' পত্রিকায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ও পাকিস্তানী পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খানের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, যাতে উপরিউক্ত

মুসলিম মানসিকতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে শ্রীফার্নাণ্ডেজ বলেন, "একজন পাকিস্তানীর মধ্যে আমি আমাদেরই রক্ত মাংস দেখতে পাই। আমরা পৃথক দুটি রাষ্ট্র বটে। কিন্তু মানুষ সব এক।" ওই একই প্রশ্ন আব্দুল কাদের খানকে করলে তিনি বলেন, "কোনও কোনও ব্যাপারে মিল থাকলেও মূলত আমরা ওদের থেকে আলাদা। আমরা মুসলমান, ওরা হিন্দু। আমরা গরু খাই ওরা গরুকে পুজো করে। আমরা এক দেশে বাস করতাম। এক ভাষায় কথা বলতাম, তাতে প্রমাণ হয় না আমরা অভিন্ন।"

উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্যেকার প্রভেদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমোক্ত মন্তব্য ঐক্যবন্ধনে বাঁধার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু দ্বিতীয় মন্তব্য ঐক্যবন্ধনের সমস্ত সূত্রকে ছিন্ন করে বিচ্ছিন্ন হবার কাজে উৎসাহ যোগায়। এটাই হল বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমান মানসিকতা। আরবের বর্বর গ্রন্থ ও পশুপালক বর্বর আরব্য সংস্কৃতির প্রভাবেই যে আমাদের মধ্যে কিছু দেশবাসী ভাইয়ের মনে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আরবের সেই বর্বর গ্রন্থ গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দে অনুরক্ত ভারতের কিছু মানুষকে আরবের বর্বর দেবতার প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছে এবং সেই বর্বর দেবতার নির্দেশে তারা ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাচ্ছে। মা বোনকে অত্যাচার করছে, দেশমাতৃকাকে খণ্ড খণ্ড করে এবং জন্মভূমিকে জয় করার পরিকল্পনা করছে। তার চেয়েও বড় কথা হল, আরবের বর্বর ও রক্তপিপাসু গ্রন্থ ভাইয়ের মনকে ভাইয়ের প্রতি এতখানি বিষাক্ত করে তুলেছে যে, সেই বিদ্বেষ ও ঘৃণা আজ পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলাফল হবে মারাত্মক এবং এর দ্বারা হিন্দু বা মুসলমান, কারোই মঙ্গল হবে না।

কিন্তু সুখের কথা হল, বর্তমানে কিছু কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইসলামের মধ্যে ধীরে ধীরে আরবের পশুপালক বর্বর সংস্কৃতিকে অনুসরণ করার বিপদ বুঝতে পারছেন। এবং এই বিষয় সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন যে, বর্বর আরব্য সংস্কৃতি অনুসরণ করার ফলেই মুসলমানরা সভ্যতার পথে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এটা শুধু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যাপার নয়, বিশ্বে সমগ্র মুসলিম সমাজই শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা সাহিত্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তারা চোদ্দশ বছরের পুরানো এক বর্বর তত্ত্বের দ্বারা পরাজিত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীজাফর আদম হলেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক। এই সব ব্যাপারে বিশেষ করে দেশ ভাগের বেদনা থেকে তিনি লিখেছেন "যদি ৫০ বছর সময়ের মধ্যেও পাকিস্তানকে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তোলা না যায় তবে তা (অর্থাৎ পাকিস্তান) সৃষ্টি করারই বা কি প্রয়োজন ছিল?" তিনি আরও লিখেছেন, "যদি বিশুদ্ধ ইসলামী ব্যবস্থার

প্রবর্তন না-ই করা যায়, তবে কেন আমরা পূর্বের অখণ্ড ভারতে ফিরে যাবো না? আজও সীমান্তের ওপার থেকে ভেসে আসছে হৃদয় উদ্বেল করা, অন্তরাত্মার শিহরণ জাগানো ঐক্য বন্ধনের উদাত্ত আহ্বান।"

শ্রীজাফর আদম আরও লিখেছেন, "জিন্নার সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। তাই সেখানে উত্তাপ (অর্থাৎ হানাহানি মারামারি) লেগেই আছে।" মহান দেশ সেই ভারতবর্ষ হল ঈশ্বরের এক আশীর্বাদ। সেই দেশ স্বভাবতই উর্বর ও সৃষ্টিশীল। এই দেশের কোলে বহু ধর্ম ও মতবাদ এক সঙ্গে অবস্থান করছে। যেই দেশে বহুরকম বিরোধের মধ্যে বিরাজ করছে এক মহান ঐক্য যা আমাদের এই মুমালকৎ-ই-খুদাদ-এ অনুপস্থিত।"

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, শ্রীজাফর আদম যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্নই দেখেছেন ঋষি অরবিন্দ, পরমপূজ্য ডাক্তারজী ও পূজনীয় গুরুজী। সেই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই দেশের হিন্দুর মঙ্গল এবং মুসলমানের মঙ্গল। কিন্তু কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের পক্ষে কল্যাণকারী সেই অখণ্ড ভারত? প্রথমেই দূর করতে হবে, বর্জন করতে হবে ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিকারী আরবের তত্ত্ব ও গ্রন্থ। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকারী যে বৈদিক সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, এই দেশের প্রতিটি মানুষের মাতৃস্বরূপা। এই মায়ের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হবে সবাইকে। আরবের বর্বর দেবতাকে পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নিতে হবে আজকের বিকৃত মস্তিষ্ক সকল মুসলমান ভাইকে। আরবের পশুপালক বর্বর সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে তাদের ফিরে আসতে হবে জননী স্বরূপা গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী ও গোবিন্দের সংস্কৃতিতে। এটাই একমাত্র পথ। এ পথেই হবে ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলন, স্থাপিত হবে গরিমাময় অখণ্ড ভারত। সমস্ত মহাপুরুষের স্বপ্নের সেই অখণ্ড ভারত। মুসলমান সাংবাদিক জাফর আদমের স্বপ্নের সেই অখণ্ড ভারত। চিরকালের মতো দূরীভূত হবে ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস।

প্যালেস্তানী জিহাদীদের আত্মঘাতী মানববোমা আক্রমণ ও মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট

বিগত ১৯৯৩ সালের ১৬ এপ্রিলের ঘটনা। প্যালেস্তানী সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হামাস-এর আত্মঘাতী (ফিদায়িন) জিহাদী ২২ বছরের সাহের তামম নবুলসি মানববোমা আক্রমণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিল। কোমরে বোমা দিয়ে সাজানো বেল্ট বেঁধে একটা মিৎসুবিশি ভ্যানে করে রওনা দিল। পুলিশের সন্দেহ এড়াতে ভ্যানে তুলল রান্নার গ্যাসের কতগুলি খালি সিলিণ্ডার, যেন কোন গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী।

গাড়ি নিয়ে সে চলে গেল ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের ব্যস্ত এক রেস্তোরাঁর সামনে। দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বাসের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিল তার গাড়ি এবং ঘটালো বিস্ফোরক। নবুলসি ও একজন ইজরাইলি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আহত হল মোট ৮ জন। প্রথমে পুলিশের পক্ষে বোঝা সম্ভব হল না যে এটা একটা আত্মঘাতী হামলা। ভাবল নবুলসি বোমা নিয়ে যাচ্ছিল এবং আকস্মিকভাবে তা ফেটে গিয়েছে।

প্যালেস্তানীদের আত্মঘাতী মানব-বোমা হামলার এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। এরপর এই বছরের (২০০২) ৫ এপ্রিলের মধ্যে তারা মোট ১০৫টি মানববোমার হামলা চালিয়ছে এবং ৩৩৯ জন ইজরাইলির মৃত্যু ঘটিয়েছে। সব থেকে বেশি ৩৬টি হামলা চালিয়েছে গত বছর এবং বর্তমান বছরের ২৫ জানুয়ারির পর থেকে এপর্যন্ত তারা ৩২টি হামলা চালিয়েছে।

শান্তি প্রচেষ্টার জন্য আগত মার্কিন বিদেশ সচিব কলিন পাওয়েল গত ১২ এপ্রিল যখন তেল আবিব-এ ইজরাইলি প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শ্যারন-এর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করছিলেন, তখনই জেরুজালেমের বুকে ঘটল ভয়ঙ্কর এক মানব-বোমা আক্রমণ। জেরুজালেমের মাহানে ইয়েহুদা এলাকার ব্যস্ত এক বাজারে ঘটল সেই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ ঘটালো একটি মেয়ে ফিদায়িন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুসারে বোমা বহনকারী মেয়েটির দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় প্রায় ৫০ জন। এর মধ্যে অনেকের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক।

প্যালেস্তানী প্রেসিডেন্ট ইয়াসের আরাফতের দল 'প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' (পি এল ও)-র সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের দায়িত্ব স্বীকার করেছে। এই আক্রমণের সমর্থনে আরাফতের এক মুখপাত্র বলেন, 'এটা ছিল ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে ইজরাইলী আগ্রাসনের জবাব।'

শুধু রাষ্ট্রপতি আরাফতই নন, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রপ্রধানরাও এই আত্মঘাতী হামলাকে সমর্থন করে চলেছেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বাসার আল-আসাদ একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেন, "যে সব প্যালেস্তানী আত্মঘাতী হামলা চালাচ্ছে, তারা সন্ত্রাসবাদী নয়, তারা হল শহীদ এবং তারা ইজরাইলী আগ্রাসনের জবাব দিচ্ছে মাত্র।" আসাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লেবাননের রাষ্ট্রপতি রফিক হারারিও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, "ইজরাইলীরা তাঁদের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে রয়েছে এবং এর ফলেই প্যালেস্তানীরা মানব-বোমা আক্রমণের মতো সন্ত্রাসবাদী পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে।"

সাধারণতঃ ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবক যুবতীরাই আত্মঘাতী হামলার মধ্যে দিয়ে প্রাণ দিতে এগিয়ে আসে। গত ২০০১ সাল পর্যন্ত ছেলেরাই আত্মঘাতী হত। এই বছর ২৭ জানুয়ারি ওয়াফা ইদ্রিস নামে ২৭ বছরের এই যুবতী সর্বপ্রথম এই কাজে এগিয়ে আসে। এরপর গত ২৯ মার্চ আয়াত আখরাস নামে ১৮ বছরের এক যুবতী আত্মঘাতী হয়। একজন যুবতীই যে গত ১২ এপ্রিল জেরুজালেমে হামলা চালায়, তা আগেই বলা হয়েছে।

আমাদের দেশের অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে চলেছেন যে, গরীব ঘরের অশিক্ষিত ও দুঃস্থ ছেলে-মেয়েরাই এইসব সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হয়। গত বছর ৯ আগস্ট ইজ্জাদিন মাসরি নামে ২৩ বছরের এক যুবক জেরুজালেমের সাবারো পিজ্জেরা-য় আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ১৫ জন ইজরাইলী নাগরিককে হত্যা করে এবং বহু লোককে আহত করে। এই ইজ্জাদিন মাসরি ছিল ধনী এক হোটেল মালিকের ছেলে। তেমনি, উপরিউক্ত ১৮ বছরের যুবতী আয়াত আখরাস ছিল বি এ ক্লাসের ছাত্রী। আর কয়েক মাস পরেই ছিল তার ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার পর তার বিয়েও ঠিক হয়েছিল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অতিশয় মেধাবী এবং উচ্চ বংশের অনেক সম্ভাবনাময় ছেলে-মেয়েরাও আজ আত্মঘাতী হামলার কাজে এগিয়ে আসছে। মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ জেরাল্ড পোস্ট প্যালেস্তানী আত্মঘাতীদের নিয়ে কিছুকাল ধরে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, "প্রথম দিকে অল্প কিছু যুবকের মধ্যেই আত্মঘাতী হবার প্রবণতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটা খুব ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। এবং বর্তমানে মেয়েরাও এগিয়ে আসছে।" গত বছর গাজা ভূখণ্ডের প্যালেস্তানীদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় যে, ৭৮ শতাংশ মানুষ আত্মঘাতী হামলা চালানোর পক্ষে মত দেয়। পক্ষান্তরে শান্তি আলোচনার পক্ষে মত দেয় ২০ শতাংশ মানুষ। প্যালেস্তাইনের খবরের কাগজগুলোতে আত্মঘাতী হামলায় মৃত জঙ্গীদের শহীদের সম্মান দিয়ে ছবি সহ প্রথম পাতায় খবর ছাপা হয়। এর ফলেও অনেক অল্প বয়সী ছেলে-মেয়ে আত্মঘাতী হামলা করতে এগিয়ে আসে বলে শ্রীপোস্ট মনে করেন। আত্মঘাতী হামলার মধ্যে দিয়ে আত্মবলি দেওয়া প্যালেস্তাইনে আজ এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে, বাচ্চাদের মধ্যে শদীদ শহীদ নামে একটা খেলা চালু হয়েছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ফিলাডেলফিয়া'র

'মিডল্ ইস্ট ফোরাম'-এর অধিকর্তা ড্যানিয়েল পাইপস্ বলেন, "এখানকার আত্মঘাতী কারখানা আজ পরিপূর্ণ। বাচ্চাদের শহীদ শহীদ খেলার মধ্যে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো যেন পূর্ণতা লাভ করেছে।"

১৯৯৩ সালে প্রথম আত্মঘাতী হামলার সময় 'হামাস' ও 'ইসলামিক জিহাদ'-এর মতো সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলোই জীবন দিতে প্রস্তুত ফিদানিয়ন যুবকদের খুঁজে বার করত। তারপর তাদের দেওয়া হত কট্টর মৌলবাদী ধর্মীয় শিক্ষা ও সামরিক প্রশিক্ষণ। কিন্তু 'অসলো শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হবার পর জিহাদের উন্মাদনা অনেক কমে গেল। বেশির ভাগ প্যালেস্তানী শান্তিপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে পৃথক প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের সমর্থকে পরিণত হল।

কিন্তু কট্টর মৌলবাদী মোল্লারা প্রচার করতে লাগল যে, ইজরাইলের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের আশা দুরাশা মাত্র এবং জিহাদ চালিয়ে যাওয়াই মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। তারা প্রচার করতে লাগল যে, জিহাদে অংশগ্রহণ করে যার মৃত্যু হবে, আল্লা তাকে সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতে (ইসলামী স্বর্গ) নিয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, প্রাণ বিসর্জন দেবার পুরস্কার হিসাবে আল্লা সেই শহীদের ৭০ জন আত্মীয়কেও সসম্মানে জান্নাতে নিয়ে যাবার অধিকার পাবে। জান্নাতে আল্লা তাদের যে পুরস্কার দেবেন তার কাছে পার্থিব সুখ সুবিধা নিতান্তই তুচ্ছ। সেখানে তারা হাজার হাজার সুন্দরী স্বর্গীয় রমণী বা হুরী পাবে, যারা চিরকাল যুবতীই থাকবে এবং অনাদি কাল ধরে জিহাদীরা সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ করবে।

ইতিমধ্যে ২০০০ সালের মাঝামাঝি শান্তি চুক্তি পরিত্যক্ত হল। ফলে জিহাদের আহ্বান আবার প্রবল হল এবং যুবক প্যালেস্তানীরা দলে দলে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোতে যোগ দিতে শুরু করল। তাই 'হামাস'-এর এক বড় কর্তা আবদুল আজিজ রান্তিসি সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেন, "আজ আর আগের মতো তদবির করার দরকার হয় না। একজন শহীদের শবযাত্রা দেখলে ১০০ জন যুবকের মনে জিহাদের আগুন জ্বলে ওঠে এবং আমাদের দলে যোগ দিতে আসে।"

আগে শুধু 'হামাস' ও 'ইসলামিক জিহাদ' এই দুই গোষ্ঠীর জিহাদীরাই আত্মঘাতী হামলায় যোগ দিত। কিন্তু আজ আরাফতের 'পি এল ও'-ও মানব-বোমা হামলায় নেমে পড়েছে। পি এল ও থেকে প্রথমে 'আল ফাতা' গঠিত হয়েছে এবং ক্রমে এই আল ফাতা থেকে গঠিত হয়েছে আরও দুটো জঙ্গী গোষ্ঠী—'ইন্তেফাদে' এবং 'আল আক্সা শহীদ ব্রিগেড'। সাম্প্রতিক কালে যতগুলো মানব-বোমার হামলা হয়েছে, তার মধ্যে কম করে ১০টি হামলা করেছে এই 'ইন্তেফাদে' ও 'আল আক্সা শহীদ ব্রিগেড'-এর জিহাদীরা। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ইজরাইলের 'হার্জিলিয়া সেন্টার'-এর বিজ্ঞানী এহুদ স্প্রিন্জাক বলেন, "প্যালেস্তানীদের মধ্যে আত্মঘাতী আক্রমণের উত্তেজনা আজ খুবই প্রবল। আগে এ ব্যাপারে আরাফত নিজে কিছুটা রাশ টানবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আজ তিনি স্বয়ং জিহাদীদের উৎসাহ দিচ্ছেন।"

এই আত্মঘাতী জিহাদীরা তাদের বোমায় যে বিস্ফোরক ব্যবহার করে তার নাম ট্রাই-অ্যাসিটোন-ট্রাই-পারঅক্সাইড। খুব সহজেই এই বিস্ফোরক তৈরি করা চলে। প্রথমে একটা পাত্রে জল নেওয়া হয় এবং তার মধ্যে অ্যাসিটোন এবং সোডিয়াম (বা পটাসিয়াম) ফসফেট গুলে দেওয়া হয়। জল শুকিয়ে গেলে যে শক্ত পদার্থ পড়ে থাকে তাকে মিক্সিতে গুঁড়িয়ে নিলে বিস্ফোরক তৈরি হয়ে যায়। এবার সেই বিস্ফোরককে ছোট ছোট লোহার পাইপে ভরে বোমা তৈরি করা হয়।

আত্মঘাতী জিহাদীর পরিবারকে 'হামাস' প্রতি মাসে ৩০০ থেকে ৬০০ ডলার (১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা) পেনসন দেয়। বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র ও সংস্থা থেকে অনুদান হিসাবে হামাস এই অর্থ যোগাড় করে। শহীদ জিহাদীর পরিবারকে ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেন এককালীন অর্থ সাহায্য করে থাকেন। আগে এর পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ডলার (৫ লক্ষ টাকা) এবং সম্প্রতি তা বাড়িয়ে ২০ হাজার ডলার (১০ লক্ষ টাকা) করা হয়েছে।

আত্মঘাতী মানব-বোমা দিয়ে আক্রমণ ইসলাম সম্মত কিনা, তা নিয়ে মোল্লা মৌলবাদীদে মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকের মত হল, নবী মহম্মত যেহেতু আত্মহত্যার নিন্দা করে গিয়েছেন, তাই মানব-বোমা দিয়ে আক্রমণ ইসলাম সম্মত নয়। অন্য পক্ষের যুক্তি হল, যে আত্মহত্যাকে নবী নিন্দা করে গিয়েছেন তা হল জীবন থেকে পলায়ন। কিন্তু আত্মঘাতী ফিদাইনরা জীবন থেকে পলায়ন করছে না। বরং তারা পরবর্তী প্রজন্মের জীবনের ব্যবস্থা করছে। সব থেকে বড় কথা হল, জিহাদ করে কাফের নিধন করা সব মুসলমানেরই পবিত্র কর্তব্য, তা যে পদ্ধতিতেই হোক। তাই আত্মঘাতী আক্রমণ অবশ্যই ইসলাম সম্মত।

আত্মঘাতী মানব-বোমা দিয়ে ইজরাইলিদের হত্যা করার সপক্ষে বলতে গিয়ে 'হামাস'-এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা মুসা আবু মারজুক বলেন, "ইজরাইলের রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সেনাবাহিনী। কিন্তু প্যালেস্তানীদের তা নেই। ওদের না আছে ট্যাঙ্ক, না আছে কামান, না আছে বোমারু বিমান। তাদের আছে কিছু রাইফেল, কিছু মেশিনগান, আর আছে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত কিছু যুবক। তাই সেনা বাহিনীর সঙ্গে সেনা বাহিনীর মতো যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইজরাইলিদের শিক্ষা দেবার জন্য ও শাস্তি দেবার জন্য তাদের তাই বেছে নিতে হয়েছে এই আত্মঘাতী ফিদায়িন আক্রমণ।

পক্ষান্তরে, এই আত্মঘাতী মানব-বোমা আক্রমণের জন্যই আজ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট চরমে পৌঁছেছে এবং এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বন্ধ না হলে সেখানে শান্তি ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে গত ১২ এপ্রিলের আক্রমণকে লক্ষ্য করে ইজরাইল বলেছে, "শান্তি প্রচেষ্টাকে তোয়াক্কা না করে প্যালেস্তানীরা একের পর এক মানব-বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা সন্ত্রাস ও মৃত্যুর বার্তাই বহন করে আনছে।" কলিন পাওয়েলের বর্তমান শান্তি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার ফলে আজকের মধ্য-প্রাচ্য সঙ্কট যে অচিরেই বিশ্ব সঙ্কটে

পরিণতি লাভ করবে না, সে সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে এই পরিণামের জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাস যে প্যালেস্তানীদের সন্ত্রাসকেই দায়ী করবে তা বলাই বাহুল্য।

একটি সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটানো ঠিক হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, সব থেকে বড় প্যালেস্টানী সন্ত্রাসবাদী সংস্থার নাম হল হামাস। শেখ হাসান ইউসেফ হল হামাসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। গত ২০১০ সালে তার ছেলে মোসাব হাসান ইউসেফ আমেরিকায় পালিয়ে আসে এবং ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মোসাব হাসান ইংরেজিতে একটা আত্মজীবনী লিখেছে যার নাম *সন অব হামাস* বা হামাসের পুত্র। বর্তমানে সে ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। এক সময় মোসাব ১০ বছর ধরে (১৯৯৭ থেকে ২০০৭) ইসরাইলের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করেছে। বর্তমানে সে ইসলামের একজন নামকরা সমালোচক। মোসাব মনে করে যে, ইসলাম ভিতর থেকে দুর্বল হচ্ছে এবং ভেঙে পড়ছে।

ইসলামের পর্দাপ্রথা ঃ নারী জাতিকে অনগ্রসর করে রাখার এক চক্রান্ত মাত্র

গত ১লা জানুয়ারী (২০০৮), মঙ্গলবার আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরের উপকণ্ঠে লাস কলিনাস নামক স্থানের বাসিন্দা ইয়াসের আব্দুল সৈয়দ নামক একজন মিশরীয় ট্যাক্সি চালক তার দুই মেয়েকে তার নিজের ট্যাক্সির মধ্যে গুলি করে হত্যা করে। বড় মেয়ের নাম আমিনা, বয়স ১৮ বছর ও ছোট মেয়ের নাম সারা, বয়স ১৭ বছর। মেয়েদের অপরাধ হল, তারা ইসলামী পোশাক বা বোরখা পরতে অস্বীকার করেছিল। বাবা ইয়াসের দুই মেয়ের মৃতদেহ ট্যাক্সির মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

এর প্রায় মাসখানেক আগে, ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর, কানাডার টরন্টো শহরের ৫৭ বছর বয়সী পাকিস্তানী ট্যাক্সি চালক, মহম্মদ পরভেজ, তার ১৬ বছরের কন্যা আক্সাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। আক্সাও ঐ একই অপরাধে অপরাধী ছিল। অর্থাৎ ইসলামী পোশাক ও বোরখা পরতে অস্বীকার করেছিল এবং কানাডার অন্যান্য মেয়েদের মত বাঁচতে চেয়েছিল। খবরে প্রকাশ যে, টরন্টো শহরতলীর যেখানে মহম্মদ পরভেজের পরিবার বাস করতো, সেখানে বহু পাকিস্তানী বসবাস করে। ওই সব পাকিস্তানী মুসলমানরাই মেয়ে আক্সার ব্যাপারে তার বাবার কাছে অভিযোগ করেছিল। আক্সা যেই স্কুলে পড়ত, সেই অ্যাপলউড হাইট সেকেন্ডারী স্কুল-এর ছাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে, অনেক দিন ধরেই আক্সা ও তার দাদা ও বাবার মধ্যে বোরখা পরা নিয়ে বিবাদ বিতর্ক চলছিল। আক্সার এক সহপাঠী অ্যাসলি গারবেট পুলিশকে জানায় যে, আক্সা তার বাবা ও দাদার ভয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গত ১৯শে ডিসেম্বর ইরানের এক উচ্চপদস্থ মৌলভী, ইরানের উরুমিয়া শহরের জাম-এ-মসজিদের ইমাম, গুলাম রেজা হাসনি সাংবাদিকদের বলে যে, ইরানের যে সমস্ত মেয়েরা বোরখা পরার ব্যাপারে অনিচ্ছুক, তাদের একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু। গত ২১শে ডিসেম্বর জুম্মার নামাজের পরে সে আরও বলে, যে সব মেয়েরা বোরখাকে ও তাদের স্বামীকে সম্মান করে না, তারা সবাই মৃত্যু দন্ডের উপযুক্ত। "আমি বুঝতে পারি না আজ ইসলামী বিপ্লবের ২৮ বছর পরেও যে সব মেয়েরা বোরখা (বা

হিজাব) কে সম্মান করে না, তারা জীবিত আছে কেমন করে?" এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, যখন আফগানিস্তানে তালিবানদের রাজত্ব চলছিল, তখন কোন মেয়ে ইসলামী পোশাক ও বোরখাকে অমান্য করলে তাদের প্রকাশ্য স্থানে মাথায় রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে মারা হত।

এতদিন পর্যন্ত তুরস্কই ছিল এক মাত্র ইসলামি দেশ যেখানে মেয়েদের দেহ বোরখা দিয়ে আবৃত করা আইনত নিষিদ্ধ ছিল। তুরস্কের বিখ্যাত উদারপন্থী নেতা কামাল পাশা এই আইন প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী তোয়াপ এর্দোগন তার এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলেন যে, তার সরকার খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে সংবিধানের একটি সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে পেশ করতে চলেছে। অর্থাৎ, সেখানেও মেয়েদের পর্দা দিয়ে আবৃত করাকে আইন সঙ্গত করা হবে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান হল, তুরস্কের বর্তমান রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা গুল হলেন অত্যন্ত কট্টরপন্থী মুসলমান এবং তার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বোরখা সহ আরও কিছু কিছু বিধিনিষেধ, যা এতদিন দেশে বে-আইনী ছিল, তা সবই চালু করা হবে। তুরস্কের সরকার বিরোধী দলের নেতাদের মত হল, এ সবের ফলে দেশের এত দিনকার ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য ম্লান হবে।

গত ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বিখ্যতা চিত্রাভিনেত্রী শাবানা আজমী লন্ডনের বৃটিশ পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক গান্ধী শান্তি পুরস্কার (International Gandhi Peace Prize) গ্রহণ করতে। হাউস অফ কমন্সে পুরস্কার গ্রহণ করার পর শ্রীমতী আজমী শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "কোরানে কোথাও বলা হয়নি যে বোরখা দিয়ে মেয়েদের মুখমন্ডলও ঢাকতে হবে। কোরান বলেছে যে, মেয়েরা এমনভাবে পোষাক পরিচ্ছদ পরবে যাতে অসভ্যতা প্রকাশ না পায়"। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য দেশের মোল্লা মৌলভীদের ক্ষিপ্ত করে তুলল। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অমুসলমান বলে ঘোষণা করলেন। দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আহম্মদ বুখারী বললেন, "কোরান ব্যাখ্যা করার অধিকার শাবানা আজমীকে কে দিয়েছে? ওর কাজ হল নাচ গান করা। মুসলীম মহিলাদের বিভ্রান্ত করার কোন অধিকার ওর নেই"। সৈয়দ বুখারী আরও বললেন, "শাবানা আজমী আর মুসলমান নেই এবং সে একজন চিত্তবিনোদনকারী মাত্র। সে কখনোই মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। কোরাণের সুরা (অধ্যায়) ১৮ ও সুরা ২২ এ পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, মহিলাদের বোরখা দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে"।

বৃটেনে মুসলমান মেয়েদের বোরখা পরা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় গত অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে। বৃটেনের পশ্চিম ইয়র্ক শায়ারের ডিউসবেরিতে অবস্থিত হেডফিলড চার্চ অফ ইংল্যান্ড জুনিয়র স্কুলে শিক্ষিকার চাকুরী করতেন আয়েশা আজমী নামে এক জন মুসলমন মহিলা। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে অনুরোধ করে যে, ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি যেন

বোরখা দিয়ে মুখ ঢেকে না রাখেন। কারণ হিসাবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, মুখমন্ড ঢাকা থাকলে ছাত্রছাত্রীরা তার মুখের ভাবভঙ্গি বুঝতে পারে না, ফলে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। কিন্তু শ্রীমতী আয়েশা আজমী কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে যথারীতি মুখমন্ডল বোরখা দিয়ে ঢেকে ক্লাসে যান। ফলে কর্তৃপক্ষ তাকে চাকুরী থেকে বহিষ্কার করে। অতঃপর তাঁর ধর্মের বিশ্বাসে আঘাত করা হয়েছে, তাঁর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণ করা হয়েছে, তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছে এবং তাঁকে অন্যায়ের শিকারে পরিণত করা হয়েছে, ইত্যাদি অভিযোগ এনে আয়েশা আজমী আদালতে মামলা করেন। গত অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখে আদালত তার রায় জানায়। আদালত তাঁর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করার অভিযোগটি স্বীকার করে এবং সে জন্য তাঁকে ১০০০ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেওার কথা ঘোষণা করে এবং বাকী অভিযোগগুলি খারিজ করে দেয়।

ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী শ্রী টনি ব্লেয়ার নিজেকে এই বোরখা বিতর্কের জড়িয়ে ফেলেন। গত ১৭ই অক্টোবর তিনি বলেন যে, বোরখা হল সমাজের ভেদাভেদ ও বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন। চট করে এই বিষয়টার সমাধান সম্ভব নয় এবং এ জন্য দেশব্যাপী একটি বিতর্কের প্রয়োজন। তবে এটা বলা চলে যে, মুসলমান জনগণকে বৃটিশ জনগণের মধ্যে একাত্ম করে নেবার পথে বোরখা হল একটি বাধা। ঐ দিন তাঁর মাসিক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "ফ্রান্স ও জার্মানীর মত বৃটেনও বিবিধ সংস্কৃতিতে (Multi Culture) বিশ্বাসী। তাই এটা পরীক্ষা করার সময় এসেছে যে, এই বহু সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে সক্ষম। বোরখা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "বোরখা হল বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। কোন সমাজের মধ্যে এ রকম ভেদাভেদ খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। আমরা এই দৃষ্টিকটু ভেদাভেদকে দূর করে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই।" প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই মত অস্বীকার করেন যে, ইরাকের যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের মধ্যে কট্টর সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং বলেন যে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কাজকর্ম বৃদ্ধি করার ব্যাপারে এটাকে একটা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। এই সব কথাবার্তা যখন চলছে, তখন বৃটেনের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী জ্যাক স্ট্র-র একটি মন্তব্য আবার বাজার গরম করে তোলে। তিনি বলেন যে মুসলমান মহিলাদেরউচিত সম্পূর্ণভাবে বোরখা পরিত্যাগ করা।

এবার আরবের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বোরখার প্রচলন রাখা বা না রাখা বিচার করা চলতে পারে। প্রকৃত সত্য হল, প্রাক-ইসলামী আরবে পর্দা বা বোরখার প্রচলন ছিল না। নবী মহম্মদ হিজরৎ করে মদিনায় আসার পর মদিনা শহরে পর্দার প্রচলন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে ইসলাম সম্বন্ধ দু-চার কথা বলে নেওয়া সঙ্গত হবে। আরবী শব্দ ইসলামের অর্থ হল নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ, শান্তি নয়। যারা আল্লার কোরান ও আল্লার নবী মহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা হবে মুসলমান বা মোমেন। আর যারা তা করবে না তারা হল অবিশ্বাসী কাফের।

ইসলাম তাই সমগ্র মানব সমাজকে মুসলমান ও কাফের সরাসরি এই দুভাগে ভাগ করে। কোরান মতে এই কাফেররা হল অত্যন্ত ঘৃণ্য, পশুরও অধম। কোরানের প্রায় প্রতি পাতাতেই এই কাফেরদের হত্যা করার এবং তাদের মহিলাদের ওপর যে কোন ধরণের অত্যাচার করার কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, মহম্মদ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হিজরত করে যখন মদিনায় এলেন তখন সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু নবী মহম্মদ হয়ে বসলেন একাধারে মদিনার প্রধান শাসক, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান বিচারক। এত ক্ষমতা হাতে পেয়ে নবী গায়ের জোরে, তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তর করিয়ে মুসমানের সংখ্যা বাড়াতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর অনুগত চ্যালাচামুন্ডাদের নিয়ে একটি গুন্ডা বাহিনী তৈরি করে ফেললেন এবং সেই গুন্ডারা মদিনার লোকজনের ওপর শুরু করে দিল অকথ্য অত্যাচার।

কিন্তু মুশকিল হল এই যে, দেখা গেল ভুল করে কোন মুসলমানের ওপরেই অত্যাচার করা হয়ে গিয়েছে। তখন প্রয়োজন দেখা দিল মুসলমান ও কাফেরদের যাতে চিনতে সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা করা। অন্যান্য লোকদের মত আরবের লোকেরাও তখন দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখত। মহম্মদ নিয়ম করে দিলেন যে, মুসলমানরা গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখবে। এবং এ ভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল। কিন্তু সমস্যা হল মেয়েদের নিয়ে। এই সময় মহম্মদের চ্যালা ও জামাই উমর বুদ্ধি দিল যে, মুসলমান মেয়েরা চাদরের সাহায্যে ঘোমটা দিয়ে রাস্তায় বেরোলে সমস্যার সমাধন হবে। আল্লাও সময় নষ্ট না করে উমেরর সমর্থনে কোরানের বাণী অবতীর্ণ করলেন, "হে নবী,তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও অন্যান্য বিশ্বাসী রমণীগণকে বল—তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখে ওপর টেনে দেয়। এতে তাদের চিনতে সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না, আল্লা ক্ষমশীল ও দয়াময়।" (কোরান-সুরা ৩৩; আয়াৎ ৫৯)।

কোরানের উপরিউক্ত আয়াৎ থেকে এটা পরিষ্কার যে, পর্দা প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য হল কাফের মহিলাদের থেকে মুসলমান মহিলাদের চিহ্নিত করা। এ ভাবে সনাক্ত করার ফলে তাদের যে আর উত্যক্ত করা হবে না, আল্লা সেটাও বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তারপর আল্লা পর্দার ব্যাপারে আরও কয়েকটা আয়াৎ অবতীর্ণ করলেন, যেমন—"বিশ্বাসী নারীদের বলো—তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের যৌন-অঙ্গের হেফাজত করে, এবং যা স্বতঃ প্রকাশিত হয়, তা ছাড়া তারা যেন স্বীয় বেশ-বিন্যাশ প্রদর্শন না করে ও তারা যেন স্ব-স্ব বক্ষ-সমূহের উপর আবরণী স্থাপন করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, সেবিকা যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধ অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সকলে আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' (কোরান-সুরা ২৪, আয়াৎ ৩১)।

এর পর আর একটি প্রয়োজনে পর্দা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ল, তা হল নবীর হারেমের সুরক্ষা। তার থেকে আরও জরুরী হয়ে উঠল নবীর বালিকা পত্নী আয়েশার সুরক্ষা। এখানে বলে রাখা দরকার যে, নবী মহম্মদ যখন আয়েশাকে নিকা করেন তখন নবীর বয়স ৫২ বছর এবং আয়েশার বয়স মাত্র ৬ বছর। আল্লাও নবীর মনোভাব বুঝতে পেরে সময় নষ্ট না করে এ ব্যাপারে আয়াৎ অবতীর্ণ করতে শুরু করলেন। আল্লা বললেন—"হে নবী-পত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাকে ভয় কর তবে পর- পুরুষের সাথে কোমল-কণ্ঠে (সুললিত ভঙ্গিমায়) এমন ভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি (কু-ইচ্ছা) আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। এবং তোমরা সাদালাপ (গম্ভীর স্বরে আলাপ) করবে। এবং তোমরা গৃহে অবস্থান করবে, প্রাক-ইসলামী যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না, তোমরা নামাজ কায়েম করবে, ও যাকাত দিবে এবং আল্লা ও তাঁর রসুলের অনুগত হবে। হে নবী-পরিবার, আল্লা তো কেবল চাচ্ছেন তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র করতে" (কোরান-সুরা ৩৩; আয়াৎ ৩২,৩৩)।

এই সময় নবীর এক অনুচর এক দিন বিবি আয়েশার হাত থেকে কিছু নেবার সময় তাঁর হাত স্পর্শ করে। নবী এই ঘটনা দেখে ফেলেন এবং তা তাকে কষ্ট দেয়। ফলে আল্লা আয়াৎ অবতীর্ণ করলেন—"(হে বিশ্বাসীগণ,) তোমরা তাঁর (নবীর) পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল হতে চাইবে, এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লার রসুলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদের বিবাহ করা সঙ্গত নয়। আল্লার দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ" (কোরান-সুরা ৩৩; আয়াৎ ৫৩)। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নবীর হারেম, বিশেষ করে তার কনিষ্ঠা পত্নী বালিকা আয়েশাকে সুরক্ষিত করতে আল্লা সমগ্র মুসলমান নারী সমাজকে পর্দা দিয়ে আবৃত করলেন, ঘরের মধ্যেও পর্দার আড়ালে থাকতে বললেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বাইরে যেতে নিষেধ করে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে বললেন।

কোরানের উপরিউক্ত আয়াতগুলি থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বোঝার উপায় নেই যে, আল্লা পর্দার করার সময় মুসলমান মহিলাদের মুখমন্ডল ঢাকতে বলেছেন কি না। এই রকম বিতর্কিত ব্যাপারে মুসলমান সমাজের নিয়ম হল, হাদিসে কি লেখা আছে তার খোঁজ করা। কিন্তু হাদিসেও কোন স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় মুসলমান সমাজ এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্থ। তাই দেখা যায় যে, মুসলমান মহিলাদের কেউ কেউ আপাদ মস্তক ঢাকার সঙ্গে সঙ্গে মুখমন্ডলও ঢাকেন। আবার কেউ কেউ আপাদ মস্তক ঢাকলেও মুখমন্ডল অনাবৃত রাখেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শ্রীমতী শাবানা আজমীর উপরিউক্ত মন্তব্যকে ইসলাম বিরোধী বলা চলে না।

সম্প্রতি ডঃ জাকির নাইক নামে একজন ইসলামী আলিম (পন্ডিত) বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকায় "Does Islam make the Face Veil Obligatory for

Muslim Women?" শিরোনামের একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধের মাধ্যমে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন (Islamic Voice; December 2006)। কোরান ও হাদিস থেকে অনেক উদ্ধৃতির সাহায্যে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছেন যে, মুসলমান মহিলাদের পক্ষে পর্দা করা আবশ্যিক তবে মুখমন্ডল ঢাকা বাধ্যতামূলক নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, অনেক হাদিস আছে যাতে মহিলাদের মুখ দেখার কথা আছে। ডঃ নাইক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সেই সব হাদিস থেকেই বেশি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষ ভাগে তিনি লিখছেন, "অনেক পন্ডিতের মত হল, যে সব হাদিসে মহিলাদের মুখ দেখতে পাবার কথা আছে, সেই সব হাদিস সম্পর্কে তাঁদের মত হল, পর্দার ব্যাপারে কোরানের (২৪ঃ৩১) ও (৩৩ঃ৫৯) আয়াৎ অবতীর্ণ হবার পূর্বে ওই সব হাদিস রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে বলা চলে যে, প্রথমতঃ কোরানের এমন কোন আয়াৎ নেই যা তে মেয়েদের মুখমন্ডল আবৃত করাকে বাধ্যতামূলক বলে কোথাও বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কোরানের যে সব আয়াতে মুখমন্ডল আবৃত করাকে আবশ্যিক বলে তাঁরা দাবি করেন, তার সপক্ষে কোন বিশুদ্ধ হাদিস তারা উপস্থিত করতে অক্ষম। তৃতীয়ত, উপরিউক্ত হাদিসগুলি (যেখানে মেয়েদের মুখমন্ডল দেখার কথা আছে) বাস্তবিক পক্ষে সেই সব হাদিস কোরানের (২৪ঃ৩১) এবং (৩৩ঃ৫০) আয়াৎ অবতীর্ণ হবার পরেই রচিত হয়েছে"।

তিনি আরো লিখেছেন, "কাজেই প্রবন্ধের সারমর্ম হিসাবে লেখা চলে যে, পর্দা করার সময় মুসলমান মহিলাদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখা আবশ্যিক নয়। তবে উম্মুল মুমেনীন বা নবীর পত্নীদের বেলায় তা আবশ্যিক ছিল, যেমন তাহাজ্জুদ (গভীর রাতের নামাজ) নবীর জন্য আবশ্যিক ছিল। ...সুতরাং বলা চলে যে, পর্দা দিয়ে মুখমন্ডল আবৃত করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যে সমস্ত মহিলারা বর্তমানে মুখমন্ডল আবৃত করছেন, তাঁরা তা চালিয়ে যেতে পারেন"।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে মেয়েদের মুখমন্ডল পর্দা দিয়ে আবৃত করা বাধ্যতামূলক নয় এবং সেই কারণে শাবানা আজমী তার মন্তবের মধ্য দিয়ে কোন অপরাধ করেননি। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, শাবানা আজমীর মন্তব্যের জন্য সৈয়দ আহম্মদ বুখারি সহ অন্যান্য অনেক কট্টর পন্থী মুসালমান মৌলভীরা এত রেগে গেলেন কেন? কেনই বা এই সমস্ত মৌলভীর দল মহিলাদের বোরখা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে চান? এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে সমস্ত মোল্লারর দল মেয়েদের বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখতে চান, তাঁরা মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া, স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষিত হওয়া এবং চাকরি বাকরি করে আর্থিক দিয়ে সাবলম্বী হবারও ঘোরতর বিরোধী। তাদের মত হল, মেয়েরা অশিক্ষিত ও মূর্খ হয়ে গৃহবন্দী হয়ে থাকবে যা তে তাদের লালসা চরিতার্থ করার ও সন্তান উৎপাদন করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়, আর এক সঙ্গে চার জনকে বিয়ে করে ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করা যায় এবং যে কোন সময়, যা কে ইচ্ছা তালাক

দিয়ে গৃহপালিত পশুর মতই তাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং তারা যাতে এই সব অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে, প্রতিবাদের শক্তি না পায়।

নারী জাতির প্রতি মুসলমান সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গী আকাশ থেকে পরেনি। যে কেউ ইলামী শাস্ত্রের কিছুটা পড়লেই দেখতে পাবেন যে, নারী জাতিকে কোন রকম স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে আল্লা খুবই অনিচ্ছুক। আল্লার মতে মহিলারা পুরুষের ভোগের বস্তু এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। তাই সর্বজ্ঞ আল্লা বলছেন—"পুরুষ নারীর কর্তা। যেহেতু আল্লা তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে গৌরবান্বিত করেছেন, এই হেতু যে তারা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য ধন ব্যয় করে। এই জন্য পুণ্যশীল নরীগণ অনুগত হয়, আল্লার সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে, এবং যদি নারীগণের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তবে তাদের সৎ উপদেশ প্রদান কর, এবং তাদের শয্যা হতে পৃথক কর, এবং তাদের প্রহার কর। অনন্তর তারা তোমাদের অনুগত হয়,তবে তাদের সঙ্গে অন্য পন্থা অবলম্বন করো না।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে, পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ সে নারীর ভরণ পোষণের জন্য টাকা খরচ করে। পুরুষ আরও অনেক কিছুর জন্যও টাকা খরচ করে, যেন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু, আসবাবপত্র আরও কত কি। কাজেই উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা আল্লা নারীকে তার চেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন বলে মনে হয় না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ তাই সে চারটি নিকা করতে পারবে এবং যত খুসি সংখ্যক মুতা (ক্ষণস্থায়ী বিবাহ) ইত্যাদি যথেচ্ছ যৌনাচার করতে পারবে। নারীকে সেই সব মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। উপরন্তু তার যদি সন্দেহ হয় যে তার কোন স্ত্রী বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে তবে তাকে যথেচ্ছ প্রহার করতে পারবে। অথবা "তিন তালাক" দিয়ে, কোন রকম খরপোষ ছাড়া, গৃহপালিত পশুর মতই তাকে ঘর থেকে বিতাড়িত করতে পারবে।

কাজেই মেয়েরা যদি শিক্ষিত হয়ে যায় এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে যায় তবে তাদেরকে আর ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার করা যাবে না। নারীর ওপর পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার খর্ব হবে। তাই তাদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দাও, তাদের ঘরে বন্দী করে রাখ এবং তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে দিও না। এই কারণেই মোল্লা মৌলভীর দল মেয়েদের যে কোন রকম শিক্ষার ব্যাপারে খড়্গহস্ত। এই কারণেই আফগানিস্তানে নাজিবুল্লা সরকারের পতনের পর তালিবানরা শাসন ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পর্দা করা বাধ্যতামূলক করা হয়, মেয়েদের সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিয়মের অমান্যকারী দের প্রকাশ্য স্থানে গুলি করে হত্যা করে হয়। দীর্ঘদিন ধরে গৃহযুদ্ধের চলার ফলে আফগানিস্তানে সেই সময় পুরুষের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল। এই বিধবারা নানা রকমের কাজ করে দিন গুজরান করছিল। তাই তালিবানদের এই সব নিষেধাজ্ঞা তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। আজও আফগানিস্তানের যেখানে যেখানে তালিবানদের প্রভাব বেশি, সেখানে এই সব নিশেধাজ্ঞা বর্তমানে চালু আছে।

অল্প কিছু দিন আগে আফগানিস্তানের ঘোয়াড্ডো নামক এক গ্রামে তালিবান জঙ্গীরা এক পরিবারের সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলে, কারণ ওই পরিবারের দু জন মহিলা স্থানীয় কিছু বালিকাকে গোপনে তাদের ঘরে শিক্ষা দিতেন। আফগানিস্তানের সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে বিগত দুমাসে এরকম ২০ জন শিক্ষককে তালিবানরা হত্যা করেছে। স্কুল শিক্ষা নিতে যাবার অপরাধে কাশ্মীরের জঙ্গীরা গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি মেয়ের মুখমন্ডল অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। গত ২০০০ সালের ৬ই আগস্ট গোপনে ১৯ বছর বয়সী, স্থানীয় নোয়াকাডাল হায়ার সেকন্ডারী স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী কুমারী কুলসোমার মুখমন্ডল লস্কর-ই-জব্বর নামক এক জঙ্গী সংগঠনের চার জন জঙ্গী অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। গত বছর (২০০৬ খ্রীঃ) ১৫ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জঙ্গীরা গজলা শাহীন বীথি ও তার মা মুমতাজ মাইকে এক সঙ্গে ধর্ষণ করে কারণ গজলা ইসলামী আইন ভঙ্গ করে এম এ পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিল। ১৯৯৮ সালে আলজিরিয়ার কট্টর পন্থীরা স্কুলে পড়াশুনা করার অপরাধে ৩০০ বাচ্চা মেয়ের গলা কেটে হত্যা করেছিল। ১৯৯৭ সালে মিশরে ১৩ বছরের এক বালিকাকে অনেক যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলা হয়, কারণ সেই বালিকা প্রকাশ্য স্থানে বোরখা সরিয়ে মুখমন্ডল অনাবৃত করেছিল।

কাজেই পৃথিবীর সমগ্র মহিলা সমাজকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। নারী জাতির প্রতি ইসলামের এই বৈষম্য মূলক আচরণের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। যেখানে যতটা শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় তাকে কাজে লাগাতে হবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজন হলে মোল্লা-মৌলবীদের ফতোয়াকেও অগ্রাহ্য করতে হবে এবং সৈয়দ বুখারীর মত ইমামদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মুসলীম মহিলাদের দায়িত্ব নিতে হবে তাদের অশিক্ষিত মা ও বোনদের, যাদের স্কুলে যাবার সামর্থ বা বয়স নেই, তাদের শিক্ষিত করে তোলার। মহিলারা শিক্ষিত হলেই তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ভাষা ও শক্তি পাবেন। এবং নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবেন।

বিশ্বের পন্ডিত সমাজ এ ব্যাপারে আজ এক মত যে, মুসলমান সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হল নারী জাতির ওপর দমন পীড়ন। ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP) হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা UNO-র একটি শাখা সংস্থা। মুসলমানদের এই অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধান করতে গত ২০০১ সালে ইউ এন ডি পি মুসলমান পন্ডিত, লেখক ও সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। গত ২০০২ সালে ওই কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে যাকে বলা হয় আরব "হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট-২০০২" (বা AHDR 2002)। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আরবদুনিয়ার অনগ্রসরতার সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ হল ইসলামী সমাজে নারীজাতির লাঞ্ছনা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যে সমাজ তার উৎপাদনের অর্ধেক শক্তিকে গলা টিপে দম বন্ধ করে

রাখে, সেই সমাজের উন্নতি হবে কেমন করে?" এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম বলেন, "আমরা জানি পাখিদের দুটো করে ডানা আছে। যদি ওই ডানা দুটো সমান শক্তিশালী না হয় তবে পাখি উড়তে পারে না। সেই রকম সমাজেরও দুটো ডানা আছে, পুরুষ এবং নারী। এদেরও সমান শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। এইদুটো শক্তিশালী হলে তবেই সমাজ উড়বে"।

তবে আশার কথা হল, ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর মুসলমান মেয়েরা, মোল্লা-মৌলবীদের ফতোয়া ও রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে, আজ শিক্ষা গ্রহণ করতে স্কুল কলেজে আসছে। সেই কারণে মেয়েরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে এবং ইসলামের চূড়ান্ত লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে তারা সরব হচ্ছে। এইকারণে গত বছর শিয়া সম্প্রদায়ের দলপতিরা তাদের নিকানামার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। এত দিন তালাক দেবার অধিকার পুরুষদেরই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু নতুন নিকানামায় মেয়েদেরও তাদের অত্যাচারী স্বামীদের বিরুদ্ধে আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। গতবছর কুয়েতের মহিলারা ভোট দেবার ও নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু পরম দয়ালু দয়াময় (রহমানির রহিম) আল্লার দৃষ্টিতে মহিলারা চিরকালের জন্য অভিশপ্ত। তাই আল্লা ইহজগতে মসজিদ এবং পরজগতে জান্নাতে (বা স্বর্গে) প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু মুসলীম দুনিয়ার অনেক দেশেই মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতেই হয়তো মুসলমান মহিলারা পর্দাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ইসলামের অতিশয় কঠোর লিঙ্গ-বৈষম্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং এই পৃথিবীতে নিজেদের একটি প্রগতিশীল নারী সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে নৃশংসভাবে খুন হচ্ছে মুসলমান সমাজের মেয়েরা

এ ব্যাপারে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলীম সমাজে নারী হল ভোগ ও কামনার পরিতৃপ্তি এবং সন্তান জন্ম দেবার কটি যন্ত্র বিশেষ। সেই সমাজে প্রতিটি পরিবার হল ছোটখাট একটি পতিতালয়। সেখানে পুরুষরা সকলেই হল ধর্ষণকারী। তারা পুত্রবধূকে ধর্ষণ করছে, চাচা জ্যেঠা মামা মাসীর মেয়েকে অথবা নিকট সম্বন্ধের নারীকে ধর্ষণ করছে, আর মেয়েরা সেই যৌন অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করে চলেছে। কারণ মুসলমান সমাজে কোন নারী যদি কোন পুরুষের বিরুদ্ধে যৌন অত্যাচার অভিযোগ আনে তবে তার সপক্ষে তাকে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে হবে, যারা সচক্ষে সেই যৌন অত্যাচার দেখেছে, যা এক অসম্ভব কাজ। অন্যথায় সেই মহিলাই ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে, যার শাস্তি হল, অবিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে ১০০ বা ২০০ ঘা বেত এবং বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে রজম বা পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা। মহিলাদের রজম করার বেলায় নিয়ম হল, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর ছোড়া। সেই পাথর আবার খুব বড় হলে চলবে না, কারণ তা হলে কম যন্ত্রনাতেই মারা যাবে। পাথর খুব ছোট হলেও চলবে না, কারণ তাতে কম ব্যথা লাগবে। তাই মধ্যম আকৃতির পাথর ছুড়তে হবে, যাতে অনেক ক্ষণ ধরে যন্ত্রণা পেয়ে মারা যায়। কাজেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অত্যাচারিত মহিলারাই সাজা পায়, আর অত্যাচারকারী বা ধর্ষণকারী পুরুষরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

অপর দিকে কোন মুসলমান মেয়ে যদি পরিবারের পুরুষ অভিভাবকদের পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, বা তাদের অমতে কোন ছেলের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা করে, বা তাকে বিয়ে করে, তাহলে অভিভাবকরা মনে করে যে, তাদের কথা না শুনে সে পরিবারের সম্মান হানি করেছে। তখন পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে সেই মেয়েকে খুন করা হয়, মুসলমান সমাজে যার নাম হল "সম্মান রক্ষার্থে খুন" বা "অনার কিলিং" (Honour Killing)। শুধু তাই নয়। যদি কোন মুসলমান মেয়ে বোরখা পরতে না চায়, বা সাজগোজ করে, বা ঠোটে লিপস্টিক লাগায়, তাহলেও তাদের খুন করা হয়। মুসলীম দেশগুলোতে প্রতি বছর হাজার হাজার মেয়ে এই অনার কিলিং-এর শিকার হচ্ছে বা কুকুর বিড়ালের মত

তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। তাই বলা চলে যে, মুসলমান সমাজে মহিলারা হল শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুমাত্র। তাদের তিলমাত্র স্বাধীনতার সুযোগ নেই।

শ্রীমতী ওয়াফা সুলতান মুসলীম মেয়েদের ওপর এই অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করে চলেছেন। তিনি সিরীয়ার একজন ডাক্তার এবং বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী। মুসলমান মেয়েদের পরাধীনতার কথা বোঝাতে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, "আমি এখন আমেরিকায় এসে স্বাধীনতা ভোগ করছি। পাশের বাড়ির কোন পুরুষ প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বললে আজ আমাকে কেউ ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে পারছে না।"

তুরস্কের ঘটনা

গত বছর, অর্থাৎ ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। দক্ষিণ তুরস্কের আদিয়ামান (Adiyaman.) প্রদেশের কাহটা নামক স্থানে ১৬ বছরের এক কিশোরী ফতেমাকে (আসল নাম নয়) তার বাবা, ঠাকুরদা ও অন্য আত্মীয় স্বজনরা জীবন্ত কবর দিয়ে মেরে ফেলে। বাড়ির পিছনের দিকে, জঞ্জাল ফেলার জায়গায় গর্ত খুড়ে তাকে কবর দেওয়া হয়। লোক মুখে খবর পেয়ে, এ বছর (২০১০ সাল) ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশ গিয়ে যখন কবর খোঁড়ে তখন দেখা যায় যে, তার মৃতদেহ হাত পা বাঁধা অবস্থায় দুই মিটারগভীর কবরে মধ্যে বসা অবস্থায় রয়েছে। পোস্ট মর্টেম করে দেখা যায় যে, তার পেটে ও ফুসফুসের মধ্যে অনেক মাটি রয়েছে এবং দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। এ থেকে বোঝা যায় যে, কবর দেবার সময় সে জীবিত ছিল বা তাকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছিল। লন্ডনের গার্জিয়ান (Guardian) পত্রিকায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১০-এর সংখ্যায় এই খবর প্রকাশিত হয় এবং তাতে বলা হয় যে, মেয়েটির কয়েকজন ছেলে বন্ধু ছিল এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশা বা গল্প করার অপরাধেই তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তুরস্কের হুরিয়ৎ (Hurriyet) পত্রিকাতেও এই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

মেয়েটিকে খুন করার পর তার আত্মীয়-স্বজনরা পুলিশকে জানায় যে, তাদের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং সেই অনুসারে থানায় নিরুদ্দেশের একটা অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পর পুলিশ মেয়েটির বাবা, মা ও ঠাকুর্দাকে গ্রেফতার করে। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে, ফতেমার সঙ্গে তার ছেলে বন্ধুদের মেলামেশার ব্যাপারটা পরিবারের লোকেরা তাদের পরিবারের পক্ষে অসম্মানজনক বলে মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তাঁকে বারবার সাবধান করেছিল। তাকে অনেকবার মারধোরও করা হয়েছিল। কিন্তু সে নিজেকে শোধরাবার কোন চেষ্টা করেনি। শেষে বাড়ির অভিভাবকরা তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুলিশের লোকেরা জানায় যে, বর্তমানে তুরস্কে এই অনার কিলিং-এর সংখ্যা খুব বেড়েছে এবং প্রতি বছর প্রায় ২০০০ নিরীহ বালিকা এর শিকার হচ্ছে।

জর্ডনের ঘটনা

অতি সম্প্রতি, গত অক্টোবর মাসের ১৯ (২০০৯) তারিখে, ফালে হাসান আমলেকি (৪৮) নামে আমেরিকার (মূলত তারা জর্ডান থেকে আগত) এক মুসলমান তার ২১ বছর বয়সী মেয়ে নুর ফালে আমলেকিকে গাড়ী চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। আমেরিকার আরিজোনা প্রদেশের গ্লেনডেন নামক শহরে এই পৈশাচিক ঘটনা ঘটে। মেয়ে নুর ফালে আমলেকির অপরাধ হল, সে ইসলামী পোশাক ও বোরখা পরতে অস্বীকার করেছিল। ওই একই দিনে, অর্থাৎ ১৯শে অক্টোবর, ২০০৯, তারখে জর্ডানের এক বাবা খুন করল তার ২২ বছরের মেয়েকে। কারণ সে বিয়ের আগেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল। ঘটনার অগের দিন মেয়েটির বাবা ও ভাই তাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যায়, কারণ বিগত কয়েক দিন ধরে সে পেটের ব্যথায় ভুগছিল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলে যে, সে ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ি ফেরার পথেই বাবা একটা তরোয়াল ২৫ বার তার পেটে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মেয়েটি ও তার পেটের শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। পরে বাবা এবং ভাই, দু জনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গত ২০০৮ সালের ২১শে আগস্ট, ওই জর্ডান দেশেই এ রকম আর একটি ঘটনা ঘটে এবং রানা রিয়াদ সিওয়ারা নামের একটি মেয়েকে তার বাবা তার ২১ তম জন্মদিনের আগের দিন চাকু দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলে। রানা রিয়াদ ছিল বিবাহিতা এবং ৫ বছর ও ৩ বছর বয়সী তার দুটি মেয়েও ছিল। রানা রিয়াদের স্বামী সুলতান মোহম্মদ সিওয়ারা তার অভিযোগে জানায় যে, রানা রিয়াদের বাবা তার স্ত্রীকে চাকু দিয়ে ৫ বার আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে এবং শেষে একটা বড় পাথর দিয়ে তার মাথা থেৎলে দেয়। কেন রানা রিয়াদের বাবা তাকে খুন করল তার কোন কারণ জানা যায়নি। মেয়েকে খুন করে হাত মুখ ধুয়ে বাজারে গেলে পুলিশ রানা রিয়াদের বাবাকে গ্রেপ্তার করে।

আমেরিকার "চিকাগো ট্রিবিউন" পত্রিকার খবর অনুসারে গত ১৯৯৪ সালের ৩১শে মে, কিফায়া হুসেন নামে জর্ডানের ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়েকে খুন করা হয়। তাকে খুন করে তার ৩২ বছর বয়সী দাদা। সে প্রথমে কিফায়াকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধে এবং তাকে কোরানের কিছু অংশ মুখস্থ বলতে বলে। কিফায়া যখন মুখস্থ বলছিল তখন তার দাদা একটা চাকু দিয়ে তার গলার নলি কেটে দেয়। কিফায়াকে ওই অবস্থায় রেখে তার দাদা রক্তাক্ত ছুরিটা নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে যায় এবং সবাইকে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, "দেখ, আমি আমার বোনকে খুন করে পরিবারের সম্মান বাঁচিয়েছি।" কি দোষে কিফায়াকে খুন হতে হল? কারণ তারই এক ২১ বছর বয়সী দাদা তাকে ধর্ষণ করেছিল।

জর্ডানের আইন অনুসারে খুনের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কিন্তু অনার কিলিং-এর বেলায় অপরাধকে অনেক লঘু করে দেখা হয়। বিশেষ করে সেই পরিবারের তরফ থেকে অনুকম্পার আবেদন আসে তবে অতিশয় মৃদু শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে। অতীতে জর্ডানের পার্লামেন্ট অনার

কিলিং-এর ক্ষেত্রে চরম সাজা দেবার একটি বিল খারিজ করে দেয়। জর্ডানের একটি রিপোর্ট বলছে যে, ওই দেশে প্রতিবছর ১৫ থেকে ২০ জন মেয়েকে অনার কিলিং-এর নামে খুন হয়ে থাকে। বর্তমানে বছরে আজ পর্যন্ত জর্ডানে ১৭টি মেয়েকে অনার কিলিং-এর নামে খুন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে যে, বিগত ২০০৬ সালের ২৮শে মার্চ জর্ডনের আকাবা শহরের এক মুসলমান তার বোনকে খুন করে। ঐ রকম আর একটি ঘটনায়, ২০০৪ সালের ১৭ই নভেম্বর আর এক দাদা পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে তার বোনকে হত্যা করে।

পাকিস্তানের ঘটনা

গত ২০০৮ সালের ১৫ই অক্টোবর পাকিস্তানের লাহোর শহরের নিকটবর্তী মুরিদওয়াল গ্রামের ছেলে তাহের তার ৪০ বছর বয়স্কা মা মুক্তারন বিবিকে খুন করে। তাহেরের সন্দেহ ছিল যে, তার মার সঙ্গে স্থানীয় এক ব্যক্তির অবৈধ সম্পর্ক আছে। এই ব্যাপার নিয়ে তাহের ও তার মায়ের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হত। ঘটনার দিন তাহের একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মা'কে আঘাত করে এবং তাতেই মুক্তারন বিবির মৃত্যু হয়। এর আগের বছর, অর্থাৎ ২০০৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের পুলিশ দক্ষিণ সিন্ধু প্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দুই ব্যক্তিকে খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। তারা দুজনেই তাদের ভাইঝিকে খুন করেছিল। দুই কাকাই সন্দেহ করেছিল যে, তাদের ভাইঝিরা তাদের স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল।

গত বছর (২০০৯ সাল) ৩রা মে পাকিস্তানের সঙ্গীত শিল্পী ও গীতিকার আইমান উদাসকে তার দুই ভাই গুলি করে হত্যা করে। শ্রীমতী উদাস স্থানীয় পস্তু ভাষায় গান লিখতেন ও তা গাইতেন। তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয় এবং পাকিস্তানের সরকারি টিভি চ্যানেলে প্রায়ই তার অনুষ্ঠান দেখানো হত। শ্রীমতী উদাসের জনপ্রিয়তা বাড়লেও তার পরিবারের লোকরা মনে করত যে, এক জন মুসলমান মেয়ের পক্ষে এ ভাবে টিভিতে অনুষ্ঠান করা উচিত নয় এবং এতে তাদের পরিবারের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আইমান তাদের কথায় কান দিতেন না। ঘটনার দিন তার দুই ভাই আইমানের রাওয়ালপিণ্ডির ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়। আইমানের স্বামী তখন ফ্ল্যাটে ছিল না। এক ভাই পিস্তল থেকে আইমানের বুকে পর পর ৩টি গুলি করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়।

কিন্তু গত ১৯৯৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের অদূরে সুখো গ্রামে জাহিদা পারভিনের ওপর তার স্বামী মহম্মদ ইকবাল যে অত্যাচার চালায় তার তুলনা মেলা ভার। ওই দিন গভীর রাতে ইকবাল জাহিদাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে এবং দড়ি দিয়ে তার হাত পা বেঁধে ফেলে। তারপর একটা লোহার শিক দিয়ে সে তার দুটো চোখ উপড়ে নেয় এবং একটা চাকু দিয়ে জাহিদার নাক, দুই কান ও জিভ কেটে দেয়। কারণ, স্বামী

ইকবালের সন্দেহ ছিল যে, অন্য এক পুরুষের সাথে জাহিদার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে আমেরিকার সরকার জাহিদাকে আমেরিকায় নিয়ে যায় এবং সেখানকার মেরীল্যান্ড হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি করে নকল নাক তৈরি করা হয় এবং কৃত্তিম চোখ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ইরাকের ঘটনা

বিগত ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের টাইম পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে ইরাকের ১৭ বছর বয়সী কিশোর আলি জাসিব তার মা ও সৎ ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলে। কারণ তার সন্দেহ ছিল যে, তার মা ও তার সৎ ভাই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। আলি তার ৪ বছর বয়সী বোনকেও হত্যা করে, কারণ তার বিশ্বাস যে, ওই বোনটি তার সৎ ভাইয়ের সন্তান। ওই পত্রিকার আরও একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, তার আগের, নভেম্বর মাসে ১৬ বছরের ইরাকী কিশোরী কাদিসিয়া মিসাদ তাদের বাগদাদের নিকটস্থ শহরতলীর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার ভাই ও এক খুড়তুতো ভাই তাকে বাগদাদের রাস্তায় দেখতে পায়। তারা তখন কাদিসিয়াকে জোর করে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং এক ভাই পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে।

প্রায় দু বছর আগে, ২০০৭ সালের ৭ই এপ্রিল, ১৭ বছরের ইরাকী কিশোরী দুয়া খলিল আসোয়াদকে তার বাবা, কাকা ও আরও কয়েক জন মিলে পাথর ছুড়ে খুন করে। দুয়ারা ছিল ইরাকের কুর্দ জাতির অন্তর্গত ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের লোক। তাদের বিয়ে-সাদী ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দুয়া খলিল ইরাকের এক সুন্নী মুসলমান যুবকদের সাথে ভালবাসা করেছিল। অনেকের মতে দুয়া সেই যুবককে বিয়ে করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই কারণে তার পরিবারের লোকেরা তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকাশ্য রাস্তায় তার বাবা, কাকা এবং আরও অনেকে তাকে যথেচ্ছ কিল, ঘুষি, লাথি মারতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকে তাকে পাথর ছুড়ে মারতে থাকে। পাশেই সরকারি পুলিশ সব দেখেও না দেখার ভান করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার কাকা একটা বড় কংক্রিটের চাই দিয়ে দুয়া খলিলের মাথা থেৎলে দেয়। কোন এক ব্যক্তি গোপন ক্যামেরা দিয়ে এই নারকীয় ঘটনার ভিডিও তৈরি করে এবং অনেক টিভি চ্যানেল ও ইউ টিউবে সেই ভিডিও দেখানো হয়।

মুসলমান সমাজের এই অনার কিলিং কত নির্মম, নৃশংস ও হৃদয় বিদাকর হতে পারে তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ইরানের একটি ঘটনা। ইরানের এক মুসলমান বাবা তার ৭ বছর বয়সী শিশুকন্যার গলা কেটে ধরমুন্ড আলাদা করে ফেলে। কারণ, তার ভাই, অর্থাৎ শিশুটির কাকা, তাকে ধর্ষণ করেছিল। এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, কি কি কারণে মুসলমান সমাজের মেয়েরা অনার কিলিং-এর নামে খুন হচ্ছে এবং মুসলমান পরিবারে কি ধরণের পাশবিক যৌন অত্যাচারের ঘটনা ঘটে থাকে। এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাকে খুশি করার জন্যই এ সমস্ত পাশবিক হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি থেকে পাঠকের মনে হতে পারে যে, অনার কিলিং-এর নামে এই নৃশংসতা শুধু ইসলামী দেশগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই নৃশংসতা আজ পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, গত ২০০৮ সালের ১লা জানুয়ারী ইয়াসের আব্দেল সৈদ (৫০) নামে আমেরিকা নিবাসী এক মিশরীয় ট্যাক্সি ড্রাইভার তার দুই মেয়ে, সারা সৈদ (১৭) ও আমিনা সৈদ (১৮) কে গুলি করে হত্যা করে। আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশের ডালাস শহরের উপকণ্ঠে লাস কলিনাস নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। সারা এবং আমিনা তখন তাদের বাবার ট্যাক্সিতেই বসেছিল এবং বাবা ইয়াসের আব্দেল ওই ট্যাক্সির মধ্যেই তাদের গুলি করে। মেয়েদের ওই অবস্থায় ফেলে রেখে বাবা গা ঢাকা দেয়। সারা ও আমিনার অপরাধ ছিল এই যে, তারা বোরখা পরতে অস্বীকার করেছিল এবং আমেরিকার আর পাঁচটা মেয়ের মত বাঁচতে চেয়েছিল।

পাঠকের হয়তো আরও স্মরণ আছে যে, ২০০৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর কানাডার টরেন্টো শহরে বসবাসকারী পাকিস্তানী ট্যাক্সি ড্রাইভার মোহম্মদ পারভেজ (৫৭) তার মেয়ে আক্সা পারভেজ (১৬) কে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। আক্সার অপরাধ ছিল যে, সেও বোরখা পরতে অস্বীকার করেছিল এবং কানাডার অন্যান্য মেয়েদের মত বাঁচতে চেয়েছিল।

এই বছর (২০০৯ সাল) ১৩ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের বাফালো নামক শহরতলীতে ৪৪ বছর বয়সী মুসলমান ব্যবসায়ী মুজ্জামিল হাসান তার ৩৭ বছর বয়সী স্ত্রী আসিয়া হাসানের গলা কেটে ধরমুন্ড আলাদা করে ফেলে। মুজ্জামিল ছিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং একটা টিভি চ্যানেলের মালিক। সে প্রতিদিন তার স্ত্রীর ওপর নৃশংস অত্যাচার চালাতো। এই পাষণ্ডের প্রতিদিনকার অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য আসিয়া পুলিশের কাছে সাহায্যের আবেদন করে। অনেকের মতে সে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যও চেষ্টা চালায়। এতে ক্ষেপে গিয়ে মুজ্জামিল তাকে খুন করে।

গত ২০০৮ সালের ১লা জুলাই লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার একটি রিপোর্ট অনুসারে বৃটেনে গত কয়েক বছরে ১২০ টিরও বেশি অনার কিলিং-এর ঘটনা ঘটেছে। সেই রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, বৃটেনে প্রতিবছর ১২-১৫টি অনার কিলিং সংঘটিত হচ্ছে। এবং পুলিশ বর্তমানে ১২০টি কেসের তদন্ত করেছে। গত ২০০৬ সালে বৃটেনে নিবাসী পাকিস্তানী নাগরিক রিআজ আহম্মদ তার স্ত্রী ও ৩ থেকে ১৬ বছরবয়সী ৩ মেয়েকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলে। কারণ রিআজের স্ত্রী ও মেয়েরা পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল এবং ইসলামী জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিল। গত ২০০৬ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফ থেকে এই ব্যাপারে একটা সমীক্ষা চালানো হয় এবং সেই রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে ৫০০০ মুসলমান মেয়ে এই অনার কিলিং-এর শিকার হয়ে প্রাণ হারায় এবং এই ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থান সকলের ওপরে।

সেখানে প্রতি বছর ১০০০ থেকেও বেশি মেয়েকে অনার কিলিং হিসাবে হত্যা করা হয়ে থাকে।

মুম্বাই-এর নৃশংসা ঘটনা

উপরিউক্ত ঘটনাগুলো পড়ে পাঠকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, মুসলমান পরিবারের পুরুষরাই অনার কিলিং-এর ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শুধু পুরুষ সদস্যরাই তাদের মা, বউ, বোন, ভাগ্নী বা ভাইঝিদের খুন করে থাকে। তবে ২০০৬ সালের ২রা জুলাই দক্ষিণ মুম্বাই-এর শহরতলীতে যে অনার কিলিং সংঘটিত হয় তাতে মেয়েটির মা-ও তার মেয়েকে খুন করা এবং মৃতদেহটিকে টুকরো টুকরো করে কাটার সময় তার স্বামীকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে।

বিগত ২০০৮ সালের ১২ই জুলাই কলকাতার সব সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর ছাপা হয় যে, "মান রাখতে মেয়েকে খুন, বাবা মায়ের যাবজ্জীবন"। খবরে বলা হয় যে, আগের দিন ১১ই জুলাই মুম্বাই-এর অ্যাডিশনাল সেসন জজ শ্রী ও এস জয়সয়াল মহম্মদ মুন্না সর্দার খাঁ (৩৮) ও তার স্ত্রী সেহনাজ খাঁ (৩৫)কে তাদের মেয়ে মেহনাজ খাঁকে গত ২০০৬ সালের ২র জুলাই খুন করে মৃতদেহটি ১১ টুকরো করে কেটে বস্তা বন্দি করেপাচার করার ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দেন। মেহনাজের অপরাধ হল, সে মহারাষ্ট্রের হিন্দু যুবক বিদ্যানন্দ যাদবকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। মহামান্য বিচারপতি তাঁর সাজা ঘোষণা করার সময় এও বলেন যে, মুন্না সর্দার ও তার স্ত্রী যে নৃশংসতা করেছে তার উপযুক্ত সাজা হল মৃত্যুদন্ড। তবে তাদের আরও পাঁচটি নাবালক সন্তান রয়েছে তাদের কথা ভেবে মানবিকতার খাতিরেই যথা সম্ভব লঘু শাস্তি দিয়েছেন।

খবরে প্রকাশ যে, বিগত কয়েক বছর ধরেই মেহনাজ ও বিদ্যানন্দের মধ্যে প্রেম চলছিল। ঘটনার কয়েক দিন আগে তারা পালিয়ে দূরবর্তী পানভে নামক স্থানে চলে যায় এবং সেখানে তারা বিয়ে করে বসবাস করতে থাকে। যেমন করেই হোক, মুন্না খাঁ ও সেহনাজ তাদের ঠিকানা যোগাড় করে সেখানে উপস্থিত হয়। সেহনাজ তখন মেয়েকে বোঝাতে থাকে এবং বাড়িতে ফিরে আসার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকে। সে মেহনাজকে আশ্বাস দেয় যে, সে একবার বাড়িতে ফিরে গেলে তারা তার বিয়ে মেনে নেবে। যাই হোক, তাদের কথায় ভুলে মেহনাজ বাপের বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ফিরতে রাত প্রায় ১১টা বেজে যায়।

বাড়িতে ফিরেই মুন্না খাঁ মেহনাজকে চিৎ করে শুইয়ে ফেলে এবং একটা তোয়ালে দিয়ে তার নাক মুখ চেপে ধরে এবং মা সেহনাজ মেয়ের বুকের ওপর বসে তার হাত পা জাপ্টে ধরে থাকে, যাতে সে পালাতে না পারে। এ ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেহনাজের মৃত্যু হয়। মুন্না খাঁ তখন মেয়ের মৃতদেহটা টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে যায় এবং তা কেটে ১১ টুকরা করে। উপরন্তু সে মেহনাজের মুখমন্ডলের চামড়া ছাড়িয়ে নেয় ও নাক কেটে নেয়,

যাতে কেউ তাকে শনাক্ত করতে না পারে। তারপর সে ঐ ১১ টুকরো দেহকে দুটো বস্তায় ভরে বস্তা দুটো বাইকুল্লা ব্রিজের নীচে ফেলে আসে।

কয়েক দিন পরে স্থানীয় লোকেরা থানায় গিয়ে এলাকার দুর্গন্ধের অভিযোগ করে। ফলে পুলিশ গিয়ে বস্তাবন্দি মৃতদেহ আবিষ্কার করে। বস্তা দুটোতে যেই কোম্পানীর নাম লেখা ছিল পুলিশ সেই কোম্পানীতে যায় এবং জানতে পারে যে ওই বস্তায় করে জি এন শপ নামের একটা মুদীখানার দোকানে তারা মাল সরবরাহ করেছিল, যার মালিক হল মুন্না খাঁ। এই সূত্র ধরে পুলিশ মুন্না খাঁ ও সেহনাজ খাঁকে গ্রেপ্তার করে। যাই হোক, তারা যে এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয় ও যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাজা পায় তা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘটনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ইসলাম মানুষের মস্তিষ্ককে কতখানি বিকৃত করতে সক্ষম, যাতে করে একজন মা তার আপন সন্তানকে নৃশংস ভাবে খুন করতে প্রভাবিত করতে পারে।

যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানবতাবাদী অ-মুসলমান সমাজ আজ মুসলমান সমাজের জঘন্য নারী নির্যাতন এবং অনার কিলিং-এর নামে নৃশংস ভাবে নারী হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, সেই সময় মুসলমান সমাজের মোল্লা-মৌলভিরা, রাজনৈতিক নেতারা ও মুসলীম রাষ্ট্রের কর্ণধাররা এর সপক্ষে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিছুদিন আগে চেচেনীয়ায় দুজন পতিতাকে তাদের পরিবারের লোকেরা অনার কিলিং-এর নামে খুন করে। এই ঘটনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে চেচেনীয়ার রাষ্ট্রপতি রমাজান কাদিরভ বলেন, যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা ছিল দুশ্চরিত্র এবং তাদের হত্যা করা উচিত কাজ হয়েছে।

কোন হিন্দু মেয়ের পক্ষে কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করা কখনই উচিত নয়

মুসলমান যুবক শ্রী রিজোয়ানুর রহমানের রহস্যজনক মৃত্যু যে এক ঘোরতর তর্কবিতর্কের সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য। পুলিশের মতে রিজোয়ানুর আত্মহত্যা করেছে। বর্তমানে বিষয়টা সি বি আই তদন্ত করে দেখেছে, তাই এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করাই ভালো। কিন্তু কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই মৃত্যুর পিছনে আর এস এস-এর হাত আছে। অথচ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত পর্যালোচনা করলে মনে হয় এর পিছনে কোন ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের হাত থাকাই স্বাভাবিক। কোন একটি বেসরকারী সংস্থাকে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, রিজোয়ানুর হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ওই চিঠির একটি কপি স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস এম এল এ জাভেদ খাঁর কাছে আছে বলেও সংবাদে প্রকাশ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, কোন মুসলমানের পক্ষে ইসলাম ত্যাগ করে অন্য কোনও ধর্ম গ্রহণ করা একটি মারাত্মক পাপ, যার নাম মোরতাদ (বা apostasy)। এবং এই মোরতাদের শাস্তি হল মৃত্যু। কাজেই এটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে রিজোয়ানুরকে এই পাপকর্ম থেকে বিরত করতে না পেরে কোন ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন রিজোয়ানুরকে হত্যা করেছে। তবে আজ এ সব কথা অবান্তর, কারণ সিবিআই-এর মতে রিজোয়ানুর আত্মহত্যা করেছে।

যাই হোক, প্রিয়াঙ্কা টোডি ও রিজোয়ানুরের বিয়ের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে হিন্দু মেয়ের পক্ষে কোন মুসলমান যুবককে বিয়ে করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত তা খতিয়ে দেখা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতের সংবিধান একজন প্রাপ্তবয়স্কা নারীকে এই অধিকার দিয়েছে যে, সে তার নিজের পছন্দ মত জীবনসঙ্গী বেছে নিতে পারে। তাই ১৮ বছর বা তদূর্দ্ধ কোন হিন্দু মেয়ে যদি ২১ বছর বা তদূর্দ্ধ কোন মুসলমান যুবককে বিয়ে করে তবে আইনের দিক থেকে তাকে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। অন্য দিক দিয়ে বিচার করলেও, কোন হিন্দু মেয়ে যখন কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে তখন সেই মেয়েটিকে কোন ভাবেই দোষ দেওয়া চলে না। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটি শুনে আসছে, সব ধর্মই সমান। সব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। সর্বোপরি, শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি বলে গেছেন যে, সব ধর্মই

এক না যত মত তত পথ। কাজেই এই সব ভুল কথা শুনে শুনে কোন হিন্দু মেয়ে যদি কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে তবে দোষ দিতে হতে তাদের, যারা ওই সব ভুল এবং মিথ্যা কথা প্রচার করে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত হবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯-এ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা ৬ থেকে স্বামী অভেদানন্দের লেখা *মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে, যা পড়লে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ধর্ম হিসাবে ইসলাম হিন্দু ধর্ম থেকেও উৎকৃষ্ট। তাতে লেখা হচ্ছে যে, শিশু বয়স থেকেই মহম্মদ অত্যন্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং সেই বাল্যকাল থেকেই তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হতেন। বাল্যবয়সে মেষ চড়াতে চড়াতে নাকি তাঁর জ্যোতি দর্শন হত। আরবের নিষ্ঠুর পশুপালক সমাজের একজন মানুষ সমাধিতে নিমগ্ন হতেন, এই সমস্ত সংবাদ লেখক কোথা থেকে পেলেন তা এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

অথচ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর মহম্মদ কি করেছিলেন তার এক বর্ণও লেখক কোথাও লিখলেন না। তিনি লিখলেন না যে, **মহম্মদ ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে নিকা করেছিলেন।** তিনি লিখলেন না যে, **মহম্মদ ৫৬ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে নিকা করেছিলেন এবং শেষ বয়সে ১২ (মতান্তরে ২২) জন রমণীকে বিয়ে করে একটি হারেম তৈরি করেছিলেন।** সেই পুস্তকে লেখা হল না যে, ৬২৬ খ্রীস্টাব্দে মদিনার কুরাইজা উপজাতির ইহুদিদের মহম্মদ কচুকাটা করেছিলেন। **৮০০ সক্ষম পুরুষ ইহুদিকে তরোয়াল দিয়ে ধর-মুণ্ড আলাদা করা হয়েছিল এবং ১০০০ নারী ও শিশুকে নিজেদের মধ্যে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ভাগ বাটোয়ারা করা হয়েছিল এবং বয়স্ক মহিলাদের ক্রীতদাসী হিসাবে নেজেদের হাটে বিক্রী করা হয়েছিল। সব থেকে অল্প বয়স্কা সুন্দরী রিহানাকে মহম্মদ নিজের জন্য পছন্দ করে রাখলেন এবং ৮০০ মানুষকে গলা কেটে হত্যা করার পর সেই রাত্রেই মহম্মদ** সেই রিহানা সুন্দরীরকে ধর্ষণ করলেন। সমাধিতে নিমগ্ন হওয়া এক জন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কি করে এই সব কাজ করলেন তা সেই পুস্তকে কেন স্থান পেল না?

সকলেরই স্মরণ আছে যে, গত কয়েক বছর আগে প্রখ্যাত পণ্ডিত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্মশতাব্দী মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়েছে। সেই পণ্ডিতপ্রবর তাঁর একটি রচনায় লিখেছেন Islam কথার অর্থ হল, I shall love all men (বা আমি সব মানুষকে ভালবাসবো)। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, ইসলাম কখনও সব মানুষকে ভালবাসার কথা বলে না। **ইসলামী মতে মানুষ দু-রকমের, (১) মুসলমান ও (২) অ-মুসলমান কাফের।** ইসলাম এই কাফেরদের ভালবাসার কথা বলে না। কোরান মতে একজন **মুসলমানের পক্ষে সব থেকে পুণ্যের কাজ হল, কাফেরদের হত্যা করা।** তাই কোরানের নির্দেশ হল, **কাফেরদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদের ঘরবাড়িতে আগুন দাও, তাদের যথা সর্বস্ব লুট কর, তাদের মহিলাদের ধর্ষণ কর, তাদের শিশুদের আছাড় দিয়ে মেরে ফেল, ইত্যাদি ইত্যাদি।** কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ইসলাম সম্বন্ধে এই সব ডাহা মিথ্যা কথা তিনি লিখলেন

কেন? তাঁর এই মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে হিন্দু ঘরের কত মেয়ে যে মুসলমানকে বিয়ে করে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে তার খবর কে রাখে?

বর্তমানে বাবা লোকনাথ কলকাতা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে খুবই জনপ্রিয় ও জাগ্রত হয়েছেন। আর এই জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে তাঁর আশ্বাস যে, কোন হিন্দু রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যেখানেই হোক না কেন, বিপদে পড়ে লোকনাথ বাবাকে স্মরণ করলে বাবা তাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু লোকনাথ বাবার ভক্তদের এটুকু বিবেচনা করার শক্তি নেই যে, দেশ ভাগের প্রাক্কালে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমানদের দ্বারা নিহত হয়েছিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পাইকারী দরে যে হিন্দু হত্যা হয়েছিল, অথবা ১৯৯২ সালে অযোধ্যার মন্দির পুনর্নির্মাণের সময় বাংলাদেশে যে হিন্দু হত্যা ও হিন্দু নারী ধর্ষণ হয়েছিল, বাবা লোকনাথ তাদের রক্ষা করেননি কেন? দেশ ভাগের সময়, ১৯৪৮ সালে, লোকনাথ বাবার শেষ জীবনের বাসস্থান বারদি থেকে ২৫/৩০ মাইল দূরে, **ভৈরব পুলের ওপর এক ট্রেন ভর্তি হিন্দুকে কেটে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল**। লোকনাথ বাবা সেই অসহায় হিন্দুদের রক্ষা করেননি কেন? এবং আজও বাংলাদেশে যে সব হিন্দুরা মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নিগৃহিত হচ্ছেন, তাঁদের রক্ষা করার জন্য লোকনাথ বাবার কোন আগ্রহ নেই কেন? আসল কথা হল, হিন্দুরা আজ পরিণত হয়েছে একটা ক্লীব জাতিতে। তাই তারা নিজেদের রক্ষা করা জন্য নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে না, ভাবছে অন্য কেউ তাদের রক্ষা করবে।

লোকনাথ বাবার এই সব ক্লীব ভক্তের দল একটা চলচ্চিত্র তৈরি করেছে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে বাবা যোগবলে মক্কায় চলে গিয়েছেন। মক্কায় বাবা এক মৌলভীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেই মৌলভীকে তিনি বলছেন, আমি তোমার কাছে থেকে নেব কোরান আর তুমি আমার কাছ থেকে নেবে পুরাণ। অর্থাৎ, কোরান আর পুরাণ একই জিনিস। এর পর সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যে অংশটা দেখানো হচ্ছে তা হল, দেশে ফিরে বাবা তাঁর শিষ্যদের বলছেন যে, বাবা তাঁর জীবনে তিনজন খাঁটি বিপ্র দেখেছেন, যাদের মধ্যে মক্কার ওই মৌলভীটি একজন। এক জন সাত্ত্বিক ও সৎকর্মশীল ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনা করার মধ্য দিয়ে ওই ছবিতে ইসলাম ও তার মোল্লা মৌলভীদের সম্বন্ধে যে বিকৃত তথ্য প্রচার করা হয়েছে, তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে হাজার হাজার প্রিয়াঙ্কা মুসলমানকে বিয়ে করলেও তাদের কোন দোষ দেওয়া চলে না।

সকলেরই জানা আছে যে, দেশ বিভাগের প্রাক্কালে মুসলমানের তাড়া খেয়ে, বিগত ১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র পূর্ববঙ্গে পাবনার বসবাস তুলে দিয়ে ভারতের দেওঘরে এসে উঠেছিলেন। যেই মুসলমানের তাড়া খেয়ে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন, ভারতে এসে সেই মুসলমানদের গুরু মহম্মদ সম্পর্কে তিনি লিখলেন,

বুদ্ধ ঈশার বিভেদ করিস, চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে।
জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব, একই ওঁরা তাও জানিসনে।।

অথবা,

কৃষ্ণ রসুল যীশু আদি, নররূপী ভগবান।
তুমি যে তাঁদের মূর্ত প্রতীক, প্রেরিত বর্তমান।।

এই বাণীগুলিতে রসুল বলতে যে ইসলামের প্রবর্তক মহম্মদকে বলা হয়েছে, তা হয়তো কাউকে বোঝাতে হবে না। কাজেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র মহম্মদকে ভগবান কৃষ্ণের সমান বলেছেন। সেই রকম, গুজরাটের অহিংস অবতার তাঁর প্রার্থনা সভায় গীতা ও কোরান পাঠ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যে গীতা ও যা, কোরানও তাই। কাজেই এইসব কথায় বিভ্রান্ত হয়ে হিন্দু সমাজের কোন মেয়ে যদি কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে তবে তাকে কখনোই দোষ দেওয়া চলে না। তা ছাড়া এসব কিছুর ওপরে রয়েছে **শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ**। ***এই যত মত তত পথ*** কে ভুল ব্যাখ্যা দিতে মহেন্দ্র গুপ্ত বা মাস্টার মশাই শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে বলেছেন, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টানরা একই পুকুরের জল খাচ্ছে, কিন্তু হিন্দুরা বলছে জল, মুসলমানরা বলছে পানী আর খ্রীস্টানরা বলছে ওয়াটার। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এর থেকে ভুল প্রচার আর কি হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, ***যত মত তত পথ*** বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে চেয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের সাকার ও নিরাকার অথবা যে সব শাখা-প্রশাখাগুলো রয়েছে, যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গানপত্য ইত্যাদি, এগুলো সব সমান। কিন্তু সেই *যত মত তত পথ*-এর বিকৃত ব্যাখ্যা আজ হিন্দু সমাজের ধ্বংসের একটি কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, ***শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত***-তে যা লেখা আছে তা সব শ্রীরামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। শ্রী মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। তাই তাঁর পক্ষে রোজ দক্ষিণেশ্বর যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি শুধু রবিবার ও ছুটির দিনগুলোতেই দক্ষিণেশ্বর যেতেন। সেই কালে দক্ষিণেশ্বর যাবার যানবাহন বলতে ছিল নৌকো। তাই স্কুলের ছুটির পর দক্ষিণেশ্বর গিয়ে সেই দিনই দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরে আসা ছিল এক অসম্ভব কাজ। তাই রবিবার ও ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে মাস্টার মশাই অন্যান্য দিনগুলোতে ঠাকুর কি কি বলেছেন তা অন্যান্য ভক্ত ও চাকর বাকরদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করতেন এবং তা লিখে নিতেন। পরে বাড়িতে ফিরে তিনি নিজের জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করে গল্প খাড়া করতেন। এবং এভাবেই তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টানদের এক পুকুর থেকে জল খাবার গল্প তৈরি করেছেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ ***বেলুড় মঠের সাধুদের নিয়মাবলী*** গ্রন্থে বলেছেন যে, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে খুব কাছ থেকে ঠাকুরকে দেখেছেন, একমাত্র তাঁরাই ঠাকুরের বিষয়ে কিছু লেখার অধিকারী।

অথচ সেই স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনই আজ ***যত মত তত পথ***-এর মহেন্দ্র গুপ্ত কৃত ভুল ব্যাখ্যার প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব বিকৃত ব্যাখ্যা যাঁরা দিয়ে চলেছেন, তাঁরা ইসলাম সম্বন্ধেও কিছু জানেন না এবং কোরানে কি লেখা আছে তাও কোনোদিন পড়ে দেখেননি। অথচ কিছু না জেনেই তাঁরা এই সব ভুল ব্যাখ্যা করে

হিন্দু সমাজের সমূহ ক্ষতি করে চলেছেন। একটি হিন্দু মেয়ে কোন মুসলমানকে বিয়ে করলে হিন্দু সমাজের পক্ষে তা খুবই ক্ষতিকর। কারণ মুসলমানরা আগে তাকে মুসলমান বানাবে তার পর বিয়ে করবে। তাই কোন হিন্দু মেয়ের মুসলমান বিয়ে করার ফল হল হিন্দু সমাজের একজন সদস্য হ্রাস পাওয়া, পক্ষান্তরে, মুসলমান সমাজের এক জন সদস্য বৃদ্ধি পাওয়া। শুধু তাই নয়, ওই মেয়েটির গর্ভে যত সন্তান জন্মাবে, তারাও মুসলমান হবে। কাজেই শত্রুর সংখ্যা অনেক বাড়বে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, কোন একজন হিন্দু ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হলে শুধু এক হিন্দুর সংখ্যা যে একজন কমে তা নয়, হিন্দুর শত্রু একজন বাড়ে। গান্ধীজীও কোন হিন্দুর ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হওয়া মেনে নিতে পারেননি। তাই বড় ছেলে হীরালাল মুসলমান হলে তিনি আর্য সমাজের সাহায্যে তাকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। তাই কোন হিন্দু মেয়ে কোন মুসলমানের প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলে মেয়েটিকে দোষ দেওয়া যায় না, দোষ দিতে হয় আমাদের ধর্মগুরুদের, যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল কথা বলে তাদের বিভ্রান্ত করেছেন বা করে চলেছেন। যত শীঘ্র তাঁরা এসব বন্ধ করেন, হিন্দু মেয়েদের তথা হিন্দু সমাজের ততই মঙ্গল।

তার ওপরে আছে আমাদের সংবাদ মাধ্যম, সিনেমা ও নাটক-নভেল ইত্যাদি। আমাদের দেশে আজ একটা আজব প্রথা চলছে, তা হল—ইসলাম ও মুসলমানদের বিষয়ে কোন সত্য কথা বলা যাবে না এবং সব সময় ও সব ব্যাপারে মুসলমানদের ভাল দেখাতে হবে। গুজরাটের অহিংস নীতির প্রচারক মোহমদাস করমচাঁদ গান্ধীই যে এই বিচিত্র ভাবধারার প্রবর্তক তা বলাই বাহুল্য। এটাও বলতে কোন বাধা নেই যে, গান্ধী প্রবর্তিত এই ধারাকে অনুসরণ করেই আমাদের ধর্মগুরুরা ইসলাম সম্বন্ধে ভাল ভাল কথা লিখে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন। যাই হোক, এই ধারাকে অনুসরণ করে আমাদের নাটক-নভেল ও সিনেমা ইসলাম তথা মুসলমানকে মহান বলে প্রচার করে চলেছে। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার প্রচার করে চলেছে যে, ইসলাম একটি মহান সমাজতান্ত্রিক ধর্ম। কারণ ইসলামে কোন জাতপাতের বিভেদ নেই। আমীর ও গরিব মুসলমান একই মসজিদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে। **কিন্তু ইসলামের এই সৌভ্রাতৃত্ব যে শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অথবা ইসলাম যে আর সমস্ত মতবাদকে সমাপ্ত করে সমস্ত পৃথিবীকে একটি ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে চায়, সে ব্যাপারে আমাদের কমিউনিস্ট নেতারা একেবারে নিশ্চুপ।**

অনেক হিন্দু বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, বাংলাভাষী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ বাংলা ভাষাতে কথা বললেও তারা হল **ভারতে বসবাসকারী অভারতীয়**। ভারতের প্রতি তাদের কোন আনুগত্য নেই এবং তারা হল প্রথমত পাকিস্তানের অনুগত এবং ব্যাপক অর্থে আরবের অনুগত। ভারতের নদনদী, জল, বায়ু ও ভারতের মাটি তাদের কাছে পবিত্র নয়, তাদের কাছে পবিত্র হল আরবের মরুভূমির বালি ও মক্কার জমজম কূপের পানী। তারা ভারতে বসবাস করে বটে, **কিন্তু ভারতকে তারা মা বলে না। তাই তারা বন্দে মাতরম্ গায় না।**

তাই কোন হিন্দু মেয়ে যখন কোন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে, তখন তার পক্ষে মুসলমান সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলা শুধু কষ্টকর নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজের গোমাংস ভক্ষণ, বোরখা দ্বারা দেহকে সর্বক্ষণ আবৃতকরণ এবং সদা সর্বদা তিন তালাকের মাধ্যমে ঘর থেকে বিতাড়িত হবার আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ সবের পরেও আছে **স্বামীর দ্বারা অন্য পত্নী গ্রহণের মাধ্যমে সতীনের সঙ্গে ঘর করার করুণ অধ্যায়, কারণ যে কোন মুসলমানের এক সঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণের অধিকার আছে।** প্রিয়াঙ্কা টোডির পক্ষে কতটা অসুবিধার সৃষ্টি হত তা সহজেই অনুমান করা চলে। টোডিরা নিরামিশাষী। সেই নিরামিশাষী প্রিয়াঙ্কাকে রিজোয়ানদের বাড়িতে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে রান্না করা গোমাংস খেতে দিলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো তা বিশেষভাবে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

জহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা ফিরোজ খাঁকে বিয়ে করার পণ করলে গান্ধীজির পরামর্শে তাঁকে গোপনে লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার একটা মসজিদে তাঁকে মুসলমান করা হয়। তারপর তিনি ফিরোজ খাঁর সঙ্গে ঘর করতে থাকেন। কিন্তু রাজীবের জন্ম হবার পরে পরেই ফিরোজ খাঁ অন্য আরেক মহিলার সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে। এতে ফিরোজ খাঁর কোন অন্যায় হয়নি, কারণ মুসলমান হবার ফলে পক্ষে চারজন পত্নী রাখার বিধান আছে। কিন্তু ইন্দিরার পক্ষে সতীনের সঙ্গে ঘর করা সম্ভব হল না। তাই তিনি কাঁদতে কাঁদতে পিতৃগৃহেই ফিরে এলেন। অনেকেরই জানা নেই যে, হিন্দুদের বোকা বানাবার জন্য গান্ধী ফিরোজ খাঁ-কে দত্তক নিয়ে তার পদবী খাঁ-র বদলে গান্ধী লেখা চালু করেন। সেই হিসাবে **মুসলমানী ইন্দিরা ও তাঁর দুই মুসলমান ছেলে গান্ধী পদবী লিখতে শুরু করেন**। কিন্তু পুরীর মন্দিরের পূজারীরা মুসলমানী ইন্দিরাকে ও তাঁর দুই মুসলমান ছেলেকে কোন দিনও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে ঢুকতে দেননি। **ইন্দিরার মত শতকরা ৯৫ জন হিন্দু মেয়ের পক্ষেই মুসলমান স্বামীর** ঘর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই মুসলমান স্বামীর ঘর ত্যাগ করে পিতৃগৃহে ফিরে আসা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এ প্রসঙ্গে পাঠক শ্রীমতী সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ***কাবুলীওয়ালার বাঙালী বউ*** স্মরণ করতে পারেন।

মুসলমান সমাজের আরেকটি প্রথার কথা অনেকেরই জানা নেই। কোন স্বামী যদি রাগের বশে, বা মাতাল অবস্থায়, বা নিজের অজান্তে ঘুমের ঘোরে স্ত্রীকে তিনবার তালাক বলে দেয়, তা হলে কোরানের বিধান (২/২৩০) অনুসারে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সেই স্ত্রী তখন তার কাছে অবৈধ (বা হারাম) হয়ে যায়। সেই অবৈধ স্ত্রীকে স্বামী যদি ফিরে পেতে চায় তা হলে সেই স্ত্রীকে বৈধ (বা হালাল) করে নিতে হয়। এই জন্য অন্য **কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হয়। এবং সেই নতুন স্বামী তালাক দিলে পুরনো স্বামী আবার স্ত্রীকে ফেরত পেতে পারে।** এখানে আরও একটু লক্ষ্য করার বিষয় হল, দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে শুধু বিয়ে দিলেই হবে না, অন্ততপক্ষে একটি রাত তাদের এক সঙ্গে কাটাতে হবে। এই দ্বিতীয় স্বামীটিকে বলা হয় মুস্তাহেল।

মুসলমান সমাজের সাধারণ নিয়ম হল, একজন অজানা অচেনা কদাকার লোককে টাকার বদলে মুস্তাহেল নিয়োগ করা হয় এবং একরাত কাটাবার পর সে ওই রমণীকে চুক্তি অনুসারে তালাক দিয়ে দেয় এবং আগের স্বামী তখন তাকে আবার নিকা করে নেয়। কিন্তু সেই মুস্তাহেল যদি সেই মহিলাকে তালাক না দিয়ে ঘরে নিয়ে চলে যায় তাহলে কারোর পক্ষেই আর কিছু করার থাকে না। মুসলমান সমাজে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। তা হল, কোন আত্মীয় বা বন্ধুকে মুস্তাহেল নিয়োগ করা হল, কিন্তু পরদিন সকালে সে তাকে তালাক না দিয়ে ৩য় বা ৪র্থ স্ত্রী হিসাবে ঘরে নিয়ে তুলল। **কোন হিন্দু মেয়ের পক্ষে নারীত্বের এই চরম অপমান সহ্য করা সম্ভব না হবারই কথা।**

মুসলমান সমাজে একমাত্র গর্ভধারণকারী মা সেই মায়ের মেয়ে ছাড়া আর সকল রমণীকেই বিয়ে করা চলে। এমনকি বাবা মারা গেলে বিমাতাকেও বিয়ে করা চলে। এই কারণে **মুসলমান সমাজের এমন কোন গৃহবধূ নেই যে কোন নিকট আত্মীয়ের দ্বারা ধর্ষিতা হয় না।** প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই যৌন অত্যাচার মুসলমান গৃহবধূদের মুখ বুঁজে সহ্য করতে হয়। কারণ ইসলামী আইনমতে কোন মহিলা কোন পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনলে তার সমর্থনে তাকে চারজন পুরুষ সাক্ষী আনতে হবে, যা কখনই সম্ভব নয়। অন্যথায় সেই মহিলা ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে, যাঁর শাস্তি হল **পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা।** তাই যে কয়েকটা ঘটনা খবরের কাগজে আসে তা হিমশৈলের অগ্রভাগ মাত্র। বিশেষ করে শ্বশুরের দ্বারা ধর্ষিতা হবার ঘটনাই বেশি ঘটে থাকে এবং মুসলমান বিচারকরা এতে শ্বশুরের কোন দোষ দেখেন না, কারণ তা হলে **নবী মহম্মদকেও অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়।**

তাই এটা কোন অত্যুক্তি নয় যে, হিন্দু ঘরের মেয়েরা, যারা ইসলামের অ আ ক খ জানে না, একটা সাময়িক মোহের বশীভূত হয়ে তারা মুসলমান ছেয়ে বিয়ে করে বটে, কিন্তু তা কখনো সুখের হয় না। সব থেকে বড় কথা হল, ইসলামে নারীর কোন মানসম্মান নেই। **আরবের অসভ্য পশুপালক সমাজে উদ্ভূত ইসলামী শাস্ত্র মতে নারী শুধু একটি ভোগের সামগ্রী ও সন্তান উৎপাদন করার যন্ত্র মাত্র।** তাই সামান্য কারণে তাকে মারধর করা যায়, খাবার ও জল না দিয়ে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঘরে বন্ধ করে রাখা যায়, সর্বোপরি, তিন বার তালাক, তালাক তালাক বলে গৃহপালিত পশুর মতই ঘর থেকে বিতাড়িত করা যায়। কোরান বলছে, স্ত্রী হল শস্যক্ষেত্র, তাই তাতে যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা গমন করা চলে। তাই বলা চলে যে, **একটি অসভ্য দেশের অসভ্য ধর্মের দ্বারা চালিত একটি অসভ্য সমাজে সুসভ্য হিন্দু সমাজের মেয়েদের পক্ষে মানিয়ে চলা এক অসম্ভব কাজ। কাজেই এই ব্যাপারে হিন্দু মেয়েদের বার বার সতর্ক করা প্রয়োজন।**

সৌজন্যে ঃ সেভ ইন্ডিয়া মিশন, ৩১ মার্চ, ২০০৮

(কোরান, ৪/৩, ৭৪, ৭৬, ৯৪-৯৬, ১০১ ঃ ১২-৪০, ৪১, ৫৫-৭৫; ৯/৫, ১৪, ২৮, ২৯, ৩৩, ৬৮, ৭২, ৭৩, ১১১, ১১৩, ১২৩; ১৪/১৬-১৮; ২২/১৯, ২৩, ৭৮, ৪৭/১-১৫; ৪৮/২৮, ২৯; ৫৫/৪১-৭৮; ৫৬/১২-৯৬ ইত্যাদি)

মুসলিম সমাজের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ

এবছর (২০০৭) মে মাসে মহম্মদ জাফের ইয়াকুব হাসান আল জোরানি নামে ৭৩ বছরের বৃদ্ধ এক মুসলমান চোখের অপারেশন করাতে শারজা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে আসে। গত ৭ মে সে হাসিনা বেগম নামে ১৯ বছরের এক কিশোরীকে বিয়ে করে। মাত্র দুদিন পরে সে হাসিনাকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর ২৪ মে সে রুকসানা বেগম নামে ১৬ বছরের আর একটি কিশোরীকে বিয়ে করে। সমস্ত রকমের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে হাসিনা থানায় গিয়ে পুলিশকে সব জানায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ জোরানিকে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে পুলিশ শামসুদ্দিন নামে এক জন দালালকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানতে পারে যে শামসুদ্দিন হাসিনা ও জোরানির বিয়ের মধ্যস্থতা করেছিল এবং বিয়ের মোহর হিসাবে জোরানি হাসিনার বাবাকে ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিল। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, শারজার বাড়িতে জোরানির ২ জন বিবি ও ১১টি ছেলেমেয়ে রয়েছে।

অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ জানতে পারে যে, ২৪ মে রুকসানাকে বিয়ে করার কয়েকদিন পর জোরানি তাকেও তালাক দিয়ে তৃতীয়বার একটি কিশোরীকে বিয়ে করে। কিন্তু রুকসানা ও তৃতীয় সেই কিশোরীটি পুলিশকে কিছু না জানানোর ফলে তাদের ব্যাপারে পুলিশের কিছু করা সম্ভব হয়নি। দালাল শামসুদ্দিনকে জেরা করে পুলিশ আরও বেশ কয়েকজন দালারের হদিস পায় এবং তাদেরও গ্রেপ্তার করে। এদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে যে, অপরাধ জগতের এক বিরাট চক্র হায়দ্রাবাদে এই রমরমা কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ আরও জানতে পারে যে, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মুসলিম কাজিদের একটি চক্র। এই কাজিরাই শাঁসালো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধনী আরবদের সঙ্গে নাবালিকা ও কিশোরীদের ইসলামী নিয়ম মতে বিয়েশাদী করিয়ে দেয়। আহম্মদ শরিফ নামে এক কাজিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই কাজিই হাসিনা ও জোরানির বিয়ে দিয়েছিল। শামসুদ্দিনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে যে, সে এক প্রধান কাজির সাহায্যকারী মাত্র এবং সেই প্রধান কাজির মোট জনাকুড়ি সাহায্যকারী আছে।

হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকেই শুরু হয় এইসব চক্রের কাজ। দুবাই ও শারজা থেকে ধনী আরবেরা এখানেই এসে নামে এবং তাদের পিছনে তখনই

দালালরা লেগে পড়ে। দরদাম ঠিক হয়, তারপর কাজিদের মাধ্যমে ভারতীয় নাবালিকা ও কিশোরীদের সঙ্গে ধনী আরবদের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা সম্পন্ন হয়। এই সব ক্ষণস্থায়ী বিবাহ কয়েকদিন বা বড়জোর কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। পুলিশের অনুমান, প্রতি মাসে হায়দ্রাবাদে এরকম ৩৫ থেকে ৪০টা ক্ষণস্থায়ী বিবাহ হয়। অনেক আরব আবার তার বিয়ে করা বিবিকে দেশে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের দাসীবৃত্তি করে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়। এসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে হায়দ্রাবাদ পুলিশের অ্যাডিশনাল কমিশনার এ কে খাঁ বলেন, "আইনের সাহায্যে এইসব কাজ কারবার বন্ধ করা মুশকিল। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা হল আরবের ওই সব ধনকুবেরদের ওপর নজর রাখা এবং এভাবে তাদের অন্যায় কাজকর্মকে সীমিত রাখার চেষ্টা করা।"

শ্রী খাঁ সাহেবের উপরিউক্ত মন্তব্যের সারমর্ম হল, ওইসব আরব ধনকুবের ও হতভাগ্য ভারতীয় কিশোরীদের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ কোরান এবং ইসলামী আইন বা শরিয়াহ্ অনুসারেই হয়। উপরন্তু ইসলামে পুরুষের বহু বিবাহ স্বীকৃত। তাই সেই দিক দিয়ে পুলিশের কিছু করার থাকে না। শুধু সেই কিশোরী যদি নাবালিকা হয় তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয়।

ইসলামে বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র। বিবাহের আগে এই চুক্তিপত্র লেখা হয়। যাকে 'নিকাহ্নামা' বলে। নিকাহ্নামার মূল বিষয়বস্তু হল, দেনমোহর (বা মোহর) নির্ধারণ করা। ইসলামী আইনে স্বামীরই অধিকার আছে স্ত্রীকে তালাক দেবার। জনাব এম হিদায়াতুল্লা সাহেবের 'প্রিন্সিপালস্ অফ মহামেডান ল' (ত্রিপাঠী, ১৯৮০, ৩২৪ পৃষ্ঠা) বলছে যে, "স্বামী তিনবার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, স্থান-কাল নির্বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকরী হয়।" এব্যাপারে কোরান বলছে, "তালাক দুবার, পরে তাকে (স্ত্রীকে) যদি তালাক দেয় তবে সে (স্ত্রী) আর তার জন্য বৈধ হবে না। যে পর্যন্ত অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। তারপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে যদি তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে তবে তাদের পুনর্মিলনে আর কোন অপরাধ হবে না।" (ডঃ ওসমান গনী অনুবাদিত কোরান, ২/২২৯-২৩০)। এ ব্যাপারে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, হিন্দুর বিবাহ ও মুসলমানের 'নিকাহ' সমার্থবোধক নয়। ইসলামে নিকাহ হল একটা সামাজিক চুক্তি এবং আরবী শব্দ "নখ" থেকে নিকাহ শব্দ এসেছে। আরবি নখ বলতে বোঝায় নারীর গোপন অঙ্গ এবং নিকাহ্ বলতে বোঝায় কোন নারীর সেই গোপন অঙ্গের উপর অধিকার অর্জন করা।

কাজেই কোরান অনুসারে স্বামীর অধিকার আছে তিনবার তালাক বলে স্ত্রীকে ঘর থেকে বিদায় করার। সেই অবস্থায় স্বামী সেই তালাক দেওয়া পত্নীকে কিছু টাকা পয়সা দিতে বাধ্য থাকে, যাকে মোহর বলে এবং নিকাহ্নামায় ওই মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়।

স্বভাবতই কন্যাপক্ষ চায় মোহরের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে এবং বর পক্ষ চায় তা যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে। শেষপর্যন্ত মাঝামাঝি কোথাও রফা হয়।

যাই হোক, এ ব্যাপারে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে মুহূর্তে স্বামী তিনবার তালাক বলে স্ত্রীকে তালাক দেবে, সেই মুহূর্তে বিবাহচুক্তি বা নিকাহ্‌নামাও বাতিল হয়ে যাবে। এ নিয়ম শুধু নিকাহ্-র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা-র ক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তিটাই ক্ষণস্থায়ী এবং কয়েক ঘণ্টা, কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পরে বিবাহ চুক্তিটা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে হবে বিবাহ বিচ্ছেদ। এবং এজন্য স্বামীর তালাক দেবার আর প্রয়োজন থাকবে না। তবে তারও আগে তালাক চাইলে স্বামীকে প্রথা মাফিক তালাক দিতে হবে।

এই মুতা-র ব্যাপারে কোরান বলছে, "হে বিশ্বাসীগণ, যে সমস্ত উত্তম বস্তু আল্লা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তা তোমরা অবৈধ কোরো না, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (৫/৮৭)। কিন্তু শুধু এই খাপছাড়া আয়াতটি পড়ে বোঝার সাধ্য নেই যে এখানে উত্তম বস্তুই বা কি এবং সেই বৈধ উত্তম বস্তুকে অবৈধ করা এবং সীমা লঙ্ঘন না করার মধ্যে দিয়ে আল্লা কি বলতে চাইছেন। মুসলিম শরীফের ৩২৪৩ নম্বর হাদিসটি পড়লে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

যুদ্ধাভিযান বা জিহাদকালে স্বভাবতই স্ত্রীলোকের অভাবজনিত কারণে আল্লার প্রিয়তম বান্দারা কষ্ট পায়। তাই পরম দয়াময় দয়ালু (রহমানির রহিম) আল্লা উপরিউক্ত আয়াতের মাধ্যমে স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে আল্লার বান্দাদের অস্থায়ী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ করে দিচ্ছেন। কিন্তু যে কোন বিবাহের ক্ষেত্রেই আল্লা মোহর প্রদানকে আবশ্যিক করেছেন। কাজেই এক্ষেত্রেও মোহর না দিয়ে আল্লা তাঁর সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করছেন। তাই এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উল্লিখিত (৫।৮৭) আয়াতে আল্লা বৈধকর্ম বলতে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে অস্থায়ী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাকে, উত্তম বস্তু বলতে স্থানীয় রমণীদের এবং সীমালঙ্ঘন করা বলতে মোহর না দেওয়াকে বোঝাতে চাইছেন। সময় বিশেষে এক মুষ্টি ময়দা, কিছু খেজুর অথবা গায়ের জামাটাও মোহর হিসাবে চলতে পারে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে আরবের ধনকুবের হাসান আল জোরানি ভারতীয় কিশোরী হাসিনা বেগমের বাবাকে ৪০ হাজার টাকা মোহর দিয়ে হাসিনার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোন অন্যায় করেনি। বরং সে আল্লা নির্দিষ্ট বৈধ কর্মই করেছে। মেয়েটি নাবালিকা না সাবালিকা, সে ব্যাপারে আল্লার কোন নির্দেশ নেই। এ ব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে যে, নবী হজরত মহম্মদ তাঁর ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে নিকাহ্ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সভ্য জগতের আইন অনুসারে কেউ কোন নাবালিকাকে বিবাহ করলে সে ধর্ষণের অপরাধে অপরাধী বিবেচিত হবে। আর কোরান নির্দিষ্ট ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বিবেচিত হবে পতিতাবৃত্তি হিসাবে।

সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরবের ধনকুবেরদের হায়দ্রাবাদে এসে ভারতীয় নাবালিকাদের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা করা এবং তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা বর্তমানে সভ্য সমাজের আইনে নারীত্বের পণ্যায়ন (পতিতাবৃত্তি) এবং যৌন অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। হায়দ্রাবাদে এইসব অপরাধের সূচনা হয় আজ থেকে ১৪ বছর আগে। গত ১৯৯১ সালে ১১ বছর বয়সী আমিনা নামের একটি কিশোরীকে বলপূর্বক আরবের এক ধনকুবের বৃদ্ধের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিবাহ দেওয়া হয়। খবরটা জানাজানি হয়ে যাবার ফলে কিছুটা সোরগোলের সৃষ্টি হয় বটে, তবে সেই সোরগোল থেমে গেলে হায়দ্রাবাদের মেয়ে বাজারের ব্যবসা রমরমিয়ে চলতে থাকে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে দিয়ে 'কনফেডারেশন অফ ভলান্টারি এজেন্সিজ' নামক একটি সামাজিক সংস্থা (এন জি ও)-র অধিকর্তা জানাব মাঝার হোসেন বলেন, "এইসব (ক্ষণস্থায়ী) বিবাহ ছোট ছোট মেয়েদের পতিতায় পরিণত করছে।"

যে কোন সভ্য সমাজেই ইসলামের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা যে পতিতাবৃত্তি অথবা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একন বয়স্কা মহিলা ও একজন নাবালিকা ধর্ষণের মধ্যে অবশ্যই আইনগত প্রভেদ থাকা উচিত। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাতে নাবালিকা বা সাবালিকাকে ধর্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। অনেকের মতে, নাবালিকা ধর্ষণের মতো অপরাধকে মোকাবিলা করার জন্য আরও কঠোর আইন ও প্রাণদণ্ডের মতো চরম শাস্তির বিধান থাকা উচিত। আইন কঠোর হলে হায়দ্রারাদের নাবালিকারা আরবের ধনকুবেরদের যৌন স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবে।

মুসলিম সমাজে নারী ভোগপণ্য মাত্র

গৃহবধূ নাজমার বয়স ২৫ বছর। ওড়িশার ভদ্রক শহরে সে তার স্বামী শেখ শের মহম্মদ (ডাক নাম শেরু)-এর সঙ্গে বসবাস করত। তাদের ৪টি সন্তানও আছে। গত বছর (২০০৩ খ্রী:) জুলাই মাসের এক রাত্রে শেরু মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরলে নাজমার সঙ্গে তার ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হয়। তখন রাগের মাথায় শেরু তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে শেরু কিছুই মনে করতে পারে না। কিন্তু পড়শীরা এসে বলে, 'তোমাদের তালাক হয়ে গিয়েছে, তাই তোমরা আর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একসঙ্গে থাকতে পারবে না। এক সঙ্গে থাকতে হলে তোমাদের 'হালালা' করতে হবে। এই হালালা হল তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে নাজমার বিয়ে দিতে হবে এবং সেই ব্যক্তি তাকে তালাক দিলে শেরু আবার তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু নাজমা তাতে রাজি না হওয়ায় গত ২৩ মে পাড়া পড়শীরা নাজমা ও তার চার সন্তানকে ঘর থেকে বার করে দেয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে, তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেওয়াকে হিল্লা বিবাহ বলে।

একটি সামাজিক সংগঠন (Society for Weaker Communities)-এর সভানেত্রী শ্রীমতী সফিয়া শেখ নাজমা ও তার চার সন্তানকে আশ্রয় দেয়। অনক কট্টরবাদী মুসলিম সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমতী সফিয়াকে ভয় দেখানো হয়। কিন্তু তিনি তাতে কান না দিয়ে 'ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন' নামক একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলে ওই সংস্থার ৫ জনের একটি দল ঘটনার তদন্ত করা যায়। ওই দলের একজন সদস্যা শ্রীমতী নম্রতা চাড্ডা নাজমার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলে নাজমা তাকে বলে, 'হালালের নাম করে ওরা আমাকে পতিতাবৃত্তিতে নামিয়ে আনতে চায়।'

উপরিউক্ত তিন তালাক ও হালালার ব্যাপারে কোরান বলছে, 'তালাক দেবার পরে তাকে নিয়ম অনুযায়ী রাখতে পার অথবা সৎভাবে বিদায় দিতে পার...' (২/২২৯) 'অতঃপর সে যদি তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয় তবে সে আর তার জন্য বৈধ (হালাল) হবে না, যে পর্যন্ত না অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে সে বিবাহিত হবে। তারপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে (স্ত্রী ও প্রাক্তন স্বামী) মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে আর কোন অপরাধ হবে না' (২/২৩০)।

তালাক দেওয়া স্ত্রীকে হালালার মাধ্যমে পুনরায় গ্রহণ করার এটাই কোরানের চূড়ান্ত নির্দেশ। এই হালালা কার্যকর করতে মুসলমানরা রাস্তা থেকে অজানা অচেনা কদাকার এক

ব্যক্তিকে ডেকে আনে। তার সঙ্গে চুক্তি করা হয় যে, রাত্রে ওই স্ত্রীর সঙ্গে তার নিকা দেওয়া হবে এবং এক রাত্রি তার সঙ্গে কাটিয়ে ভোরবেলা সে তাকে তালাক দেবে। বদলে সে চুক্তি মাফিক পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় হবে।

আরবী শব্দ 'হালালা'-র অর্থ অবৈধকে বৈধ করা। আল্লার বিচারে যে স্ত্রী অবৈধ হয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার বৈধ করাই হল হালালা। আর যে ব্যক্তি এক রাত্রির জন্য নিকা করে হালালা করে, তাকে বলা হয় মুহাল্লিল বা বৈধকারী। Sir W. Muir ওই ব্যক্তিকে বলেছেন মুস্তাহেল (mustahel)। যে ব্যক্তির স্ত্রীকে মুহাল্লিল হালালা করল, তাকে বলা হয় 'মুহাল্লাল্লাহু' এবং পুরো ব্যাপারটাকে বলে 'তাহ্লিল'। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W Muir বলেছেন, "Many lovers or gallants cause less shame to a woman than one Mustahel" অর্থাৎ কোন মহিলার পক্ষে বহু প্রেমিক ও বীর নাগর থাকা একজন মুস্তাহেল থাকার চাইতে কম লজ্জাকর।' তিনি আরও বলেছেন, "It must not be forgotten that, all the immorality of speech and action connected with this shameful institution and the outrage done to the female virtue, not necessarily for any fault of the wretched wife, but the passion and thoughtlessness of the husband himself, has solely out of the verse (2/230) quoted above" (Life of Mehomet, Voice of India, P-337)."

অনেক পাঠক মনে করতে পারেন যে, মুহাল্লিলের সঙ্গে নিকা দিয়ে এক সঙ্গে রাত কাটাতে না দিলেই আর কোন ঝামেলা থাকেনা। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে শুধু নিকা দিলেই হবে না, এক বিছানায় রাত কাটাতেও দিতে হবে। এই ব্যাপারে মুসলিম শরীফের ৩৩৫৪ নম্বর হাদিস বলছে—একদিন একজন তালাক প্রাপ্তা রমণী মহম্মদের কাছে এসে বলল যে, সে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়। ...শুনে মহম্মদ একটু হাসলেন এবং বললেন, 'না, তা তুমি পার না, যতক্ষণ না তোমার নতুন স্বামী তোমার মাধুর্য উপভোগ করছে এবং তুমি তার মাধুর্য উপভোগ করছ।'

মুসলিম সমাজে এমন ঘটনাও অনেক ঘটে, যেখানে কোন একজন বন্ধু বা আত্মীয়কে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে মুহাল্লিল নিয়োগ করা হল, কিন্তু সে কথা রাখল না। তালাক না দিয়ে সে সেই মহিলাকে তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে বাড়ি নিয়ে গেল। এসব ঘটনা অনেক ঘটলেও, সাধারণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালেই তা থেকে যায়। যে দু'একটা ক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমা হয়, সে গুলোই সাধারণ মানুষ জানতে পারে।

গত জুলাই মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত হল 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' 'বা' বা আই এম পি এল বি'-র কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। মুসলিম মহিলা সমাজ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান বুদ্ধিজীবী আশা করেছিলেন যে, কর্তাব্যক্তিরা তিন তালাকের ব্যাপারে কিছু উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দেবেন। তিনবার 'তালাক' বলে গৃহপালিত পশুর মত স্ত্রীকে (কোনরকম খোরপোষ না দিয়েই) ঘর থেকে বিতাড়িত করার মত অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলা সমাজ অনেকদিন থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। কিন্তু

৫২ সদস্য বিশিষ্ট 'এ আই এম পি এল বি'র কার্যকরী সমিতি বিষয়টা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলেও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রাখে।

অনেকে ভেবেছিল যে, নিকাহনামার কোন মৌলিক পরিবর্তন না করলেও বোর্ডের কার্যকরী সমিতি নিকাহ্‌নামার সঙ্গে হিদায়াৎ নামা নামে একটা সংশোধনী যুক্ত করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বোর্ড কোন রকম সংশোধনী কার্যকর করা থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বোর্ডের সদস্য জাফরিয়ার জিলানি বলেন, 'তিন তালাকে প্রথাকে রদ করার কোন উদ্দেশ্য বোর্ডের ছিল না। এ ব্যাপারে বোর্ডের উদ্দেশ্য হল মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা।' বোর্ডের আর এক মাননীয় সদস্যা বেগম ইফতাদার বলেন, নিকাহ্‌নামাকে সংশোধন করা বা হিদায়াৎনামা যুক্ত করার কোন উদ্দেশ্যই বোর্ডের ছিল না। তবে এটা ঠিক যে, হিদায়াৎনামা যুক্ত করা হলে তিন তালাকের অপপ্রয়োগ অনেক কম হবে।

এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, ইসলামে বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র। বিবাহের আগে এই চুক্তিপত্র লেখা হয়। যাকে নিকাহ্‌নামা বলে। নিকাহ্‌নামার মূল বিষয়বস্তু হল দেনমোহর (বা মোহর) নির্ধারণ করা। ইসলামী আইনে শুধু স্বামীরই অধিকার অছে স্ত্রীকে তালাক দেবার। এ ব্যাপারে জনাব এম হিদায়াতুল্লা-র 'প্রিন্সিপল্‌স্ অফ মহমেডান ল' (ত্রিপাঠী, ১৯৮০, পৃঃ ৩২৪) বলছে, "স্বামী তিনবার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল নির্বিশেষে করলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকরী হবে।" আজকের বিজ্ঞানের যুগে, টেলিফোন মারফৎ স্ত্রীকে 'তালাক' শব্দ শোনালেও সঙ্গে সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, উপরিউক্ত ইসলামিক পার্সোনাল ল' বোর্ডের নিয়ম অনুসারে স্বামী যদি একটি পোস্ট কার্ডে তিনবার তালাক লিখে পাঠায় তবে সেই পোস্ট কার্ড স্ত্রীর হাতে পৌঁছানো মাত্র বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ার এক মুসলমান ৫ মিনিটের মধ্যে এস এম এস পাঠিয়ে ৩ বিবিকে তালাক দেয়।

যাই হোক, এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'এ আই এম পি এল বি'-র সেক্রেটারি সৈয়দ নিজামুদ্দিন বলেন, 'ভবিষ্যতে নিকাহ্‌নামায় দার-উল-কাজা বা কাজির হস্তক্ষেপ-এর বিধান রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য হলে কোন একজন কাজিকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে।' তিনি আরও বলেন যে, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশ এবং আরও কিছু রাজ্যে দার-উল-কাজা ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। তা ছাড়া অনেক রাজ্যে চালু করা হয়েছে তালাক-এ-সুন্নৎ, যার ফলে একই সঙ্গে তিনবার তালাক বললে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। প্রতিমাসে একবার করে তিন মাসে তিনবার তালাক বললে তবেই বিবাহবিচ্ছেদ হবে। তবে এ সব কথা শুধু মুখের কথা মাত্র এবং কার্যক্ষেত্রে এ সবের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। সৈয়দ নিজামুদ্দিন আরও বলেন যে, শিয়া-সুন্নী ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে নানান দল উপদল রয়েছে। তাই তালাকের মত একটা বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই অসুবিধাজনক।

প্রখ্যাত মুসলমান বুদ্ধিজীবী আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার একটি প্রবন্ধে (Islamic Voice—July, 2004) বলেন, "এই বিশ্বে একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রথম নারী জাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে এবং কোরান সর্বপ্রথম নারী ও পুরুষের ভেদাভেদকে অস্বীকার করেছে।" প্রত্যেক মুসলমান বুদ্ধিজীবীকেই এইসব কথা বলতে হয়, কারণ তা না হলে তাঁর গর্দানের বিপদ দেখা দেবে। সেই একই কারণে কলকাতার লেখক জনাব রফিকুল্লাহ্ বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে নারী জাতিকে মর্যাদা দানই হল হজরৎ মহম্মদের সংস্কারমূলক কর্মগুলির অন্যতম।' কিন্তু যে কেউ ইসলামি শাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন করলেই দেখতে পারেন যে, নারী জাতিকে মর্যাদা দানের ব্যাপারে আল্লা ঘোরতর অনিচ্ছুক। কাজেই সেই অনিচ্ছুক আল্লাকে অতিক্রম করে এ কাজে মহম্মদ যে খুবই কম কৃতকার্য হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। মুসলিম সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন দেখা যায় যে মুসলিম দেশগুলোতে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হিসাবে আদালতে গ্রাহ্য হয়। কোন নারী ধর্ষিতা হলে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হয়। অন্যথায় সে নারী পরপুরুষগামিনীর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যার শাস্তি হল, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা। যে সমাজে মেয়েদের বোরখায় ঢেকে রাখা হয় ও গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়, সে সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

মুসলিম সমাজে নারীজাতি কতখানি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা তা খুব ভালভাবে ফুটে ওঠে, যখন আল্লা বলেন, 'পুরুষ নারী কর্তা, কারণ আল্লা এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর এ শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, পুরুষ নারীর (ভরণপোষণের) জন্য টাকা খরচ করে। কাজেই সাধ্বী নারী লোকচক্ষুর অন্তরালে আনুগত্য ও ইজ্জৎ রক্ষাকারিণী। ...স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর প্রথমে তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর' (কোরান-৪/৩৪)।

অর্থ খরচ করে একজন পুরুষ অনেক কিছুর ওপরই অধিকার অর্জন করতে পারে, যেমন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, দাসী, রক্ষিতা, বারবণিতা, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য ভোগের সামগ্রী। কাজেই কোরান অনুসারে মুসলিম সমাজে নারীর স্থান এসবের থেকে মর্যাদা সম্পন্ন কিনা তা সুধীজনের বিচার্য। উপরন্তু, বহু বিবাহ ও তিনবার তালাক বলে যে কোন স্ত্রীকে বিতাড়িত করার অধিকার পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে ইসলাম নারীকে পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার একটি ভোগ্যপণ্যে পর্যবসিত করেছে কিনা, সেটাও সুধীজনের বিচার্য।

এর থেকেও বড় কথা হল, 'এ আই এম পি এল বি'-র পক্ষে ইসলামী বিবাহ আইন পরিবর্তনের অক্ষমতা এটাই প্রমাণ করে যে নিজেকে যুগোপযোগী করে নেবার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের নেই। তাই বলা যেতে পারে, এই কারণেই ইসলাম পৃথিবীর মাটি থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম টিকে থাকবে কারণ, নিজেকে যুগের উপযুক্ত করে নেবার ক্ষমতা হিন্দু ধর্মের আছে।

ভারতীয় সমাজকে কলুষিত করছে আরবের নোংরা

গত ৪ঠা জুন (২০০৫ খ্রিঃ) তারিখের ঘটনা। উত্তর প্রদেশের মুজাফ্‌ফরনগর শহরের ১৫ কিমি দূরে চারথাওয়াল গ্রাম। সেখানে ৬৫ বছরের প্রৌঢ় আলি মহম্মদ ওই দিন তার ২৮ বছরের পুত্রবধূ ইমরানা বিবিকে ধর্ষণ করে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে বিচারের ভার পড়ল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মৌলবাদীর ওপর। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রামের পঞ্চায়েত থেকে ফতোয়া জারি করা হল যে, স্বামী নূর মহম্মদের সঙ্গে ইমরানার বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে গিয়েছে, কারণ স্বামীর কাছে সে অবৈধ বা হারাম হয়ে গিয়েছে। আপাতত ইমরানাকে তিন মাস আলাদা থাকতে হবে এবং তারপর ধর্ষণকারী শ্বশুর অলি মহম্মদের সঙ্গে তাকে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে ঘর করতে হবে এবং স্বামী নূর মহম্মদকে ছেলের মতো দেখতে হবে। এই হল মুসলীম সমাজের বিচারের নমুনা। যে শ্বশুর অপরাধ করল, তার কোন সাজা হল না, বা তাকে কোন শাস্তি বা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল না, লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল ৫ সন্তানের জননী নিরপরাধ পুত্রবধূ ইমরানাকে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে নিকটবর্তী বিজনোর জেলার হারওয়ালী গ্রামের আর এক মুসলমান পুত্রবধূর কথা। সে গত মে মাসে তার এক বাল্যবন্ধুকে প্রেম করে বিয়ে করে। কিন্তু গ্রামের পঞ্চায়েতের মুরুব্বিরা এই বিয়ে অস্বীকার করে। হৃদয় পরিবর্তন করার নাম করে তার ওপর মারধোর চালায় এবং বলতে বাধ্য করে যে তারা ভাই বোন। অথবা স্মরণ করা যেতে পারে উড়িষ্যার ভদ্রক শহরের মুসলমান গৃহবধূ নাজমার কথা। গত বছর এক রাতে তার স্বামী শেখ শের মহম্মদ (বা শেরু) মদ্যপ অবস্থায় ঝগড়ার সময় রাগের বশে তিনবার "তালাক" শব্দ উচ্চারণ করে ফেলে। পরদিন সকালে শেরু সব ভুলে যায়। কিন্তু পড়শীরা বলে যে, তারা আর স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারবে না, কারণ তাদের তালাক হয়ে গিয়েছে। শুধু তা বলেই ক্ষান্ত থাকে না। চারটি শিশু সন্তানসহ তারা তাকে তার স্বামীর ঘর থেকে জোর করে বের করে দেয়।

যাই হোক, অনেক মুসলমানও ইমরানার ব্যাপারে পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ও দার-উল-উলুমের মৌলবীদের ফতোয়াকে একটি বর্বর সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। অল ইণ্ডিয়া ডেমোক্রেটিক উইমেন অ্যাসোসিয়েশন (বা AIDWA)-এর পক্ষ থেকে এই ফতোয়াকে চূড়ান্তভাবে প্রগতি বিরোধী বলা হয়েছে। কিন্তু শরীয়তি আইনের ভারতীয় রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিচিত হল ইন্ডিয়া মুসলীম পার্সোনাল ল বোর্ড (AIMPLB) ওই ফতোয়াকে স্বাগত জানায়। পক্ষান্তরে অল ইন্ডিয়া মুসলীম

উইমেন পার্সোনাল ল বোর্ড (AIMWPLB)-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই ফতোয়ার মধ্য দিয়ে মৌলানারা পুরুষ শ্বশুরকে বাঁচাতে, শুধু নারী বলেই নিরীহ পুত্রবধূ ইমরানাকে ওই জঘন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। উক্ত সংস্থার সভানেত্রী শ্রীমতী শাইস্তা অম্বর বলেন, এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিলে ভবিষ্যতে অনেকে তাদের স্ত্রীদের বা অন্য কোন মহিলার দায়িত্ব এড়াতে এই একই পথ গ্রহণ করবে। অথবা কামনায় তাড়িত কোন পুত্রবধূকে সুযোগ মত একদিন ধর্ষণ করে তার স্বামীর অধিকার অর্জন করবে। ভারতীয় মুসলিম সমাজের আর এক সম্মানিত নেতা মৌলানা মুফতি রাজাউল্লা আব্দুল করিম বাদানি ওই ফতোয়ার নিন্দা করতে গিয়ে বলেন, 'কোন গর্হিত কাজ সমাজের কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারে না।'

অল্প কিছুদিন আগে ভারতের শিয়া মুসলমানরা অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে। এই সংস্থার নেতারা উপরিউক্ত দেওবন্দি ফতোয়ার নিন্দা করে বলেন, 'ইমরানার ওপর বলাৎকারের সঙ্গে তার বৈবাহিক জীবনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।' তাদের এই উক্তির সমর্থনে তারা একটি হাদিস উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, "অবিশ্বাসের কাঠগোড়ায় বিশ্বাসকে বলি দিও না।" অথচ লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই সব তর্ক বিতর্ক সত্ত্বেও AIMPLB-এর কার্যকরী সমিতির এক মাত্র মহিলা সদস্যা শ্রীমতী বেগম নাসিম ইফতেদার আলি দেওবান্দি ফতোয়াকে সমর্থন করেন এবং বলেন, 'শ্বশুরের বদলে অন্য কোন পুরুষ ইমরানাকে বলাৎকার করলে সে তার স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারতো। কিন্তু তার বৈবাহিক সম্পর্ক যখন তার শ্বশুর ভঙ্গ করেছে, তাই তার শাস্তি ইমরানা ও তার স্বামীকেই বহন করতে হবে।'

এইসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে AIMPLB-র এক শরীয়তি আইন বিশেষজ্ঞ শ্রী জাফরিয়ার জিলানি বলেন, 'এ রকম একটা জটিল ব্যাপারে ইসলামী আইনের বহু ভাষ্যকারের বহু মতামত বিদ্যমান রয়েছে। সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ শরীয়তি আইনের হানাফির ভাষ্যকে অনুসরণ করে। এই হানাফি পন্থী আলিমদের মতে যদি কোন শ্বশুর তার পুত্রবধূকে ধর্ষণ করে, তবে তার বৈবাহিক সম্পর্কও ছিন্ন হবে। কিন্তু শাফেয়ী বা মালিকি পন্থীদের মত হল, 'কোন অবৈধ সম্পর্কের ফলে কোন বৈধ সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে না।'

এ ব্যাপারে জাফরিয়ার জিলানির মত অনেকটা বাস্তব সম্মত। তিনি বলেন, "এই ধরণের সমস্যা সমাধানের সব থেকে ভাল উপায় হল, অভিযুক্ত ধর্ষণকারী যেই হোক না কেন, তার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা এবং সেই অর্থ ধর্ষিতাকে দিয়ে দেওয়া।" তিনি আরও বলেন, 'এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ধর্ষণকারীর কাছ থেকে আর্থিক জরিমানা আদায় করার কথা কেউই বলছে না।'

উপরিউক্ত বাদানুবাদ থেকে এটাই পরিষ্কার হচ্ছে যে, ইমরানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলীম সমাজের আইন-কানুন বিষয়ে দেশব্যাপী এক তর্ক-বিতর্কের ঝড় আসন্ন হয়েছে। সব

...কে বড় কথা হল, ভারত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইসলামী ফৌজদারী আইন মতে ধর্ষণকারী শ্বশুর আলি মহম্মদকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা (বা রজম করা) উচিত। কিন্তু সেই আইন ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৩৬ সালে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু একনিষ্ঠ ইসলাম ভক্তদের মধ্যে কেউই আলি মহম্মদকে রজম করার কথা বলছে না। সেই আইন বাতিল করে ১৯৩৭ সালে যে আইন হয়েছে, শুধু সেই কথাই বলছে। এই সূত্র ধরেই এলাহাবাদের উচ্চ আদালতের আইনজ্ঞ এবং শরীয়তি আইনে সুপণ্ডিত শ্রী এম এ কাদির খাঁ বলেন যে, 'শরীয়ত অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্ট ১৯৩৭-কে ভিত্তি করেই বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

উপরিউক্ত আলাপ আলোচনার মধ্যে একটা বিষয় হয়তো সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, মুফতি মৌলবি ও মোল্লা-কাজীর দল, সকলেই ধর্ষক শ্বশুর নরপশু আলি মহম্মদকে রক্ষা করতে ও তার অপরাধ আড়াল করতে ব্যস্ত। এর কারণ কি? এর কারণ হল শ্বশুর আলি মহম্মদ আজ যে জানোয়ারসুলভ কাজ করেছেন, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নবী রসুলুল্লা মহম্মদ (সাল্লাল্লাহ আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশাতেও ওই একই কাজ করে গিয়েছেন। কাজেই পুত্রবধূকে ধর্ষণ করার জন্য আজ যদি আলি মহম্মদকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে একই যুক্তিতে নবী হজরত মহম্মদকেও দোষী করে নিন্দা করতে হয়। মুসলমান সমাজ হল ক্রীতদাসের সমাজ। সেখানে কারও সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই। যে কোন মুসলমান ইচ্ছা করলে আল্লার সমালোচনা করতে পারে। কিন্তু মহম্মদকে সমালোচনা করার তার কোন অধিকার নেই। মহম্মদকে শুধু প্রশংসাই করতে হবে এবং তার সব কাজের মধ্যেই পবিত্রতা আবিষ্কার করতে হবে। শেষ বয়সে ২২জন বিবির হারেম তৈরি করা, ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে নিকা করা, ৫৪ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে নিকাহ করা, এক দিনের মধ্যে ৮০০ কুরাইজা ইহুদীর নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করা সেই রাত্রেই কুরাইজা সুন্দরী রিহানাকে ধর্ষণ করা, খয়বর আক্রমণ করে সেখানকার কানুইকা ইহুদীদের ঝাড়েবংশে শেষ করে সেই রাত্রেই কানুইকা সুন্দরী সফিয়াকে শয্যা সঙ্গিনী করা ইত্যাদি জঘন্য কাজকর্মের মধ্যেও পবিত্রতা আবিষ্কার করতে হবে। মহম্মদের প্রশংসা করতে হবে। আমাদের দেশের মুসলমান লেখকরা মহম্মদের এই সব কাজকর্মকে জীবনীমুখী দর্শন বা বলিষ্ঠ জীবনবাদ আখ্যা দিয়ে থাকেন। কারণ সত্য কথা লিখলে তাদের গর্দানের বিপদ দেখা দেবে।

তবে অন্ততপক্ষে এক জন মুসলমান লেখক ভয়ভীতি কাটিয়ে আজ স্পষ্টবাদিতার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার পানানগর গ্রাম নিবাসী শ্রী গিয়াসুদ্দিন মহাশয়। ইমরানার ঘটনার মত অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়টি নিয়ে গত ১৩ই জুলাই তিনি "দৈনিক স্টেটসম্যান" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের পাঠ করা উচিত। ওই প্রবন্ধে তিনি নবী মহম্মদেরও সমালোচনা করতে ছাড়েনি। এটা খুবই সাহসের কাজ। কারণ ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলবির দল আল্লার সমালোচনা শুনতে রাজি হতে পারে, কিন্তু তারা

মহম্মদের সমালোচনা সহ্য করতে রাজি নয়। যে কেউ মহম্মদের বিরূপ সমালোচনা করলে তারা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইসলাম বর্জনকারী আখ্যা দিয়ে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করবে।

দ্বিতীয় যে কারণের জন্য মুসলমান আইনজ্ঞরা ধর্ষণকারী আলি মহম্মদকে শাস্তি না দিয়ে শুধু ইমরানাকে শাস্তি দেবার কথা বলছে, তা হল, মুসলমান সমাজে নারীর মান-সম্মান তো দূরের কথা, শুধু মানুষ হিসাবেও কোন স্বীকৃতি নেই।

মুসলমান সমাজে নারী হল পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার এবং সন্তান জন্ম দেবার একটা যন্ত্র বিশেষ। তাই কোন মুসলীম দেশে ধর্ষিতা নারী সুবিচার পায় না। কারণ ইসলামী আইন অনুসারে সেই ধর্ষিতা নারীকে তার স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। অন্যথায় সে নিজে ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হবে, যার সাজা হল পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা। এই কারণে ধর্ষিতা নারীদের পক্ষে নীরবে সমস্ত যৌন অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। এই কারণে যে সব মুসলমন যুবক দূরে বা বিদেশে চাকরী করতে যায় তাদের স্ত্রীরা প্রতিদিন তাদের শ্বশুরদের দ্বারা ধর্ষিতা হলেও তা প্রকাশ করার কোন উপায় থাকে না।

সম্প্রতি পাকিস্তানে পঞ্চায়েত প্রধানরা ভাইয়ের অপরাধের শাস্তি হিসাবে বোন মুখতারন মাঈ-কে গণ ধর্ষণের আদেশ দেয়। সেই অনুসারে ১২ জন যুবক তাকে ধর্ষণ করে। কিন্তু ইসলামী আদালত ওই ১২ জন ধর্ষণকারীকে বেকসুর খালাস করে দেয়, কারণ মুখতারন চারজন পুরুষ সাক্ষী আদালতে হাজির করতে পারেনি। সাক্ষী আনতে না পারার দরুণ আদালত ডাক্তারি পরীক্ষা ও অন্যান্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করে। মুসলীম সমাজে প্রতিদিন এ রকম ঘটনা যে কত ঘটছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যে সামান্য কয়েকটি ঘটনা পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত যায়, কেবলমাত্র সেগুলোর কথাই সাধারণ মানুষ জানতে পারে। ইমরানার ঘটনা খবরের কাগজে প্রকাশিত হবার পর এরকম আরও অনেক ঘটনার সংবাদ খবরের কাগজগুলোর অফিসে আসতে শুরু করে। সেই সব অভিযোগকারিণীরা জানায় যে, বেশির ভাগ গৃহবধূই শ্বশুরের যৌন অত্যাচার নীরবে মেনে নেয়। ইমরানা পুলিশের কাছে নালিশ করেছিল বলেই তার ঘটনা লোক সমাজে জানাজানি হয়েছে। তখন আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বেশ কয়েকজন ইমরানা গোপনে তাদের দুঃখের কথা সংবাদ মাধ্যমকে জানায়।

ইমরানার ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। এই সব দলগুলোর বেশির ভাগই মুসলমান তোষণ ও মুসলীম ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করে থাকে। মোল্লা মুলায়ম সিং-এর সমাজবাদী দল ও কংগ্রেস এই মেকি সেকুলারবাদী দলগুলির অন্যতম। তাই ধর্মান্ধ মুসলীম মোল্লাদের মনে বিন্দুমাত্র রোষের উদয় হয় এমন কোন কথা তাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যে রাজ্যে ইমরানার ঘটনা ঘটেছে সেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোল্লা মুলায়ম সিং তিলমাত্র দেরি না করে মুসলীম ধর্মান্ধদের পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মুসলীম নেতারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করেই ফতোয়া জারি করেছেন।'

বি জে পি ও সি পি এম ইমরানার পক্ষেই তাদের মতামত জানিয়েছে। সি পি এম এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রকাশ কারাত ঘোষণা করেছেন, শরীয়তি আইন নয়, ভারতবর্ষের সেকুলার আইনের সাহায্যেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।' দেওবন্দি ফতোয়াকে তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, সি পি এম-এর প্রগতিশীল মহিলা সমিতি কিন্তু এখনও চুপ করে আছে। নারী নির্যাতনের ব্যাপারে ও নারীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তাঁরা নাকি সর্বাগ্রে থাকেন। কিন্তু ইমরানার ব্যাপারে তাঁরা এখনও চুপ আছেন কেন?

আসল কথা হল, ভোটের লোভে মুসলমান তোষণের ক্ষেত্রে সি পি এমও কোন অংশে কম যায় না। তাই ইমরানার ব্যাপারে তাঁরা 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানী' পলিসি নিয়েছেন। তাঁদের ইচ্ছা মুলায়মের মত তাঁরাও দেওবন্দি ফতোয়াকে সমর্থন করেন। কিন্তু অসুবিধা হল এ রকম একটি মধ্য যুগীয় ফতোয়াকে খোলাখুলি সমর্থন করলে তাদের প্রগতিশীলতার গায়ে কালি লাগতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুসলীম নেতা শ্রী সলমন খুরশিদ বলেন, 'আমরা সকলেই চাইব দেশের আইন (সংবিধান) অনুসারেই এই ঘটনার বিচার করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'মুসলীম ভোটব্যাঙ্কের দ্বারা চালিত হয়ে মুলায়েম সিং যেভাবে মোল্লাদের পক্ষ নিয়েছেন তা সত্যিই খুব লজ্জার।' অনেক দল আবার এটাকে মুসলীম সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করে।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বি জে পি-র মুখপাত্র অরুণ জেটলি বলেন, 'ভারতের মত দেশে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি কতটা জরুরী, ইমরানার ঘটনা তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সমস্ত দেশ আজ ইমরানার ব্যাপারে চিন্তিত। এই ঘটনা আরও প্রমাণ করছে যে, মুসলীম শরীয়তি আইনের নবীকরণ কতটা জরুরী!'

সব থেকে বড় কথা হল, বেদ উপনিষদের দেশ এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লোপামুদ্রার দেশে জন্মগ্রহণ করেও আজ ইমরানা সেই সনাতন ও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য ও সর্বাপেক্ষা মানবিক ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তার পূর্বপুরুষ কোন এক অতীতে বর্বর ও নিরক্ষর পশুপালক আরবের জঘন্য আরবী ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং আজ ইমরানার মত লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মেয়েকে তার খেসারৎ দিতে হচ্ছে। তারা নিকট আত্মীয়ের দ্বারা যখন তখন ধর্ষিতা হচ্ছে, তিন তালাকের অভিশাপে স্বামীর ঘর থেকে পশুর মত বিতাড়িত হচ্ছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে, বোরখার আচ্ছাদিত হয়ে, বছর বছর সন্তান জন্ম দিয়ে রক্তহীনতায় ভুগে এক নরকের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। ইমরানার মত লক্ষ লক্ষ হতভগিনীর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে এটাই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আরবের নোংরা এই সনাতন ভারতীয় সমাজকে কিভাবে কলুষিত করেছে এবং করছে।

ইসলাম কি বিলুপ্তির পথে?

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাজধানী মুজফ্ফরাবাদ। কাছেই পাইন গাছের অরণ্য। আসরের (বিকালের) নামাজের পর সেখানে জড়ো হয়েছে ২৫০ জন যুবক। বেশীর ভাগের বয়সই কুড়ির নীচে। ডজন খানেক যুবক একে-৪৭ রাইফেল, মেশিন গান ও আরও নানারকম গোলা বারুদ নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ভেসে এল গোলাগুলির আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল জনা আষ্টেক গেরিলা। বালির বস্তা সাজিয়ে তৈরী করল এক নকল শত্রু ঘাঁটি। কাছে বসালে এক শক্তিশালী বোমা। দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই বোমা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দিল সে নকল শত্রু বাংকার। তিন মিনিট সময়ই তাদের দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল করে ফিরে আসতে পারায় তারা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। এরাই হল মুজাহিদীন বা ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের বীর যোদ্ধা। কাশ্মীরের মুসলমানদের ভারত সরকারের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য এরা বদ্ধপরিকর। ইসলামের এই পবিত্র কাজের জন্য এদের জীবন উৎসর্গীকৃত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০০ ফুট উপরে এটা এক জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির। এরকম আরও অনেক প্রশিক্ষণ শিবির নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এরা হাতিয়ার হাতে চোরা গোপ্তা পথে ভারতে প্রবেশ করবে। তারপর হয় কোথাও নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মারবে। নয়তো বাজার হাটের মত কোন জনাকীর্ণ জায়গায় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটাবে। অথবা কোথাও রেললাইন বা রেল স্টেশন উড়িয়ে দিয়ে নরসংহার করবে। মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করবে। কারণ ভারতবর্ষ এককালে মুসলমানদের অধীন ছিল, আবার তাকে মুসলমানদের পদানত করতে হবে। এক কালের দার-উল-ইসলাম ভারত আজ দার-উল-হারব হয়েছে, আবার তাকে দার-উল-ইসলাম করতে হবে। ভারতে আল্লার রাজ্য কায়েম করতে হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অ-মুসলমান কাফের হত্যা করা পুণ্যের কাজ। কাফের হত্যা করে তাদের ধন সম্পদ লুট করা, জমি জায়গা দখল করা পুণ্যের কাজ। সর্বোপরি জিহাদ বা এই হত্যা ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করা পুণ্যের কাজ। আল্লা একদিনের জিহাদকে হাজার দিনের নামাজের পুণ্যের সমান করেছেন। জিহাদ করবার পক্ষে

নামাজ, রোজা ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। জিহাদ করে যে মারা যাবে সে হবে আল্লার প্রিয় পাত্র গাজী। স্বর্গে এই গাজীর হবে বিশেষ সম্মানীয় অতিথি।

বর্তমানে এ রকম ১৪টি জঙ্গি সংস্থা সক্রিয় রয়েছে যারা আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতে ঢুকছে। উপরে যে শিরিটির বর্ণনা দেওয়া হল সেটা অপেক্ষাকৃত নতুন সংগঠন 'লস্কর-ই-তইবা' বা নবীর সৈন্যদল এর শিবির। এখানে নবী বলতে ইসলামের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদকে বুঝতে হবে। বর্তমানে যে সব জঙ্গিরা কারগিল সীমান্তে ঢুকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাংকার দখল করে আছে তাদের মধ্যে এই "লস্কর-ই-তইবা"র লোকই বেশী। সেই সঙ্গে পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর জওয়ানরাও আছে। পাকিস্তান সরকার বলে চলেছে যে এই জঙ্গিদের তারা শুধু নৈতিক সমর্থনই দিচ্ছে। কিন্তু আমদের সেনারা অকাট্য প্রমাণ যোগার করেছে যে তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাকিস্তানী সেনা বাহিনীই সরবরাহ করছে।

মুজফ্‌ফরাবাদের উপরিউক্ত শিবিরে যেসব জঙ্গি শিক্ষাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাদের বয়স ১৪ থেকে ২৪এর মধ্যে। এরা প্রায় সকলেই পশ্চিম পাঞ্জাবের কৃষক কিংবা শ্রমিক পরিবারের ছেলে। ছোটবেলা থেকে এরা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে এবং কোরান ও হাদিস ছাড়া আর কিছুই পড়ে নি। ফলে এদের মধ্যে ইসলামী ধর্মান্ধিতা ছাড়া আর কিছুই প্রবেশ করতেপারে নি। এরা শিখেছে, যারা মুসলমান নয় তাদের মধ্যে ঈমান নেই। আর যাদের মধ্যে ঈমান নেই তারা নিকৃষ্ট জীব। পশুর সমান। তাদের রক্ত রক্ত নয়, শুধু জল মাত্র। তাই তাদের কেটে ফেললে বা মেরে ফেললে কিছু এসে যায় না। লস্কর-ই-তইবার প্রধান অধ্যক্ষ ৪২ বছর বয়সী জাকিউর রহমান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানায় যে, "যখনই কোন যুবক আমাদের দলে ভর্তি হতে আসে তখন সর্বপ্রথম হুকুম দেওয়া হয় বাড়ীর টিভি সেটটি ভেঙে ফেলতে। এটা যারা না পারে তাদের প্রতি আমাদের পুরো আস্থা জন্মায় না যে তারা ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।" লস্কর-ই-তইবা'র অন্য এক সর্দার আবু কামির জানায় যে, "এদের মধ্যে প্রায় সকলেই ইসলামের স্বার্থে প্রাণ দেয় এবং মুষ্টিমেয় কিছু মুজাহিদই দুই কি চার বছর টিকে যায়।"

প্রথমে এদের ৩ মাসের গেরিলা যুদ্ধের তালিম দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের লস্কর-ই-তইবার স্থানীয় নেতারা তাকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতে যাবে। যদি তারা মনে করে যে, তার মানসিকতা দৃঢ় হয়েছে এবং সে ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবেই তাকে সীমান্ত অঞ্চলের শিবিরগুলিতে পাঠানো হয়। সেখানে তারা এক নাগাড়ে ৩ মাসে সামরিক প্রশিক্ষণ পায়। এদের শেখানো হয় যে, ইসলামের জন্য শহীদ হওয়া সর্বাপেক্ষা গৌরবের। গত ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে লস্কর-ই-তইবা গঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে গিয়ে সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। বিগত ১৯৯২ সালে কাশ্মীরকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করা হয় এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করা হয়।

এই রকমই আর একটি জঙ্গি সংগঠন "হিজবুল মুজাহিদিন"এর সর্বোচ্চ নেতা সৈয়দ সালাউদ্দিন জানায় যে, আগে তাদের নীতি ছিল মার এবং সরে পড় বা (hit and run) কিন্তু বর্তমানে তারা জমি দখলের নীতি গ্রহণ করে এবং সেই নীতি অনুসরণ করেই তারা কারগিল সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে পর্বত শৃঙ্গগুলিতে আস্তান গেড়ে বসে। সৈয়দ সালাউদ্দিনের মতে কাশ্মীর সংঘর্ষের ইতিহাসে এটা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ।"

কিন্তু কথা হল, অপরিণামদর্শী ধর্মান্ধ মুসলমনদের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে পাকিস্তান নামক এক ভূ-ভাগের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দিতে পারে সে রকম আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ আজকের ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কোন নেহেরু মার্কা মুসলমান তোষণকারী সরকার নয়। যদি আজ কেন্দ্রে কোন নেহেরুমার্কা সেকুলার সরকার থাকত, তা হলে কারগিলে কোন সংঘর্ষই হোত না এবং দেশের লোকও এই মুসলমান অনুপ্রবেশের ঘটনা জানতে পেত না। ভারতীয় মুসলমানদের সন্তুষ্ট করে তাদের ভোট পাবার জন্য ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হত। ভারতীয় বাহিনী পিছনে সরে এসে অধিকৃত শৃঙ্গগুলিতে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দখল পাকাপাকি ভাবে স্বীকৃত হত। বই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইন্দ্রকুমার গুজরালের প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে যখন আর এক ইন্দ্র, আমাদের স্বনামধন্য ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন তখন একদল জঙ্গি ঘাতক হজরৎবাল মসজিতে আশ্রয় নেয় এবং আমাদের সেনারা চতুর্দিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। কিন্তু সেই নপুংসক সরকার রাতের অন্ধকারে সেই জঙ্গিদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। আমাদের বীর সেনাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখে সেই মীর্জাওাফরের দল সেই বর্বর ঘাতক মুসলমান জঙ্গিদের প্রাণরক্ষা করে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা হল, আজ কেন্দ্রে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার আসীন এবং সেই সরকার কখনই মুসলমান তোষণ করার জন্য দেশের মানুষের সঙ্গে, মাতৃভূমির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

দ্বিতীয়তঃ গত ৪ঠা জুলাইয়ে রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন ও পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ দ্বারা স্বাক্ষরিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখার এপার থেকে তাদের সৈন্য সরিয়ে নেবে। কিন্তু গতকাল (৬ই জুলাই) পাকিস্তানি বিদেশমন্ত্রী সরতাজ আজিজ এক বিবৃতিতে জানায় যে, সীমান্তে যারা যুদ্ধ করছে তারা মুজাহিদিন বা স্বাধীনতা সংগ্রামী। পাকিস্তান সরকার তাদের শুধু সীমান্তের ওপর থেকে ফিরে আসার অনুরোধ জানাতে পারে এবং ফিরে আসতে বাধ্য করতে পারে না। অপর দিকে জঙ্গি মুসলীম সংগঠনগুলো জানিয়েছে যে তারা কোন মতেই সীমান্ত থেকে ফিরে আসবে না এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। "লস্কর-ই-তইবা"র মুখপাত্র হাফিজ মহম্মদ সফর বলছে, "ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ চলবে।" সংবাদ আরও বলে যে, ক্লিনটনের সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দিয়ে নওয়াজ শরীফ কাশ্মীরের স্বাধীনতা অন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। সেনাবাহিনী সরকারকে মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু

মুজাহিদরা সরকারের কথা মেনে চলতে বাধ্য নয়। এই সব বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি, থেকে এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, কারগিলের যুদ্ধ সহসা থামাবার নয়। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী রূপ নেবে। উপরন্তু এটা আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হয়তো সরাসরি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পরিণত হবে।

তৃতীয়তঃ এটা খুবই স্পষ্ট যে, পাকিস্তানের হাতে আজ পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, তা সে নিজেই তৈরী করুক আর চোরা গোপ্তা পথে চীন থেকেই নিয়ে আসুক। উপরন্তু সেই অস্ত্র প্রয়োগ করার মিসাইলও পাকিস্তানের হাতে আছে। তা ছাড়া, প্রথমে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ না করার চুক্তি ভারত সরকার পাকিস্তানের কাছে উপস্থিত করেছিল, পাকিস্তান তা অগ্রাহ্য করেছে। আরও ভয়ের কথা, আজ সকলেই এটা আশঙ্কা করছে যে, আরবের সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের হাতেও পারমাণবিক অস্ত্র আছে। কিছুদিন আগে বিখ্যাত আমেরিকান সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইম (TIME) এর একজন সাংবাদিক ওসামা বিন লাদেনের সাক্ষাৎকার নিতে যায়, এবং তার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আছে কি না, এ প্রশ্ন করলে ওসামা তার কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিৎ যে, আণবিক অস্ত্র থাকলেও তা প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিমান বা মিসাইল তার হাতে নেই। কাজেই পাক সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া সে তা প্রয়োগ করতে পারবে না।

চতুর্থতঃ এর আগে যতবার ভারত-পাক যুদ্ধ হয়েছে, প্রতিবারই তাতে ভারত বিজয়ী হয়েছে। কাজেই এটা অনুমান করা চলে যে, কারগিলকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক যুদ্ধ বাঁধলে ভারতই জয়ী হবে। সেই অবস্থায়, পরাজয়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ করবে তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মুসলমানরা স্বাভাবিক ভাবেই অপরিণামদর্শী এবং মুসলীম রাষ্ট্র পাকিস্তানও অপরিণামদর্শী। সেইসঙ্গে সঙ্গে এটাও অনুমান করা চলে যে ভারত-পাক যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নেবে এবং তখন তা আর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেবে।

প্রথমতঃ কিছু দিন আগে আমেরিকা চীনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে যে সে চুরি করে আমেরিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও গারিগরি তথ্য চীনে পাচার করেছে এবং সেই সব তথ্যের উপর ভিত্তি করেই শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র ও দূরপাল্লার মিসাইল তৈরী করে ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। ফলে চীন-মার্কিন সম্পর্কের খুবই অবনতি ঘটেছে। উপরন্তু ন্যাটোর বিমান বেলগ্রেড এর চীনা দূতাবাসে বোমা ফেলার জন্য দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা খুবই বেড়েছে। এই কারণেই আমেরিকা বর্তমানে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে চেষ্টা করছে এবং কারগিলের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সরাসরি সমর্থন করছে না, বরং প্রকারান্তরে ভারতের পক্ষ হয়েই কথা বার্তা বলছে। কাজেই আশা করা যায় যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুরু হলে, ভারত, আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ইত্যাদি দেশগুলো এক পক্ষে থাকবে এবং অন্যপক্ষে

থাকবে চীন ও পাকিস্তান সহ ইরান; ইরাক ইত্যাদি মধ্যে এশিয়ার মুসলীম রাষ্ট্রগুলি। এই যুদ্ধের অন্তিম ফলাফল কি হবে বলা শক্ত। তবে অনুমান করা চলে যে, আমেরিকা ও রাশিয়া যে পক্ষে থাকবে, সেই পক্ষই বিজয়ী হবে। যদি তাই হয়, তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলো যে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। নষ্ট্রাদামুসের ভবিষ্যদ্বাণীও এই ইঙ্গিত দেয়।

বর্তমান বছরের, অর্থাৎ বাংলা ১৪০৬ সালের "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" ঠিক এই রকমই একটি ভবিষ্যদ্বানী করেছে, যা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত হবে। ১৪০৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৪১০ বঙ্গাব্দের মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটানো ঘটতে পারে, উক্ত পঞ্জিকার ক-৩৮ পৃষ্ঠায় তার সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হয়েছে। ঐ তালিকা বলছে—

(১) ভারতে উপর পারমাণবিক আঘাত?

(২) ভারতীয় কোন মহাপুরুষের নেতৃত্বে নবজাগ্রত ভারতীয় বাহিনীর বিশ্ব পরিক্রমাও অতুলনীয় সাফল্য লাভ?

(৩) শাশ্বত সনাতন বৈদিক ধর্মের উন্নতি, বিশাল, বিস্তার, প্রসার এবং ভারতে ধর্মীয় দলের শাসন এবং অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা?

(৪) বিশ্বত্রাতার ভূমিকায় ভারতের আবির্ভাব?

(৫) রাষ্ট্রসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের অবলুপ্তি ও বিশ্বযুদ্ধ?

(৬) বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমার যথেচ্ছ ব্যবহার?

(৭) ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা?

(৮) বিশ্বযুদ্ধে ভারত, রাশিয়া, জাপান, ইস্রায়েল, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, গ্রীস, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের এক পক্ষ যোগদান। অন্যপক্ষে চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, সীরিয়া, জর্ডান, লিবিয়া, তাজিকিস্তান, উজবেগিস্তান, কিরগিজিস্তান, বসনিয়া, কুয়েৎ, সৌদি আরব, প্যালেস্টাই, সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দুবাই, বাংলাদেশ প্রভৃতির যোগদান।

(৯) বিশ্বযুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আত্মকলহ প্রভৃতির ফলে আম্লোপষিদের ধারকবাহকদের অস্তিত্বলোপ এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ ধ্বংস?

(১০) চীনে প্রকাশ্য গণতন্ত্র?

উপরিউক্ত তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী বলছে যে, "অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা" হবে। এই কথার মধ্য দিয়ে এটাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, পাকিস্তান, আফিগানিস্তান ও বাংলাদেশের পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ ও শ্রীলংকা ভারতের অন্তর্ভূক্ত হবে। কারণ এক কালের গান্ধার (মহাভারতের গান্ধারী সেই দেশের রাজকুমারী) বা আজকের আফগানিস্তান সহপাকিস্তান, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভূটান, সব নিয়েই অখণ্ড ভারত। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সেই অখণ্ড ভারতবর্ষের উদয় ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করে গেছেন।

নবম ভবিষ্যদ্বাণী বলছে যে, পৃথিবীর মাটি থেকে, "আল্লোপনিষদের ধারকবাহকদের অস্তিত্বলোপ", বা সোজা বাংলায়, মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ। কাজেই মুসলমান না থাকলে ইসলাম থাকবে কেমন করে? তাই এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রাকারান্তরে ইসলামের অবলুপ্তির কথাই বলছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বর্তমান খণ্ডিত ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যত মুসলমান আছে তা বিশ্বের মুসলীম জন সংখ্যার ৭৫ শতাংশেরও বেশি। মধ্যপ্রাচ্যে অনেক ইসলামী দেশ থাকতে পারে। তবে তাদের জনসংখ্যা খুবই কম। কাজেই ভারত উপমহাদেশে মুসলমান না থাকলে বিশ্বের মুসলমানের সংখ্যাও ভীষণভাবে কমে যাবে। এ থেকে আরও একটা অনুমান করা যায় যে, ভারত উপমহাদেশের সব মুসলমানই আবার হিন্দুধর্মে ফিরে আসবে।

সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ দশম ভবিষ্যদ্বাণী বলছে যে, চীনে প্রকাশ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ চীনে কম্যুনিষ্ট শাসনের অবসান হবে। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান মার্কসবাদকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়েছে। কাজেই চীনে কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান যে সেই মার্কসবাদকে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড থেকে কবরস্থানে নিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

(এই প্রবন্ধ লেখার সময় দিল্লীতে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে এন.ডি.এ. সরকার ক্ষমতায় আসীন ছিল এবং সেই সময় বিজেপি মুসলমান তোষণকারী হয়ে ওঠেনি।)

বিশ্বের মুসলমান সমাজ ঃ শৃঙ্খলিত এক ক্রীতদাসের দল

জনাব ওয়াসেম সাজ্জাদ হলেন ইসলামাবাদ-স্থিত 'মিনিস্টেরিয়াল স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সাইন্টিফিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল কো-অপারেশন নামক একটি বেসরকারী সংস্থার সভাপতি। বিগত ১৯৯৮ সালে তিনি একটি সভায় বলেন যে বিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাতে 'ও আই সি'-ভুক্ত মুসলীম দেশগুলোতে ৪০ লক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ, যা আকাঙ্ক্ষিত সংখ্যার ৫ শতাংশ মাত্র। তিনি আরও বলেন যে, সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ১৩০ কোটি, বা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ। কিন্তু এই ১৩০ কোটি মুসলমান সমগ্র বিশ্বের ১ শতাংশেরও কম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করে। তা ছাড়া কমপিউটার বিজ্ঞান, তার সফট্ওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তির মত 'হাইটেক' ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান নেই বললেই চলে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে মুসলমান সমাজের এই বাপক অনগ্রসরতার জন্য তিনি খুবই আক্ষেপ করেন।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আরবের এক পন্ডিত বলেন, এই অনগ্রসরতার কারণেই আরব দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে বইপত্রের প্রচণ্ড অভাব। তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, খলিফা মামুন-এর সময় থেকে বিগত ১০০০ বছরে আরবের মুসলমানরা যে পরিমাণ বিদেশী বই অনুবাদ করেছে, স্পেনের লোকেরা মাত্র এক বছরের মধ্যেই তার থেকে বেশি বই অনুবাদ করে থাকে।

ভারত সহ পৃথিবীর সব দেশেই মুসলমান সমাজের এই একই চিত্র। সব দেশেই নিরক্ষরতা, শিশুমৃত্যু, অপরাধ ও দারিদ্রে মুসলমানরা সকলের ওপরে। মুম্বাইয়ের রাহাত ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-এর সভাপতি বলেন, "This darkness makes a mockery of our freedom. ...It is only the light of education that can banish this darkness created by ignorance" —অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার মুসলমান সমাজের (রাজনৈতিক) স্বাধীনতাকে ম্লান করে দিয়েছে। ...একমাত্র শিক্ষার আলোই পারে এই অন্ধকার থেকে তাদের মুক্ত করতে।

'ইসলামিক ভয়েস' (Islamic Voice) হল বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক জনাব শাদাতুল্লা খাঁ তার 'বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব এবং তার প্রতিকার' (Intellectual Stagnation and Its Remedy) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখেন যে, "মুসলীম

সমাজের বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব খুবই পীড়াদায়ক। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই বিশ্বের মুসলীম সমাজ এই বৌদ্ধিক স্থবিরত্বের শিকার হয়ে আসছে। " প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষার অন্ধকার এবং বৌদ্ধিক স্থবিরত্বই যে মুসলীম সমাজের ব্যাপক দারিদ্রের জন্য দায়ি তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে দিল্লীস্থিত 'ইন্ডিয়ান ইসলামিক কাউন্সিল' নামক সংস্থার সভাপতি জনাব হিসামুল সিদ্দিকি বলেন, 'ভারতের মুসলমানদের প্রায় ৩৬ শতাংশ শহরে বাস করে। এদের প্রায় সকলেই বস্তিবাসী (Slum dwellers) এবং দরিদ্রসীমার নীচে তাদের অবস্থান।"

আরব দুনিয়াতেও চিত্রটা প্রায় একই। সেখানে লোকেরা অতটা দরিদ্র না হলেও শিক্ষাদীক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে সমান অনগ্রসর। 'আরব লিগ'-এর সদস্য ২২টি দেশকে একত্রে আরব দুনিয়া বলা হয়ে থাকে এবং এদের প্রায় সকলেই তেল ওগ্যাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তবুও তারা কেন অনগ্রসর?

এই প্রশ্নের একটি সদুত্তরের আশায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাখা সংস্থা 'ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' বা 'ইউ এন ডি পি' গত ২০০১ সালে একটি কমিটি গঠন করে। আরব জগতের গণ্যমান্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন কমিটির সদস্য। এক বছর অনুসন্ধান চালাবার পর গত বছর জুলাই মাসে এই কমিটি তার রিপোর্ট, 'আরব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২' পেশ করে। কমিটির আহ্বায়ক, মিশরীয় পণ্ডিত জনাব নাদের ফেরগনি ও তাঁর সহকর্মীরা আরব দুনিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক, দুটি দিকই তাঁদের রিপোর্টে তুলে ধরেছেন। তবে দুঃখের বিষয় হল, ইতিবাচক অংশ খুবই নগণ্য।

কোন দেশের অগ্রগতি বিচার করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্‌ডেক্স' নামে একটি সূচক ব্যবহার করে। সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 'এইচ ডি আই'। ইদানীং রাষ্ট্রসংঘ অলটারনেটিভ এইচ ডি আই' বা 'এ এইচ ডি আই' নামে আরও একটি সূচক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। দেশের মানুষের গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, শিক্ষিতের হার, স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার এবং মাথাপিছু গড় আয়ের ওপর ভিত্তি করে 'এইচ ডি আই' সূচক নির্ণয় করা হয়। 'এইচ ডি আই' থেকে মাথাপিছু আয় বাদ দিয়ে এবং অন্য কয়েকটি বিষয়, যেমন বাক্ স্বাধীনতা, অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতা, ইন্টারনেট-এর ব্যবহার ইত্যাদি যোগ করে 'এ এইচ ডি আই'-এর সূচক নির্ণয় করা হয়। এই দুই সূচকের নিরীখেই দেখা যায় যে, আরব দুনিয়ার অবস্থান সকলের নীচে।

আরব দুনিয়ার লোকসংখ্যা ২৮ কোটি, যা আমেরিকার লোকসংখ্যা ২৪ কোটির প্রায় সমান। কিন্তু 'বাৎসরিক গড় উৎপাদন' 'জি ডি পি' মাত্র ৫৩১০০ কোটি ডলার, যা স্পেনের 'জি ডি পি' থেকেও কম। পৃথিবীতে যে সব লোকেরা দিনে ১ ডলার বা তার কম আয় করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারে তারা খুবই গরিব। কিন্তু আরবের গরিব লোকেরাও দিনে প্রায় ২ ডলার

রোজগার করে। তাই তাদের তেমন গরিব বলা চলে না। কিন্তু সমস্যা রয়েছে অন্য জায়গায়। বিগত ২০ বছরে আরবদের আয় বেড়েছে বছরে ০.৫ শতাংশ হারে। তাই অবস্থার পরিবর্তন না হলে একজন আরবের আয় দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ১৪০ বছর। অথচ অনেক উন্নয়নশীল দেশ ১০ বছরে এই লক্ষ্যপূরণ করে ফেলছে।

আরব দুনিয়ার আর একটি প্রতিবন্ধকতা হল ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী। বর্তমানে ১ কোটি ২০ লক্ষ, বা জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ আরব বেকার। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ২০২০ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা ৪০ কোটি হবে এবং তখন আড়াই কোটি লোক বেকার হবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই সব আর্থিক কারণকে আরব দুনিয়ার অনগ্রসরতার মূল কারণ বলে রিপোর্টে বলা হয়নি। পক্ষান্তরে তিনটি সামাজিক কারণকেই এর জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হল, (১) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অভাব, (২) জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অভাব এবং (৩) নারীজাতির চূড়ান্ত অবহেলা।

এর মধ্যে আবার স্বাধীনতার অভাবকেই চূড়ান্তভাবে দায়ী করে রিপোর্টে বলা হচ্ছে, "ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবই স্বেচ্ছাচারী, অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, গোঁড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পরমত অসহিষ্ণু ধর্মীয় ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করছে এবং সমস্ত আরব জগতে এক শ্বাসরোধকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে।" রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, শ্বাসরোধকর এই পরিবেশই আরব জগতের সমস্ত সম্ভবনাকে অবদমিত ও ধ্বংস করে চলেছে। কোথাও কোথাও সামান্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে বটে, তবে তা অনুকম্পা হিসাবে, নাগরিক-অধিকার হিসাবে নয়। এই সব কারণে বিগত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে উন্নয়ন ও প্রগতির যে জোয়ার বয়ে গিয়েছে, তা আরব দুনিয়াকে স্পর্শ করতে পারেনি।

শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, গত ২০ বছরে স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর। তা ছাড়া শিক্ষার মানও অতি নিম্ন। তার থেকেও বড় কথা হল, এই শিক্ষা বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব দূর করতে বা সৃষ্টিশীলতার প্রসার ঘটাতে একেবারেই অক্ষম। কারণ এই শিক্ষার মূলক কথাই হল, একমাত্র কোরান ও হাদিসের মধ্যেই সত্য আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, কোরান-হাদিসের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা ও প্রচার করা। তাকে বিচার করা বা প্রশ্ন করা নয়।

আরব তথা মুসীলম দুনিয়ার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এই সমাজে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান নেই বললেই চলে। এরা হল পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার ও শিশুর জন্ম দেবার যন্ত্রবিশেষ। এখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হল ক্রীতদাস ও মনিবের সম্পর্ক। তাই পুরুষ ইচ্ছামত তিন চারটি স্ত্রী নামক ক্রীতদাসী পুষতে পারে এবং যে কোন সময় তিনবার 'তালাক' বলে ঘর থেকে তাড়িয়েও

দিতে পারে। তাই রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যে সমাজ তার অর্ধেক সৃজন ক্ষমতাকে শ্বাসরুদ্ধ (stifle) করে রাখে, সে সমাজের উন্নতি হবে কেমন করে ?"

যে কেউ ইসলামী শাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন যে, মেয়েদের স্বাধীনতা দেবার ব্যপারে আল্লা খুবই অনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে তিনি তাদের দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ বলে নিন্দা করেছেন এবং শেষ বিচারের দিন তাদের নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।। আল্লা মুসলমান পুরুষদের আদেশ দিয়েছেন তাদের পর্দা দিয়ে আবৃত করতে এবং ঘরে অন্তরীণ করে রাখতে। অবাধ্য স্ত্রীদের বাগে আনতে আল্লা পুরুষদের আদেশ দিয়েছেন তাদের শয্যা ত্যাগ করতে ও লাঠি দিয়ে পেটাতে। তাতেও কাজ না হলে তিনি তাদের ঘরে বন্দী করে অন্নজল না দিয়ে মেরে ফেলার সুপারিশ করেছেন। আল্লার দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ কারণ নারীর ভরণপোষণের জন্য পুরুষ টাকা খরচ করে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লার এই সব নির্দেশকে অনুসরণ করেই আফগানিস্তানের তালিবানরা মেয়েদের জন্য হিজাব বা বোরখা ব্যবহার করা এবং ঘরে অন্তরীন থাকাকে বাধ্যতামূলক করেছিল। মেয়েদের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আলজিরিয়ার কট্টরবাদীরা ৩০০ স্কুল-ছাত্রীর গলা কেটে দিয়েছিল। মিশরে ১৩ বছরের এক স্কুল-ছাত্রীকে নানা ভাবে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, কারণ গরমে টিকতে না পেরে সে রাস্তার লোকজনের সামনে মুখমণ্ডল অনাবৃত করেছিল। এই কারণেই কোন মুসলমান দেশে মেয়েদের খেলাধূরা করার কোন অধিকার নেই। আগে বাংলাদেশের মেয়েদের খেলাধূলা করার অধিকার ছিল। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষিত হবার পরে তাদের সে অধিকার হরণ করা হয়। উপরন্তু, শাড়ীর দৈর্ঘ্য ১ হাত বাড়িয়ে ১২ হাত করা যয়, যাতে তারা ভাল করে পর্দা করতে পারে।

মুসলমান সমাজে মেয়েদের আরও একটি চরম লাঞ্ছনার বিষয় হ'ল, মৌখিকভাবে ৩ বার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণকরে যে কোন স্ত্রীকে যখন খুশী, কোন খোরপোষ ছাড়াই, তার সন্তান-সন্ততি সহ বিদায় করা যায়। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, মুসলমান সমাজে নারীর স্থান গৃহপালিত পশুর থেকে বেশি নয়। অনেকের ধারণা আছে যে সৌদি আরব তেল বিক্রী করে অনেক টাকা আয় করে এবং সেই কারণে সেখানকার সবাই বড়লোক। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ এবং বন্দর শহর জেদ্দা-তে গেলে দেখা যাবে যে রাস্তাঘাটে অনেক শিশু ভিখারী ভিক্ষা করছে।

আগে বলা হত যে, হজের সময় অন্যান্য গরিব দেশ থেকে যারা হজ করতে আসে, তাদের অনেকে চোরা গোপ্তা পথে থেকে যায় এবং তাদের ছেলে মেয়েরাই ভিক্ষা করে। কিন্তু একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রিয়াধে যত শিশু ভিক্ষা করে তার ৬৯ শতাংশ হল সৌদি আরবের নাগরিক। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে; ওইসব শিশু ভিখারীরা হল তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের সন্তান। গৃহপালিত পশুর মতই তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। তাই শুধু প্রাণ রক্ষার তাগিদেই তারা রাস্তায় নেমে ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে।

রাঁচী থেকে 'সেবা সুরভী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গত ২০০২ সালে 'নারী শক্তি ২০০ নামে তাঁর একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, যাতে 'আমাদের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মাননীয় আভুল পাকির জয়নালাবেদিন আব্দুল কালাম মহাশয়ের একটি বাণী প্রকাশিত হয়। সেই বাণীতে তিনি লেখেন, "As we all knows birds have two wing. Unless both the wings grow equally, the bird cannot fly. Similarly, the society has two wings—man and woman. Both have to be developed equally. Then the Society will fly"—অর্থাৎ, "আমরা সবাই জানি যে, পাখিদের দুটো ডানা আছে। দুটো ডানা সমান শক্তিশালী না হলে পাখি উড়তে পারে না। সে রকম, সমাজেরও দুটো ডানা আছে—পুরুষ এবং নারী। উভয়েরই সমান শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। তবেই সমাজ উড়তে পারবে।"

কিন্তু প্রশ্ন হল, মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় যে সমাজের লোক, সেইসমাজেই মেয়েরা সর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতিত। অথচ তিনি এ ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, কিছু দিন আগে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা সারা দেশে এক এবং অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করার সুপারিশ করেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সারা দেশে সব সমাজের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু হলে মুসলীম সমাজের মেয়েরা অনেক রকম নির্যাতনের হাত থেকেই রক্ষা পেয়ে যাবেন। কারণ মুসলমান পুরুষরা তখন বহু বিবাহ এবং তিনবার তালাক বলে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ পাবেন না। খুব সম্ভবত এই কারণেই মুসলমান সমাজের হর্তাকর্তারা অভিন্ন দেওয়ানী বিধির প্রবল বিরোধিতা করেন। কিন্তু সেই বাদানুবাদের সময় মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় টুশব্দ না করে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকেন। মুসলমান মেয়েরা ন্যায্য নাগরিক অধিকার পাক, তা যদি তিনি মনে প্রাণে চাইতেন, তবে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা হয়তো সম্ভব হত না। উপরন্তু, নীরব থেকে প্রকারান্তরে মোল্লা-মৌলভীদের মতকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন।

বাদশা আকবর নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থ পড়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সব ধর্মের পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের ধর্মের মূল বিষয়গুলো শুনেছিলেন। সব শুনে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, ইসলামের মত জঘন্য কোন তত্ত্ব হতে পারে না, সেই মুহূর্তেই তিনি ঘৃণাভরে ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন, কোন মুসলমানের পক্ষে মহম্মদ নাম রাখা অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন এবং কামান দেগে অনেক মসজিদ ভেঙে দিয়েছিলেন। শাস্ত্র অনুসারে এই পার্থিব জীবনে মুসলমানদের সিল্কের কাপড় পড়া ও সোনার গহনা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এই নিয়মের বিরোধিতা করতে তিনি তাঁর সভাসদদের জন্য সোনার অলঙ্কার ও সিল্কের জামা পরা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। সমস্ত মসজিদে তিনি শূয়োরের চাষ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। (Akbar the Great Mugul, V.A. Smith—Ch. on Din-i-Ilahi) আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মহাশয় নিরক্ষর নন্।

অনেকের মতে, তিনি নাকি নিত্য গীতা পাঠ করেন। কাজেই গীতা ও কোরান-এর মধ্যে কি তফাৎ, তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। কাজেই আমরা আশা করব যে, তিনি কোন ধর্ম মানবিক এবং কোন ধর্ম অমানবিক, সেই ব্যাপারে তাঁর মতামত জনসাধারণের কাছে সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করবেন এবং এই সব বিষয়ে তিনি বাদশা আকবরের মতই সাহসিকতার পরিচয় দেবেন। কারণ বাদশা আকবরের মত তিনিও আজ ভারতের রাষ্ট্র-প্রধান।

এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলার আছে। আজকের দেশভাগ সহ হিন্দু ও মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তিক্ততা ও শত্রুতা জন্ম নিয়েছে তার মূল কারণ হল ভারতের ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা। বিদেশী মুসলমান শাসকরা এ দেশের হিন্দুদের ধর্মপরিবর্তন করে এ সমস্যার জন্ম নিয়েছে। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের এই শত্রুতা পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। এই ভয়ঙ্কর ও করুণ ভ্রাতৃবিবাদকে মাত্র একটি উপায়েই এড়ানো সম্ভব, আর তা হল বিদেশী আরবী সাংস্কৃতিকে বর্জন করে ভারতের সব মুসলমানের নিজস্ব বৈদিক ধর্ম ও সাংস্কৃতিতে ফিরে আসা। এতে সকলেরই মঙ্গল। হিন্দুর মঙ্গল, মুসলমানের মঙ্গল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের মঙ্গল। তাই আমাদের রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের উচিত বাদশা আকবরের মতই প্রথমে ইসলাম ত্যাগ করা এবং অতঃপর হিন্দু ধর্মে ফিরে এসে দেশের সমস্ত মুসলমানকে সঠিক পথ নির্দেশ করা। রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে অনুরোধ, তিনি যেন বিষয়টা একটু ভেবে দেখেন।

যাই হোক, জনাব ক্লবিস মাকসুদ হলেন মিশরের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপরিউক্ত রিপোর্টের একজন অন্যতম প্রণেতা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, মুসলীম সমাজের সার্বিক অনগ্রসরতার জন্য তিনি সরাসরি ইসলামের দিকেই আঙুল তুলেছেন। এবং প্রকারান্তরে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, মুসলীম সমাজের অগ্রসরতার জন্য মূলত দায়ি হল ইসলাম। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বৃটিশ সাংবাদিক বলেন, "সব থেকে স্পর্শকাতর বিষয়, যা রিপোর্টের প্রণেতারা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, তা হল, মুসলীম সমাজের অনগ্রসরতার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা।'

আগেই বলা হয়েছে যে, স্কুল থেকেই মুসলমান শিশুদের শেখানো হয় যে, একমাত্র কোরান ও হাদিসেই সত্য আছে। তাই নিজস্ব যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সত্যের অনুসধান করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মুসলীম সমাজে যুক্তি বিচারের কোন স্থান নেই। শিশু বয়স থেকেই তাদের বোঝানো হয় যে, আল্লাতায়লা কোরান ও হাদিসের মধ্য দিয়ে যে সত্য প্রকাশ করেছেন, তাকে সর্বোচ্চ মান্যতা দিতে হবে, তাকে অমান্য করার সাধ্য কারোরই নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, কোরান-হাদিসের সেই সত্যকে ব্যাখ্যা করা, তার প্রচার করা। সেই সত্যকে সন্দেহ করা বা তাকে, প্রশ্ন করা নয়। কোরানকে প্রশ্ন করার অর্থ আল্লার প্রতি সন্দেহ করা। তাই তা মহাপাপ।

তাই কোরানে যা কিছু আছে তাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, সব মুসলমানকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, ৬২১ খ্রীস্টাব্দের রজব মাসের ২৭ তারিখে নবী মহম্মদ পার্থিব কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, সজ্ঞানে ও সশরীরে স্বর্গ ভ্রমণ (মেরাজ) করেছিলেন। বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি চাঁদকে ভেঙে দুটুকরো করেছিলেন। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লা মাত্র ৬ দিনের মধ্যে, শূন্য থেকে এই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাস করতে হবে যে, আকাশ একটা কঠিন ছাদ, যা আল্লা তাঁর বিশেষ কুদরতের দ্বারা কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থাপন করে রেখেছেন এবং কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন আল্লা ওই কঠিন ছাদকে ভেঙে ফেলবেন এবং তা গুড়ো গুড়ো হয়ে পৃথিবীতে পড়বে।

তাকে আরও বিশ্বাস করতে হবে যে, এই মনুষ্য জাতি এক জোড়া নরনারী, আদম ও হাওয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং নবী মহম্মদ ছিলেন হজরৎ আদমের ৯০ তম বংশধর। এবং এর মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, মাত্র ৪১৩৩ বছর আগে আল্লাতায়লা এই পার্থিব জগত সৃষ্টি করেছেন। কারণ দুই পুরুষের মধ্যে ৩০ বছর বয়সের ব্যবধান ধরে নিলে এই হিসাবই পাওয়া যায়। আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় যতবড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, তাঁকেও কোরানের এই সব বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে। অন্যথায় তাঁর গর্দানের বিপদ দেখা দেবে।

সেই সঙ্গে সঙ্গে কোন মুসলমানেরই অধিকার নেই নবী মহম্মদের জীবন ও তাঁর কাজকর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার। শুধু তাঁর প্রশংসাই করতে হবে। তিনি যে কুরাইজ্যা ও নাজির গোত্রের ইহুদীদের গণহত্যা করেছিলেন এবং ১০ বছর মদিনা বাসকালে ৮২টা আক্রমণ ও অভিযান চালিয়ে আরবের অমুসলমান কাফেরদের কচুকাটা করেছিলেন, সেই সব নৃশংস কাজ গোপন করতে হবে। সবসময় তাঁকে দেখাতে হবে শান্তির দূত ও ক্ষমার অবতার হিসাবে। শেষ বয়সে নবী যে শাদী করে মোট ২২ জন পত্নীর স্বামীর হয়েছিলেন, সেই সব বিয়ে শাদীর মধ্যে শুধু পবিত্রতা খুঁজতে হবে। এমনকি, তাঁর ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে শাদী করা এবং ৫৪ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদ-এর স্ত্রী জয়নব-কে শাদী করার মধ্যেও পবিত্রতা আবিষ্কার করতে হবে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তির কি চরম অপমান! কি কল্পনাতীত বৌদ্ধিক দাসত্ব!

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মুসলীম সমাজ হল এক শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসের সমাজ। এবং বৌদ্ধিক দাসত্ববৃত্তির সমাজ। সেই সমাজে চিন্তার কোন স্বাধীনতা নেই এবং মুক্ত চিন্তার কোন সুযোগ নেই। ক্রীতদাসের মত শুধু নিয়ম পালন করে যাও। নবী বলেছেন যে গোঁফকেটে দাড়ি রাখ, কারণ তা হলে মুসলমানদের চিনতে সুবিধা হবে। তাই কোন প্রশ্ন না করে গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে হবে। খাওয়ার পর নবী হাত চেটে পরিষ্কার করতেন, তাই সব মুসলমানকে হাত চেটে পরিষ্কার করতে হবে। পাজামার ঝুল গোড়ালী ঢেকে ফেললে নবী তাকে অহমিকার প্রকাশ বলে মন করতেন, তাই খাটো ঝুলের পাজামা পরতে হবে। নবী

কুকুর পছন্দ করতেন না, তাই কুকুর পোষা যাবে না। কম জল ব্যবহার করে নবী যেভাবে অজু করতেন, জলের দেশ এই বাংলায়ও ওই একইভাবে অজু করতে হবে। কোরানে আল্লাতায়লা কোথাও বলেননি যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের উন্নত কর, মানুষ হও, তাই লেখাপড়া বর্জন করে মূর্খ হয়েই থাকতে হবে। আল্লা বলেছেন যে, শুধু মাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' কলেমা গ্রহণ করার জন্য তিনি কেয়ামতের দিন মুসলমানদের সব গোনাহ্ (পাপ) মাফ করে দেবেন, তাই যত খুশী অপরাধ করতে থাক, দুনিয়ার যত দুষ্কর্ম সব করতে থাকো।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৌদ্ধিক দিক দিয়ে অবরুদ্ধ এরকম একটি ক্রীতদাসের সমাজ'সভ্যতার পথ অগ্রসর হবে কেমন করে? তাই এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বৃটিশ সাংবাদিক বলেন, 'বুদ্ধি ও চিন্তার এই চরম দাসত্ববৃত্তিই মুসলীম সমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।" উপরন্তু, কোরানে আল্লাতায়লার বাণী সমূহ পাঠ করলে এটাই মনে হয় যে, আল্লা তার বান্দাদের মানুষ হবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে শুধু মুসলমান করে রাখারই পক্ষপাতী।

সারণী-১

অঞ্চল	এইচ ডি আই	এ. এইচ ডি আই
উত্তর আমেরিকা	০৪	১০
ইয়োরোপ	২০	১৯
অস্ট্রেলিয়া	২১	২০
ল্যাটিন আমেরিকা	৪০	৪৮
দক্ষিণ এশিয়া	৬৮	৭০
আরব দুনিয়া	৭৫	৮৬

(সূত্র ঃ Arab Human Development Report 2002)

সারণী-২

অঞ্চল	মৌলিক স্বাধীনতা
উত্তর আমেরিকা	১০০
অস্ট্রেলিয়া	৯৫
ইয়োরোপ	৮২
ল্যাটিন আমেরিকা	৬৫
দক্ষিণ এশিয়া	৪০
আরব দুনিয়া	১৬

(সূত্র ঃ Arab Human Development Report 2002)

নীতিহীন বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খাঁ

পাকিস্তানের বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খাঁ আজ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আলোচ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানের জন্য পারমাণবিক বোমা বানিয়ে তিনি "পাকিস্তানী বোমার জনক" বা বৃহদর্থে "ইসলামী বোমার জনক" খ্যাতি পেয়েছেন। এই বোমা বানানোর জন্য তিনি দু-দুবার পাকিস্তানের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান "নিশান-ই-ইম্‌তিয়াজ' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কট্টরপন্থী জিহাদী মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি করেছেন। অন্যদিকে তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ। প্রথমত, তিনি হল্যান্ড থেকে পারমাণবিক বোমা তৈরির কারিগরি চুরি করেছেন। সেই চুরি করা বিদ্যা কাজে লাগিয়ে তিনি "ইসলামী বোমা তৈরি করেছেন। তার থেকেও বড় কথা হল, আন্তর্জাতিক কালোবাজারে তিনি সেই চুরি করা বিদ্যা পাকিস্তানের মত আরও কতিপয় নীতিহীন রাষ্ট্রের কাছে বিক্রী করেছেন। ইরান, লিরিয়া ও উত্তর কোরিয়াকে তিনি যে ওই কারিগরি বিক্রী করেছেন, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মত হল, তিনি যা এখন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, তা হয়তো হিমশৈলের উপরিভাগ মাত্র। বহু টাকার বিনিময়ে ওই চুরি করা বিদ্যা তিনি আরও অনেক মুসলীম দেশকে সরবরাহ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে দুবাই, মালয়েশিয়া এবং সম্ভবতঃ সৌদি আরব ও বাংলাদেশ। আরও সাংঘাতিক খবর হলো, অনকের বিস্বাস যে, তিনি ওসামা বিন লাদেন-এর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কাইদা এবং প্যালেস্টাইনের জঙ্গী সংগঠন 'হামাস'-কেও বোমা বানাবার কারিগরি সরবরাহ করেছেন বলে অনেকে মনে করেন।

পাকিস্তানের সরকার, সেখানকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে জঙ্গী সংগঠনগুলির সমর্থকদের চোখে আব্দুল কাদের খাঁ একজন মহামানব। কারণ তিনি পাকিস্তানকে একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত করেছেন। সারা বিশ্বে পাকিস্তানের সম্মান বাড়িয়েছেন। এর স্বীকৃতি হিসাবেই পাক-সরকার ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান "নিশান-ই-ইমতিয়াজ-এ ভূষিত করে এবং তারও আগে ১৯৯০ সালে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান "হিলাল-ই-ইমতিয়াজ" দিয়ে তাঁকে সম্মান দেখায়। "নিশান-ই-ইমতিয়াজ" সম্মানের সঙ্গে তাঁকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাতে লেখা হয় "পাকিস্তানের জাতীয় ইতিহাসে ডঃ আব্দুল কাদের খাঁর নাম চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে।"

কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এক দিকে যখন তিনি এই সব সম্মানে ভূষিত হচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁর কুকীর্তিগুলোও প্রকাশ হতে শুরু করে। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের তরফে তদন্ত শুরু হয়। আব্দুল কাদের ও তাঁর ৬ জন সহকর্মীর বিরুদ্ধে ৪ মাস ধরে তদন্ত চলে। ১৯৯৮ সালের "চাঘাই" পরমাণু বিস্ফোরণের আগেই আব্দুল কাদেরের ক্ষমতা অনেক কমিয়ে ফেলা হয় এবং সেই জায়গায় বসানো হয় সামর মুবারক মন্দ্ নামে অন্য এক বিজ্ঞানীকে। অবশেষে গত জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টার পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়।

প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে যে, বিধর্মী কাফরদের দেশ ভারতকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো এবং পরে সামরিক শাসক জিয়া-উল-হক আব্দুল কাদেরকে বোমা বানাতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। এবং সেই আব্দুল কাদেরও ভারতকে ধ্বংস করার স্বপ্নকে সফল করার জন্যই বোমা বানাবার কাজে হাত দিয়েছিলেন। সেই আব্দুল কাদেরের জন্ম হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল অবিভক্ত ভারতের সেন্ট্রাল প্রভিন্স (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ)-এর ভূপাল শহরে। পরে ১৯৫৩ সালে, ১৭ বছর বয়সে তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক হন। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি হল্যান্ড যান এবং সেখানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার একটি পরীক্ষাগারে ধাতু বিজ্ঞানী (metallurgist) হিসাবে কাজ করেন।

সেখানে কাজ করতে করতেই তিনি সেখানকার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতির নক্সা, সেইসব যন্ত্রপাতি যারা তৈরি করে সেই সব কোম্পানীর নামধাম তিনি চুরি করেন। তারপর তিনি তৎকালীন প্রাক্-প্রধানমন্ত্রী জেড এ ভুট্টোকে চিঠি লিখে জানান যে, সাহায্য-সুযোগ পেলে তিনি পাকিস্তানেও অনুরূপ একটি পরীক্ষাগার নির্মাণ করতে পারেন। উপরন্তু, সেই পরীক্ষাগারে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করে তিনি পারমাণবিক বোমা বানাবার চেষ্টা করতে পারেন।এই চিঠি পড়ে ভুট্টো তাকে দেশে ফিরে আসতে বলেন, এবং সেই অনুসারে তিনি ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ভুট্টো তাকে রাওয়ালপিন্ডির অদূরে 'কাহুটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি"-র প্রধানের পদে নিযুক্ত করেন।

তিনি হল্যান্ড ত্যাগ করার পরে পরেই বৈজ্ঞানিক তথ্য যন্ত্রপাতির নক্সা ইত্যাদি চুরির ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। তখন তাদের আর করার কিছু ছিল না। তবুও তারা প্রধান সন্দেহভাজন আব্দুল কাদেরের নামে মামলা করে। মামলায় আবুদল কাদের দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তার ৪ বছরের কারাদণ্ড হয়। তার অনুপস্থিতিতেই সেই মামলা হয়েছিল। তাই তাকে দিয়ে জেলের ঘানি টানানো আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, আব্দুল কাদের ১৯৭৮ সালে কাহুটা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার কাজ শুরু করেন এবং ৫ বছরের মধ্যে বোমা বানাবার মত যথেষ্ট পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম পাক-সরকারের হাতে এসে যায়।

অনেক দিন থেকেই পাক-গুপ্তচর সংস্থা 'সি অই এ'-র কাছে খবর আসছিল যে লিবিয়াও ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার কাজে লিপ্ত রয়েছে। ১৯৯৭ সালে মার্কিন সাংবাদিক সেমুর হার্শ বলেন যে, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়া চোরাগোপ্তা পথে কিছু লেনদেন করছে এবং সম্ভবত উত্তর কোরিয়া পাকিস্তানকে ক্ষেপনাস্ত্র বা মিসাইল দিচ্ছে বদলে পাকিস্তান উত্তর কোরিয়াকে পারমাণবিক বোমা তৈরির কারিগরি দিচ্ছে। এইসব কথাবার্তা চলার সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সী (আই এ ই এ) এই সব গোপন লেনদেন-এর ব্যাপারে সতর্ক হবার অনুরোধ জানায়। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও 'আই এ ই এ''র পর্যবেক্ষকরা একটা জাহাজ আটক করে এবং সেই জাহাজে করে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার সেন্ট্রিফিউজ নামক যন্ত্রের যন্ত্রাংশে লিবিয়ায় যাচ্ছিল। হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবার ফলে লিবিয়ার শাসক কর্নেল মুয়াম্মান গদ্দাফিকে সব স্বীকার করে বিবৃতি দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ''আই এ ই এ''-র পর্যবেক্ষকরা আরও ব্যাপক অনুসন্ধান চালায় এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ও নক্সা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়। সেগুলো পরীক্ষা করেদেখা যায় যে সব কিছুই পাকিস্তান থেকে এবং আরও বিশেষ করে, আব্দুল কাদের খাঁর কাহুটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকে পাঠানো হয়েছিল। আরও দেখা যায় যে, বিরাট এক চক্র এই গোপন কারবারে জড়িত রয়েছে, যার ব্যাপ্তি ইয়োরোপ, মধ্য এশিয়া, এশিয়া হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পাকিস্তানের নীতিহীন বিজ্ঞনী ও দালালরা। আরও দেখা যায় যে পাকিস্তান থেকে পরমাণু বোমার নক্সাও লিবিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। তদন্তকারী অফিসাররা আরও দেখতে পায় যে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে এই সব লেনদেন হয়েছে এবং এজন্য পাকিস্তানের পাচারকারীরা লিবিয়ার কাছ থেকে ৫ কোটি ডলার বা ২২৫ কোটি টাকা নিয়েছিল। পরে New York Times পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে মুয়াম্মার গদ্দাফি উপরিউক্ত সমস্ত তথ্যই সঠিক বলে বর্ণনা করেন। এইসব লেনদেন-এর ব্যাপারে কথাবার্তার জন আব্দুল কাদের খাঁকে বহুবার কাসাব্লাংকা, মরোক্কো এবং ইস্তানবুলে যেতে হয়।

এর পরআসে ইরানের পালা। ''আই এ ই এ'' এবং রাষ্ট্রসঙ্গের বিশেষজ্ঞরা ইরানের নিকাঞ্জ ও কালে-তেঅবস্থিত পারণামবিক পরীক্ষাগারগুলিতে অনুসন্ধান করতে যান। সেখানেও তাঁরা একই দৃশ্য দেখতে পান। সেখানেও দেখা যায়, পাকিস্তানের কাহুটায় তৈরি ইউরেনিয়াম সঋদ্ধ করার সেন্ট্রিফিউজ কাজ করছে। পর্যবেক্ষকরা আরও অনুসন্ধান ও নথিপত্র পরীক্ষা করে, জানতেপারেন যে, ওই সব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নক্সা গত ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ইরানে পাঠান হয়েছিল। এবং আব্দুল কাদেরের কাহুটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি থেকেই তা পাঠানো হয়েছিল। এখানে বলে রাখা দরকার যে, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম খনি থেকে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৮ এবং খুব কম পরিমাণে ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকে। বোমা বানাবার জন্য দরকার ইউরেনিয়াম-২৩৫ এবং প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ কে পৃথক করাকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বলে।

তদন্তকারীদের মতে ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে আব্দুল কাদের খাঁ অন্ততপক্ষে ১৩ বার উত্তর কোরিয়া যান এবং সেখানেও গোপনে তিনি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার সেন্ট্রিফিউজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন। বদলে উত্তর কোরিয়া থেকে ১২টি 'নো-ডঙ' মিসাইল কেনেন। পরে পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ এই মিসাইলের নতুন নাম দেয় 'ঘাউরি'। সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রচার করতে থাকে যে, ওই সব মিসাইল তারা নিজেরাই তৈরি করেছে। গোয়েন্দাদের অনুমান যে, ওই সময় আব্দুল কাদের উত্তর কোরিয়া থেকে স্বল্প পাল্লার বেশ কিছু 'স্কাড' মিসাইলেও কিনেছিলেন। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, প্রথম দিকে উত্তর কোরিয়ার উদ্দেশ্য ছিল প্লুটোনিয়াম দিয়ে বোমা তৈরি করার এবং পাকিস্তানের সঙ্গে গোপন বোঝপড়া হবার পরই তারা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দিয়ে বোমা তৈরি করার পরিকল্পনা করে। এবং সেই অনুসারে পাকিস্তান থেকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার যন্ত্রপাতি কিনতে শুরু করে। এই সব গোপন লেনদেন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষক মহম্মদ আল বারাদি বলেন, "এ যেন পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রী করার এক ব্যক্তিগত নোংরা কালোবাজার।" উত্তর কোরিয়া, লিবিয়া ও ইরান ছাড়া অন্য যে সব দেশকে আব্দুল কাদের খাঁ পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রী করেছেন বলে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সন্দেহ করে, তারা হল মালয়েশিয়া ও দুবাই। গত মাস দুই নীরব থেকে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী মালয়েশিয়া সরকার থেকে জানানো হয় যে, এই সব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচার।

যাই হোক, প্রথম থেকেই পাকিস্তান তার সরকারি বয়ানে বলতে থাকে যে, আব্দুল কাদের খাঁ যা করেছে, তা সবই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে টাকা রোজগারের জন্যই তিনি ওই সব কুকীর্তি করেছেন। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আব্দুল কাদের পাকিস্তানের টেলিভিশন বক্তৃতায় তার সমস্ত লেনদেন স্বীকার করেন। তার দিন দুয়েক পরেই পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মুশারফ দাভোস-এ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকার বলেন, "এটা আজ পরিষ্কার যে, কিছু লোক এই সব কুকীতির সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিগত লাভের জন্যই তারা এই সব কাজ করেছে।' এ ব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম দিকে আব্দুল কাদের খাঁ পাক-সরকার ও পাক সামরিক কর্তাদের দিকে আঙুল তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি সাক্ষাকারে বলেছিলেন, "কোন জিজ্ঞাসাবাদকেই সঠিক ও পর্যাপ্ত বলা চলে না, যদি তার মধ্যে সামরিক কর্তাকেও সামিল করা না হয়।" তাঁর এই ইঙ্গিতের ফলে তদন্তকারীরা পূর্বতন প্রধান সামরিক কর্তা লেঃ জেনারেল আসলাম বেগ এবং লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামতকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু তারা বলেন যে, এ সমস্ত ব্যাপারে আব্দুল কাদেরের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে আব্দুল কাদের ১৩ বার উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ করেন। বোমার কারিগরির বদলে ১২টি নো-ডঙ মিসাইল এবং কম

পাল্লার আরও ১০/১২ খানা স্কাড মিশাইল পাকিস্তানে নিয়ে আসেন। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, পাক-সরকার ও পাক-সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন অনুমোদন না থাকলে তার পক্ষে এত বার উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ এবং অন্যান্য কাজকর্ম কখনই সম্ভব হত না। ভারী ভারী মিসাইল ও তার যন্ত্রাংশ আব্দুল কাদের স্যুটকেশে ভরে পাকিস্তানে নিয়ে আসেননি বা আনা সম্ভব ছিল না। জাহাজে করেই ওই সমস্ত জিনিস পাকিস্তানে আনা হয়েছিল। তাই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পাক সরকারের যোগসাজসেই আব্দুল কাদের ওই সব লেনদেন করেছিলেন। যদি ব্যক্তিগত লাভের জন্যই আব্দুল কাদের উত্তর কোরিয়ায় যেতেন তবে পারমাণবিক প্রযুক্তির বদলে তিনি টাকা-পয়সা চাইতেন, মিসাইল চাইতেন না।

উপরন্তু, উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে পাওয়া ওই নো-ডঙ মিসাইলকে সামরিক কর্তারাই নাম পালটে ঘাউরি করেছেন। কাজেই এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, পাক-সরকার এবং পাক সামরিক বিভাগের পূর্ণ মদতেই এই সব লেনদেন হয়েছে। কাজেই জেনারেল আসলাম বেগ ও জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামত যে বিবৃত দিয়েছেন তা সর্বৈব মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত সত্য হল, জেনারেল পারভেজ মুশারফের পক্ষে বুঝতে সময় লাগেনি যে, এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর ও তাঁর সরকারের যোগসাজস প্রমাণিত হলে ফল খুবই মারাত্মক হবে। তাই প্রথম থেকেই তিনি ঢাক পিটিয়ে যাচ্ছেন যে, আব্দুল কাদের যা করেছে সবই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু প্রশ্ন হল, সবই যদি আব্দুল কাদের খাঁব ব্যক্তিগত ব্যাপার হত তবে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সহ মেয়ে দিনাকে লন্ডনে পাঠানোর সাহস হত না। এবং মেয়ে দিনার পক্ষেও বিবৃতি দেবার সাহস হত যে, সামরিক বড়কর্তাদের নির্দেশেই যে তাঁর বাবা কাজ করেছেন তা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট কাগজপত্র তাঁর কাছে আছে। এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, হল্যান্ডে থাকাকালীন আব্দুল কাদের হেন্‌ড্রিনা নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তার গর্ভে দুই মেয়ের জন্ম হয়।

এ ব্যাপারে আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যদি সরকার জড়িত না থাকত তবে পারভেজ মুসারফের এতটা ভীত হবার কারণ থাকত না। গত বকরী ঈদের দিন, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আব্দুল কাদের টি ভি বক্তৃতায় তাঁর দোষ স্বীকার করেন। ভিতরের খবর হল, ওই দিনই পারভেজ মুসারফ গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনি যাতে টিভি বিবৃতিতে তাঁর নাম প্রকাশ না করেন সে ব্যাপারে তাকে অনুরোধ করেন। বিশেষজ্ঞ মহলের বিশ্বাস যে, টি ভি বক্তৃতায় সব দোষ নিজে ঘাড়ে নিয়ে বলেন, "সমগ্র জাতির প্রতি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মত যে কাজ আমি করেছি, সেই ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করার জন্যই এই টিভি বক্তৃতায় আমি উপস্থিত হয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "সেই সব কাজের জন্য আমি আমার সরকারের কাছ থেকে কোন রকম নির্দেশ পাইনি। ...সব থেকে বড় কথা হল, আমি নিজে থেকেই এই সব কাজ করেছি।"

অপরদিকে, আমেরিকার পক্ষে এটা বোঝার কোন অসুবিধা হবার কথা নয় যে, পাক সরকার এবং পারভেজ মুশারফের সম্মতি ছাড়া আব্দুল কাদেরের পক্ষে ওই সব কাজ করা সম্ভব হয়নি। আর এটাও বোঝা হয়ে গিয়েছে যে, পাক সরকার আব্দুল কাদেরকে বলির পাঁঠা করতে চাইছে এবং একটু চাপ দিলেই আসল সত্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কেন আমেরিকা সেই চাপ দিচ্ছে না? এ ব্যাপারে পারভেজ মুশারফের হিসাবই মিলে যাচ্ছে। মুশারফের হিসাব হল, আফিগানিস্তানকে নিজের দখলে রাখতে আমেরিকার এখনও পারভেজ মুশারফ ও পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতা দরকার। তাই আমেরিকার পক্ষে পাক সরকারের সঙ্গে কোন বিবাদে যেতে চাইবে না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ব্রুকিং ইনস্টিটিউট'-এর অধিকর্তা স্টিফেন সোহেন বলেন, "পাকিস্তানের ভাগ্য ভাল যে, পাক-মার্কিন সুসম্পর্কের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। তা না হলে এই ঘটনা পাকিস্তানের কাছে হত ধ্বংসাত্মক। তবে আব্দুল কাদেরও একজন ধোয়া তুলসীপাতা নন্। তাঁর বর্তমান বিষয় সম্পত্তি আয়ের সঙ্গে চরমভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। রাওয়ালপিন্ডির বালিয়া নালা এলাকায় "রাওয়াল লেক"-এর পারে তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, পৌর-সংস্থার অনুমোদন ছাড়াই তিনি তা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আরও তিন খানা বাড়ী রয়েছে ইসলামাবাদের সম্ভ্রান্ত এলাকায়। এবং তাঁর স্ত্রীর নামে মালিতে রয়েছে দুখানা রেস্তোরাঁ ও একখানা পাঁচ-তারা হোটেল। সাহায্যকারী তাঁর ছয়জন অধস্তন বিজ্ঞানীও এই সব টাকা পয়সার ভাগ পেয়েছে। তা ছাড়া এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রীলঙ্কার এক ব্যক্তি, নাম সৈয়দ আবু তাহের বুখারী। ইনি শ্রীলঙ্কার নাগরিক বটে, তবে বসবাস করেন দুবাই-এ।

যাই হোক না কেন, "ইসলামী বোমার জনক" হিসাবে আব্দুল কাদের যে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও কট্টরপন্থী জিহাদীদের মনে শ্রদ্ধার স্থান করে নিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই কারণেই তাঁর প্রতি দোষারোপ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শহরগুলিতে তাঁর সমর্থনে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়ে যায়। এবং জনতাকে শান্ত করতে পারভেজ মুশারফকে তড়িঘড়ি সরকারি ক্ষমা ঘোষণা করতে হয়। প্রাক্তন সামরিক কর্তা লেঃ জেনারেল আসলাম বেগ ও লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর কারামত-এর নির্দেশে এই কাজ করেছেন, এই ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ওপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সামরিক বিভাগ ভয় পায়।

তবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহলের অনুমান যে, পারভেজ মুশারফ চোখে ধুলো দিয়ে নিরপরাধ সাজার য়ত চেষ্টা করুন না কেন, আমেরিকা তাঁকে সহজে ছেড়ে দেবে না। পাক গুপ্তচর সংস্থা "আই এস আই"-র প্রাক্তন অধ্যক্ষ লে. জেনারেল হামিদ গুল-এর অনুমান, "মার্কিন সরকার এই পরিস্থিতিকে অবশ্যই কাজে লাগাবে। পাকিস্তানের সমস্ত পারমাণবিক কাজকর্মকে যুক্ত তত্ত্বাবধানে আনার নাম করে তার ওপর মার্কিন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

উপরন্তু, নিয়মিত পর্যবেক্ষণের নাম করে পাক পারমানবিক অস্ত্র ও মিসাইল ভাণ্ডারকে নিজের কবজায় নিয়ে নেবে।" পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন সামরিক কর্তা লে. জেনারেল তালাৎ মাসুদ মনে করেন, "সন্ত্রসবাদীদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের মত মারাত্মক অস্ত্র চলে যেতে পারে, এই অজুহাত দেখিয়ে আমেরিকা সবকিছুর ওপর কবজা জমাবে।" আমেরিকা যে এই পথেই এগুবে, তা স্টিফেন কোহেনে-র বক্তব্যের মধ্য দিয়েও পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি বলেন, "এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। তা না হলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই দেখা যাবে যে এই সব ভয়ঙ্কার মারণাস্ত্র কোন তালিবান বা আল কায়েদা-র নেতার হাতে চলে গিয়েছে।"

আমেরিকা উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে ভারতের যে অনেক দুশ্চিন্তার লাঘব হবে তা বলাই বাহুল্য। সকলেই স্বীকার করবেন যে, পাকিস্তানের মত নীতিহীন রাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা পঞ্চতন্ত্রের গল্পের সেই বাঁদরের হাতে তলোয়ার থাকার মতই বিপজ্জনক।

নয়া সন্ত্রাসবাদ ঃ জৈবিক, রাসায়নিক, পারমাণবিক আক্রমণ

গত বছর অক্টোবর মাসে আমেরিকার টিভি-চ্যানেল 'এ বি সি নিউজ' একটা গা-হিমকরা ছবি দেখিয়ে দর্শকদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ছবিটা হল—সন্ত্রাসবাদীদের একটি দল আমেরিকার কোনও এক শহরের পাতাল রেলের স্টেশনে সকলের অলক্ষ্যে কয়েকটা শিশি থেকে কিছুটা তরল পদার্থ ঢেলে দিল। তা থেকে তৈরি হল মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুর এক অদৃশ্য মেঘ। প্রাথমিকভাবে শ'পাঁচেক লোকের ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সামান্য জ্বর হল, কিন্তু দু'তিন দিনের মধ্যে তা চলে গেল। কয়েকদিন পরে সেইরোগ-লক্ষণ প্রবলভাবে ফিরে এল। জ্বর, গা ব্যথা ইত্যাদির সঙ্গে দেখা গেল তাদে ফুসফুসে জল জমে গিয়েছে।

আতঙ্কিত মানুষ হাসপাতালে ছুটল। দেখা গেল হাজার হাজার মানুষ আগে থেকেই সেখানে গিয়ে ভিড়জমিয়েছে। এত লোকের চিকিৎসা করতে ওষুধপত্রও খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল। হাসপাতালগুলোতে তাই জমতে থাকল মৃত মানুষের পাহাড়। কিন্তু কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব হল না যে শহরে একটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটে গিয়েছে।

'এ বি সি নিউজ' খুব ভাল করেই জানিয়ে দিয়েছিল যে,যা দেখানো হচ্ছে তা নিছক একটা কল্প-কাহিনী মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু দর্শক অভিযোগ করলেন, এরকম একটা কল্পকাহিনী না দেখালেই ভাল হত। কারণ এর ফলে প্রকৃত সন্ত্রাসবাদী, যারা আমেরিকার সক্রিয় রয়েছে, তারা উৎসাহ পাবে। আমেরিকার তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিল কোহেন বললেন, 'বিষয়টা মোটেও তুচ্ছ করার নয়। সত্যি সত্যি এরকম একটা আক্রমণ হলে যে এক মহাবিপদের সূচনা হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। রোগ মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে ব্যাপক এক মহামারীর সৃষ্টি করতে পারে। হাসপাতালগুলো মৃত ও মৃতপ্রায় মানুষের গুদামঘরে পরিণত হতে পারে। তাই বিষয়টা খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।' মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনস' বা 'এফ বি আই'-এর সর্বোচ্চ কর্তা লুই ফ্রি বললেন, "বর্তমানকালে জৈব হাতিয়ারের আক্রমণই সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক এবং তা ব্যাপক এক গণহত্যা সংঘটিত করতে পারে।"

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের "স্টোর ফর সিভিলিয়ান বায়ো-ডিফেন্সের" ডিরেক্টর ডোনাল্ড হেন্ডারসন বলেন, "কেবলমাত্র বড় বড়

ল্যাবরেটারিগুলোই জৈব আক্রমণের হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম, সে ধারণা আজ অচল হয়ে পড়েছে। জৈব হাতিয়ার তৈরির কলাকৌশল, আজ যে কেউ ইন্টারনেট থেকে যোগাড় করতে পারে এবং জৈব বিজ্ঞানে যার প্রাথমিক জ্ঞান আছে সে-ই তা থেকে জৈব হাতিয়ার তৈরি করে ফেলতে পারে।" হেন্ডারসন আরও বলেন, "অন্যান্য জৈব আক্রমণের মধ্যে অ্যানথ্রাক্স ও বসন্তের জীবাণু-ঘটিত আক্রমণের সম্ভাবনাই অজ সর্বাপেক্ষা অধিক।"

অ্যানথ্রাক্স ও বসন্তের মধ্যে বসন্তই হল অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। গত ১৯৬৭ সালে সর্বপ্রথম এই রোগকে নির্মূল করতে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই সময় এই রোগে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ মারা যেত। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দু'দশক আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে এই রোগকে তাড়ানো সম্ভব হয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আজ মাত্র আমেরিকার একটা পরীক্ষাগার ও রাশিয়ার একটা পরীক্ষাগারেই সরকারিভাবে এই জীবানু ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত আছে। তাই সাধারণভাবে অনুমান করা হয়ে থাকে যে সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে এই রোগের জীবাণু যাদের কাছে সংরক্ষিত করা আছে তাদের কাছ থেকে অনেক টাকার বিনিময়ে, চোরাগোপ্তা পথে , সন্ত্রাসবাদীরা তা সংগ্রহ করতে পারে।

বসন্ত-ঘটিত জৈব আক্রমণের ক্ষেত্রে সব থেকে বিপদের কথা হল, পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যাওয়ার ফলে এর টিকা তৈরিও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে বর্তমান পৃথিবীর ৯০ শতাংশ মানুষের পক্ষে টিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই এই রোগ প্রতিরোধ করার কোনও ক্ষমতাও তাদে নেই। আর বসন্ত যেহেতু ভাইরাস-ঘটিত রোগ, তাই প্রতিরোধই এর একমাত্র চিকিৎসা। তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কোথাও এই রোগ একবার শুরু হলে তা দাবানলের মতেই ছড়িয়ে পড়বে এবং আক্রান্ত প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মারা যাবে। তাঁরা আরও মনে করেন যে, কোনও দেশে যদি প্রথম ৫০ জনও আক্রান্ত হয় তবে তা দেশব্যাপী মহারামারীতে পরিণত হতে পারে। এই মহামারী ঠেকাতে যে পরিমাণ টিকার প্রয়োজন তা তৈরি করতে কমপক্ষে এক বছর সময় লাগবে এবং তার মধ্যে অনেক জনবসতি সাফ হয়ে যাবে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর আমেরিকার মানুষ আজ অ্যানথ্রাক্স আক্রমণের আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে ততই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এই ভয়াবহতার কারণ হল, আক্রান্তদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মারা যায়। তাই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ডিরেক্টর গ্রে হার্লেস ব্রান্টল্যান্ড ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীকে এই আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর অনেক দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে তিনি বলেছেন, সব দেশের মানুষকেই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে, কারণ যে কোনও দেশে, যে কোনও সময়ে অ্যানথ্রাক্সঘটিত জৈব আক্রমণ ঘটে যেতে পারে। কঠোর নজরদারি ও দ্রুত স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি রাখতে হবে,যাতে অ্যানথ্রাক্স

বা বসন্তের মতো মারাত্মক জৈব আক্রমণ হলেও তাকে প্রতিরোধ করা যায়। এবং বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা করতে হবে।'

ইতিমধ্যে আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি ডিক চেনি গত ১২ অক্টোবর বলেন, 'আমেরিকায় অ্যানথ্রাক্স ঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ওসামা বিন লাদেনের মতো মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক থাকার সন্দেহকে পুরোপুরি নাকচ করা চলে না। যদিও তেমন কোনও অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে এখনও আসেনি, তবুও নিউ ইয়র্ক ও ফ্লোরিডায় অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ সত্যিই সন্দেহজনক। সন্দেহ করার প্রধান কারণ হল ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা এবং আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান হানার ঠিক পরে পরেই এই সংক্রমণ শুরু হয়েছে।' ডিক চেনি আরও বলেন যে ক্ষেতে কীটনাশক ছড়াবার স্প্রেয়ার কিংবা সামান্য সুগন্ধি ছড়াবার শিশি দিয়ে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া চলে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক জীবাণু বিশেষজ্ঞ বলেন, ১০ লক্ষ লোক বাস করে এমন এক শহরের বাতাসে ৪৫ কিলোগ্রাম অ্যাথ্রাক্স কালচার ছড়িয়ে দিলে এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৬ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটবে।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ভবিষ্যতে সন্ত্রাসবাদীরা জৈব, বা রাসায়নিক, বা পারমাণবিক অস্ত্রের মতো অপ্রচলিত অস্ত্রের ওপরই বেশি নির্ভর করবে। গত ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে, নাইরোবি ও দার-এস-সালামের মার্কিন দূতাবাসে সন্ত্রাসবাদী হামলার মাত্র কয়েকদিন পরেই, রাজধানী ওয়াশিংটনে ভবিষ্যতের সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দশটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা এতে অংশগ্রহণ করেন। জৈব ও রাসায়নিক আক্রমণ, জনস্বাস্থ্য, রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার, আইনজ্ঞ ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিরা। সকলেই এ বিষয়ে একমত হন যে, এরকম আক্রমণ হলে প্রাথমিকভাবে বহু জীবননাশের ক্ষতি তো হবেই। তাছাড়া সরকারের কর্মকুশলতার উপর সাধারণ মানুষ আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন যে, কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় সন্ত্রাসবাদীরা যে ধরণের হামলা করেছে, তাকে বলা চলে পুরনো যুগের আক্রমণ। তাতে ব্যবহার করা হয়েছে কয়েকশ কেজি আর ডি এক্স বা সমপরিমাণ অন্য কোনও বিস্ফোরক। কিন্তু নয়া সন্ত্রাসবাদে ব্যবহৃত হবে অনেক ছোট আকারের এবং বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না এমন ধরনের অস্ত্র। বোমা বিস্ফোরণ বা বিমান ছিনতাইয়ের মতো আক্রমণের চাইতে তো হবে অনেক মারাত্মক।

ব্রুস হপম্যান একজন রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ওই বৈঠকে উপস্থিত চিলেন। তিনি বলেন, 'পুরনো আমলের সন্ত্রাসবাদীদের একটা ঘোষিত অন্তিম উদ্দেশ্য থাকত। যেমন কোনও বিদেশী শক্তি বা কোনও স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটানো বা পুঁজিবাদকে উৎখাত করা ইত্যাদি। তারা যেসব আক্রমণ চালাত, তাতে খুব বেশি লোকর জীবনহানির প্রচেষ্টা থাকত না। তাদের সন্ত্রাসবাদের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সমস্যার কথা বিশ্ববাসীকে

জানানো। কিন্তু আজকের সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে, বিশেষ করে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে, সেইরকম প্রচেষ্টার খুবই অভাব। তাদের মধ্যে আছে ধর্মীয় উন্মাদনা, অসহিষ্ণুতা অথবা পাশ্চাত্য, বিশেষ করে আমেরিকার ক্ষতি সাধন করার উদগ্র লিপ্সা। তাদের মধ্যে আছে শুধু ধ্বংস ও প্রতিশোধ স্পৃহা।'

পারমাণবিক অস্ত্রের আক্রমণের ব্যাপারটা সকলের কাছেই অতিশয় ভয়ের ব্যাপার। তবে অনেকে মনে করেন যে, একটা বোমা বানাতে যতটা প্লুটোনিয়াম বা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দরকার তা কোনও সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া কোনও সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। এখানেও বলা চলে যে, দুঃসাধ্য হলেও তা একেবারে অসম্ভব নয়। সোভিয়েত আমলে রাশিয়া ছোট মাপের অনেক পারমানবিক বোমা বানিয়েছিল, সেগুলোকে 'স্যুটকেশ বোমা' বলা হত। গত ১৯৯৭ সালে রাশিয়ার তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী আলেকজান্দার লেবেদ ঘোষণা করলেন যে ওই রকম প্রায় ১০০টি 'স্যুটকেস বোমা' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সোভিয়েত সঙ্ঘ ভেঙে যাওয়ার সময় ডামাডোলের মধ্যে ওই বোমাগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

সোভিয়েত সঙ্ঘের আমলে তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ইত্যাদি মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর অস্ত্রভাণ্ডারেও অস্ত্র মজুদ রাখা হত। সোভিয়েত সঙ্ঘ ভেঙে যাওয়ার পরে সে সব অস্ত্র ওইসব দেশগুলোর হাতে চলে যায়। কাজেই সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে সেই সব ভাণ্ডারে 'স্যুটকেস বোমা'ও ছিল এবং সেই অস্ত্রও জঙ্গী মুসলিমদের হাতে চলে যায়। কাজেই কোটিপতি সন্ত্রাসবাদী ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে তাদের কাছ থেকে কালোবাজারে সেই অস্ত্র কিনে নেওয়া অসম্ভব কাজ নয়। তাই অনেকেই মনে করেন লাদেনের হাতে বেশ কিছু পারমাণবিক বোমা মজুদ আছে। তবে স্বস্তির কথা হল হৈ যে, সেই বোমা প্রয়োগ করার মতো মিসাইল বা বোমারু বিমান বর্তমানে ওসামার হাতে নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে পাকিস্তান বা ইরান বা অন্য কোনও দেশ থেকে তা যোগাড় করা অসম্ভব হবে না।

অনেকের মতে, স্যুটকেস বোমা ছাড়াও ওসামার হাতে বড় ধরনের পারমানবিক বোমা আছে, যা সে পাকিস্তান বা উত্তর কোরিয়া থেকে সংগ্রহ করেছে। আরও বিপদের কথা হল, সেই বোমা জাহাজে মাল পাঠাবার কন্টেনারে করে লুকিয়ে আমেরিকা বা অন্য কোনও দেশে পাচার করা ওসামার পক্ষে কঠিন কাজ নয়। সম্প্রতি আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন অফিসার এ ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, প্রতিদিন জাহাজে করে লক্ষ লক্ষ কন্টেনার আমেরিকার বন্দরগুলিতে আসছে। এর প্রতিটি কন্টেনারকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা এক অসম্ভব কাজ

এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, মিসাইল বা বোমারু বিমান ছাড়া যে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো যায় না, তা নয়। সেক্ষেত্রে জমিতেই বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

ফলে ধ্বংসের কাজটা অত ব্যাপক হবে না। মিসাইল বা বোমারু বিমানের সাহায্যে জমি থেকে বেশ খানিকটা ওপরে বিস্ফোরণ ঘটালে ধ্বংসকার্য সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হবে।

পারমাণবিক অস্ত্রের তুলনায় জৈব বা রাসায়নিক, দুই-ই অনেক ছোট আকারে তৈরি করা যায়। তাই তা লুকিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়াও অনেক সোজা। এইসব অস্ত্র বানানোও আজ খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। সম্প্রতি পেন্টাগনের এক কর্তা এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'বিয়ার গাঁজিয়ে তোলার একটা ফারমেন্টার, জীবাণু কালচার করার কিছু যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক, একটা জীবাণু সংক্রমণ রোধ করার পোশাক ইত্যাদি কিনে তা ছোট একটা ঘরে মজুদ করে মাত্র ১০,০০০ ডলার খরচা করে একটা জৈব ল্যাবরেটারি তৈরি করা যায়। এবং জৈব বিজ্ঞানে সামান্য জ্ঞান আছে এমন যে কোন্য ব্যক্তি সেখানে মারাত্মক জৈব অস্ত্র তৈরি করে ফেলতে পারে। কয়েক মাসের মধ্যে তার পক্ষে কয়েক হাজার লিটার অ্যানথ্রাক্স জীবাণু কালচার তৈরি করা কোনও অসম্ভব কাজ নয়।' তিনি আরও বলেন, 'হাজার হাজার লোক মারতে পারে এমন রাসায়নিক অস্ত্র বানাতে গেলে যে বিশাল পরিমাণ মারাত্মক রাসায়নিক জড়ো করা প্রয়োজন, তা আশেপাশের লোকের নজর এড়িয়ে করা সম্ভব নয়। কিন্তু জৈব অস্ত্রের ক্ষেত্রে সে অসুবিধা নেই। অতি অল্প পরিমাণ জীবাণুও সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বেশ কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটানো সম্ভব।

জৈব আক্রমণ ও রাসায়নিক আক্রমণের মধ্যে আরও একটা বড় তফাত রয়েছে। রাসায়নিক আক্রমণের বেলায় আক্রান্ত লোকেরা তৎক্ষণাৎ মরতে শুরু করবে। ফলে সবাই বুঝে ফেলবে যে, একটা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু জৈব আক্রমণের ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে কমপক্ষে ২-৩ দিন সময় লাগবে। ফলে সাধারণের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবে কবে, কখন, কোথায় এবং কীভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে।

জিহাদের অস্ত্র হিসেবেই মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে

গত ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ৮,০১,৭৬,১৯৭ জন এবং এর মধ্যে হিন্দু ছিল ৫,৮১,০৪,৮৩৫ জন এবং মুসলমান ছিল ২,০২,৪০,৫৪৩ জন। অর্থাৎ হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৭২.৪৭ জন, মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৫.২৫ জন। কিন্তু দশছর আগে ১৯৯১ সালের লোকগণনার সময় হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৪.৭২ জন অর্থাৎ গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২.২৫ জন কমেছে। ২০০১ সালের জনগণনায় সারা ভারতের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ১০২ কোটি ৮০ লক্ষ, যার মধ্যে হিন্দু ছিল ৮২ কোটি ৭৫ লক্ষ, বা শতকরা ৮০.৫ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২.১ জন, অর্থাৎ গত ১০ বছরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১.৩ জন বেড়েছে।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। গত ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে এই রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৪.৫ শতাংশ এবং ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে তা বেড়ে হয় ৩৬.০ শতাংশ। অর্থাৎ গত ১০ বছরের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়েছে ১.৫ শতাংশ। কিন্তু ওই একই সময়ের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৫.১ শতাংশ থেকে কমে ২০.৩ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ তা ৪.৮ শতাংশ কমেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে তিনটি কারণ আছে—(১) অধিক জন্মহার, (২) অনুপ্রবেশ ও (৩) ধর্মান্তরকরণ। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ অনুপ্রবেশ এবং দ্বিতীয় কারণ অধিক জন্মহার। পুরুষের বহু বিবাহ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ না করার ফলেই যে মুসলমানদের জন্মহার সকলের উপরে, তা বলাই বাহুল্য।

শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা শুধু ভারতবর্ষই নয়। মুসলমাদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি আজ একটি আন্তর্জাতিক সম [illegible] বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১২.০ শতাংশ, কিন্তু গত ২০০০ সালে তা বেড়ে ১৯.০ শতাংশ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'Clash of Civilizations and the Remaking of World Order'

গ্রন্থের লেখক স্যামুয়েল হান্টিংটন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ৩০.০ শতাংশে পৌঁছাবে। মুসলমানদের অন্তিম লক্ষ্য হল যে সব দেশ এখনও মুসলমানদের দখলে আসেনি, সেই সব দেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে তাকে ইসলামী দেশ বা দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। গত ১৯০০ সালে লেবাননের জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ ছিল খৃষ্টান। ১৯৩২ সালে খৃষ্টানদের সংখ্যা কমে হয় ৫৫ শতাংশ এবং মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৫ শতাংশ। এইভাবে ১৯৭০-৭৫ সালের মধ্যে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় এবং লেবানন একটি ইসলামী দেশে পরিণত হয়। কোসোভো এবং বসনিয়াতেও সার্বরা ছিল ৪৩ শতাংশ এবং মুসলমানরা ছিল মাত্র ২৬ শতাংশ।

মাত্র ৩০ বছর পরে, ১৯৯১ সালে, মুসলমানদের সংখ্যা হয় ৪৪ শতাংশ এবং সার্বদের সংখ্যা কমে হয় ৩৩ শতাংশ। ১৯৬১ সালে কোসোভাতে সার্বরা ছিল ২৪ শতাংশ, কিন্তু ১৯৯১ সালে তাদের সংখ্যা কমে হয় ১০ শতাংশ। ২০০১ সালে সার্বদের সংখ্যা কমে হয় মাত্র ২ শতাংশ। ইয়োরোপের ফ্রান্স, বৃটেন, স্পেন, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে মুসলমানদের সংখ্যা যেই হারে বাড়ছে তাতে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের অনুমান, আগামী ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ইয়োরোপ একটি মুসলিম প্রধান বা ইসলামি মহাদেশে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার নিগ্রোরা দলে দলে মুসলমান হবার ফলে মুসলমানের সংখ্যা সেখানেও খুব দ্রুত হারে বাড়ছে (এ ব্যাপারে উৎসাহী পাঠক Gilles Kepel এর Allah in the West গ্রন্থ দেখতে পারেন)।

স্যামুয়েল হান্টিংটন-এর মতে বর্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীর ৪টি অঞ্চলে মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমানদের সংঘর্ষ চরমে পৌঁছবে, যার মধ্যে ভারতবর্ষের স্থান সবার উপরে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইয়োরোপ। বাকী দুটি অঞ্চল হল ইসরাইল সহ মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়া। চেচনিয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে রাশিয়ায় সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু পার্শ্ববর্তী আজারবাইজান, তাজিকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোতে মুলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের রাশিয়ায় অনুপ্রবেশ এই সংঘর্ষকে আরও ব্যাপক ও আসন্ন করে তুলেছে। এছাড়া আলবেনিয়া থেকে পার্শ্ববর্তী ম্যাসিডনিয়ায় মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ আর একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

গত বিংশ শতাব্দীতে মুলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় বিজয়ের ঘটনা ছিল—প্রথমে পাকিস্তান এবং পরে পাকিস্তান ও ইসলামী বাংলাদেশের সৃষ্টি। বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর বিগত ৩০ বছরে সেখান থেকে জনসংখ্যার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মুসলমান অধিবাসীকে পরিকল্পনা মাফিক ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের অনুমান, অন্ততপক্ষে আড়াই কোটি বাংলাদেশি মুসলমান ভারতে ঢুকে পড়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ৯টি সীমান্তবর্তী জেলা মুসলমান প্রধান হয়ে গিয়েছে এবং অলিখিত ভাবে বাংলাদেশের সীমা ২০ থেকে ২৫ কিমি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে।

ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে দেশ দখল করার কায়দা কৌশল স্বয়ং নবী মহম্মদ তাঁর জীবদ্দশাতেই মুসলমানদের হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ যখন মক্কা থেকে হিজরাৎ করে মদিনায় এলেন, তখন মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। চারটি উপায়ে তিনি মদিনায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়িয়ে তাকে মুসলিম প্রধান করার কৌশল অবলম্বন করেন। প্রথমত মক্কার মুসলমানদের মদিনায় এনে (অনুপ্রবেশের সাহায্যে)। দ্বিতীয়ত, মদিনার অমুসলমানদের মুসলমান করে (অর্থাৎ ধর্মান্তরকরণের দ্বারা)। তৃতীয়ত, মুসলমানদের জন্মহার বাড়িয়ে এবং চতুর্থত, মদিনার অমুসলমান ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করে। সেই সময় মক্কাতেও মুসলমানের সংখ্যা তত বেশি ছিল না, তাই অনুপ্রবেশের দ্বারা আংশিক সাফল্য লাভ করাই সম্ভব হয়েছিল। তখনো তরোয়ালের সাহায্যে মুসলমান করার মত শক্তি মহম্মদের হয়নি। তাই ধর্মান্তরিত করার প্রশস্ত পথ ছিল, (১) কোন ক্রীতদাসকে টাকা দিয়ে মুক্ত করে মুসলমান করা (২) দেনার দায়ে ডুবে থাকা কোন ব্যক্তিকে দেনা থেকে মুক্ত করে মুসলমান করা এবং (৩) সরাসরি ঘুষ দিয়ে মুসলমান করা। প্রথম দিকে ধনী ব্যক্তি আবু বকরকেই এই সব আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হত।

মুসলমানদের জন্মহার বাড়াবার জন্য মহম্মদ প্রথমে মুসলমানদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালন করাকে পাপ বলে ঘোষণা করলেন এবং দ্বিতীয়ত বললেন যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ মুসলমান যার যত বেশি সংখ্যক পত্নী আছে। অর্থাৎ পুরুষের বহু বিবাহকে মান্যতা দিয়ে সন্তান সংখ্যা বাড়ানো। আজও আমাদের দেশকে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে দার-উল-ইসলাম করার জন্য মুসলমানরা এই পথকেই বেছে নিয়েছে। বিখ্যাত মুসলিম নেতা আলি মিয়া তাই মুসলিম মহিলাদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'Muslim women should use their womb as a weapon to give birth too many children and make India a Muslim majority country as early as possible'—অর্থাৎ 'মুসলমান মহিলাদের উচিত তাদের গর্ভকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা এবং বেশি বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়া যাতে করে এই ভারতবর্ষকে যত শীঘ্র সম্ভব একটি মুসলমান প্রধান দেশে পরিণত করা যায়।'

মদিনায় মুসলমানের সংখ্যা কিছুটা বাড়লে নবী তাঁর চাচা হামজা এবং চাচাত ভাই আলি ও যুবায়ের-এর সাহায্যে একটা সন্ত্রাসবাদী দল তৈরি করে ফেললেন। ইতিমধ্যে সময় বুঝে আল্লা বাণী অবতীর্ণ করলেন, 'আমি কোন জায়গায় নবী পাঠালে সেখানকার মানুষকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি যাতে তারা বিনত হয়।' সুতরাং নবী মদিনায় অমুসলমানদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন করার ছাড়পত্র আল্লার কাছ থেকে পেয়ে গেলেন। তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে তরবারির সাহায্যে মদিনার কাফেরদের মুসলমান করা। মদিনায় তখন নাজির, কানুইকা ও কুরাইজা গোত্রের ইহুদীদের বাস ছিল। নবী

তাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করে কানুইকা ও নাজির ইহুদীদের মদিনা থেকে উৎখাত করলেন এবং কুরাইজাদের ৮০০ সক্ষম পুরুষকে এক দিনের মধ্যে শিরচ্ছেদ করলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদের কিছুকে (অর্থাৎ যুবতী মেয়েদের) নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন এবং বাকীদের মধ্যে সবাইকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিলেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আজ বাংলাদেশের মুসলমানরা সেখানকার হিন্দুদের ওপর যা করছে, নবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই তা করছে। গুরু খুনী হলে শিষ্যও খুনী হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

তবে বর্তমানে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা আলি মিয়ার পরামর্শ অনুসরণ করে জন্মহার বাড়িয়ে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানোকেই প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। শুধু ভারত বা পশ্চিববঙ্গ বললে ভুল হবে, গোটা দুনিয়ার মুসলমানের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যও তারা এই পথকেই ব্যবহার করে চলেছে। কোন দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত, তা নির্ণয় করার একটা পন্থা হল সেই দেশের মেয়েরা গড়ে কয়টা শিশুর জন্ম দেয়। একে নারীদের উর্বরতার হার (fertilty rate) বলে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সমীক্ষা বলছে যে, মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে এই উর্বরতার হার অনেক বেশি এবং এ ব্যাপারে সকলের উপরে রয়েছে ইয়েমেন-এর মহিলারা। তাদের উর্বরতা হার ৭.০০ অর্থাৎ ইয়েমেনের একজন মহিলা গড় ৭টা শিশুর জন্ম দেয়। সৌদি আরবে এই উর্বরতা হার ৬.১৫। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলে এই উর্বরতা হার কত তা (সারণী দ্রষ্টব্য) দেখানো হল।

বিশেষজ্ঞদের মতে ইসলামী দেশগুলোতে মহিলাদের উচ্চ উর্বরতা হারের কারণ হল, (১) মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং (২) জন্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্য পরিহার করা। উর্বরতা হার বেশি হবার জন্য ইসলামী দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। উদাহরণস্বরূপ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশ (উর্বরতা ২.৯)। কিন্তু পাকিস্তানে এই হার ২.১ শতাংশ (উর্বরতা ৪.১)। এর ফলেই ইসলামী দেশগুলোতে মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং এই বাড়তি লোকসংখ্যা পার্শ্ববর্তী অমুসলিম দেশগুলিতে ঢুকে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। ইয়োরোপের দেশগুলিতে জন্মহার কমে যাবার দরুণ বৃদ্ধদের সংখ্যা বাড়ছে, যুবকদের সংখ্যা কমছে। অর্থাৎ কলকারখানায় কায়িক শ্রম করার লোক কমে যাচ্ছে। সেই কারণে অনেক দেশ বাধ্য হয়ে মুসলিমদেশ থেকে যুবকদের অনুপ্রবেশ করতে দিচ্ছে। বিশেষ করে আলজেরিয়া, লিবিয়া ও তুরস্কের মুসলমান যুবকরা ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী ইত্যাদি দেশে ঢুকে পড়ছে। এবং কালে এই সব অনুপ্রবেশকারীরা মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে এবং সমস্যার সৃষ্টি করছে।

যাইহোক, মুসলমানদের এই দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কি পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার যায় তা নিয়ে পাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং তাদের সকলেই এক মত যে, সমানতালে অমুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি

সারণী

দেশ	উর্বরতা
ইয়েমেন	৭.০০
সৌদি আরব	৬.১৫
আফগানিস্তান	৫.৬১
নাইজেরিয়া	৫.৪২
পাকিস্তান	৪.১০
বাংলাদেশ	৩.১৭
ইয়োরোপের দেশ সমূহ	১.১-১.৬
ভারত	২.৯
ভারতের হিন্দু	২.১

করাই এর একমাত্র প্রতিবিধান। গত ২০০১ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকেন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য। সেই বৈঠকে পুতিনের পরামর্শদাতা ভ্লাদিমির মিরিনোভস্কি বলেন যে, রাশিয়ার যুবকদের একাধিক বিয়ে করার অধিকার দিতে হবে এবং বেশি সন্তান জন্ম দিতে তাদের উৎসাহিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, মুসলমান যুবকরা চারটি পত্নী রাখার সুযোগ পায়, তাই রুশ যুবকদের পাঁচটি স্ত্রী রাখার অধিকার দিতে হবে। এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে ৪ থেকে ৫টি সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত করতে হবে। কিছুদিন আগে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং প্রত্যেক বৃটিশ (অমুসলমান) দম্পতিকে ৪ থেকে ৫টি সন্তানের জন্ম দিতে পরামর্শ দেন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিক পিটার কস্টেলো (Peter Costello) দেশের খ্রীস্টান দম্পতিদের প্রত্যেককে অন্ততপক্ষে ৩টি সন্তানের জন্ম দিতে উপদেশ দেন এবং বলেন, 'একটি সন্তান স্বামীর জন্য, একটি সন্তান স্ত্রীর জন্য এবং একটি সন্তান দেশের জন্য।'

কিন্তু উপরিউক্ত উপায়ে ভারতের মত একটি জনবহুল দেশে সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই এখানে নিম্নোক্ত দুটি উপায় অবলম্বন করা চলতে পারে। প্রথমত স্বাধীনতার পরবর্তী ঘটনাসমূহ যদি সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এটাই দেখা যাবে যে মুসলমানদের এই খণ্ডিত ভারতবর্ষে থাকার কোনো অধিকার নেই। যখন ১৯৪০ সালে ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রথম পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল, তখন মুসলিম নেতারা দেশভাগের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে জনবিনিময় বা population exchange মেনে নিয়েছিল। স্বাধীনতার সময় ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ, এবং দেশভাগের সময় এই ২৩ শতাংশ মুসলমান আবিভক্ত ভারতের ৩২ ভাগ জমি পেয়েছে। সেই সময় দেশের মুসলমান প্রতিনিধিদের ৯৭ শতাংশ পাকিস্তানের দাবি এবং

পরবর্তী জনবিনিময়ের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। আজ সেই সব মুসলমানরা পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে বসে আছে তারা ওই সব মুসলমানদেরই বংশধর। কাজেই তাদের বিনয়ের সঙ্গে এটাই বলা উচিত, 'ওহে মুসলমান ভাইরা, তোমাদের এদেশে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। তোমরা তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে যত পার বংশবৃদ্ধি কর।'

দ্বিতীয় পন্থা হিসাবে লক্ষ্য করা বিষয় হল, আরবের গ্রন্থের প্রভাবেই আমাদের দেশের মুসলমানরা আজ সংখ্যা বাড়িয়ে ভারতবর্ষকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চেষ্টার নামই জিহাদ। কাজেই জিহাদের অঙ্গ হিসাবেই তারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যদি তাদের আরবের গ্রন্থের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়, তবে তাদের সমস্ত রকম অমানবিক কাজই বন্ধ হয়ে যাবে।

সেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হবে সংখ্যা বাড়িয়ে ভারতকে দার-উল-ইসলাম করার প্রচেষ্টা। তাদের বিরত করা যাবে। কাজেই প্রশ্ন হল, আরবের গ্রন্থের প্রভাব থেকে তাদের মুক্ত করা যাবে কি ভাবে? উপায় একটাই, তা হল আবার তাদের বৈদিক সনাতন ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটা কোন নতুন কথা নয়। স্বামী বিবেকানন্দও প্রকারান্তরে ওই একই কথা বলে গিয়েছেন। তিনি ভারতবাসীদের জন্য বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামী দেহের পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কোন মুসলমানের মস্তিষ্ক যদি বৈদান্তিক হয় তবে সে কি আর মুসলমান থাকবে? কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তিনি প্রকারান্তরে সব মুসলমানকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনবার কথাই বলে গিয়েছেন। সেটাই একমাত্র পথ এবং একমাত্র সেই পথেই হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই কল্যাণ আছে।

স্বস্তিকা, ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪১১

কোসোভা সঙ্কট থেকে হিন্দুর যা শিক্ষণীয়

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার মদতে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলোকে নিয়ে ন্যাটো NATO জোট গঠন করা হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম ইয়োরোপে যে কোন সম্ভাব্য সোভিয়েট আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করা। কাজেই ১৯৯১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর ন্যাটো একটি মৃতপ্রায় জোটে পরিণত হয়। কিন্তু এ বছর, গত ২৪ মার্চ, সেই মৃতপ্রায় ন্যাটো অবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সে তার প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকাকে বর্জন করে এক আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। ন্যাটোর বিমান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যুগোশ্লাভিয়ার উপর বোমা বর্ষণ করতে শুরু করে। ভারত সহ রাশিয়া ও চীন তীব্র প্রতিবাদ জানায় কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয় না। আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদতে ন্যাটো বিমান আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

ন্যাটোর এই আক্রমণাত্মক ভূমিকার স্বপক্ষে কারণ দেখানো হয় যে যুগোশ্লাভিয়ার সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী এক যোগে যুগোশ্লাভিয়ার অর্ন্তগত কোসোভো প্রদেশে ঢুকে সেখানকার আলবেণীয় মূলের লোকেদের উপর জঘন্য অত্যাচার উৎপীড়ন চালাচ্ছে। তাদের কোসোভো ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য করছে। ন্যাটোর কর্তাদের মতে তাই বিমান আক্রমণের দ্বারা যুগোশ্লাভ সেনা বাহিনীর ঘাঁটিগুলোকে দুর্বল করে দেওয়া দরকার। অনেকের মতে বিমান আক্রমণের সাথে সাথে স্থলবাহিনীর দ্বারা আক্রমণ চালানোও উচিত ছিল, তবে তা করা যাচ্ছে না কারণ ন্যাটোর হাতে অত সৈন্য নেই। ন্যাটোর মাত্র ১২,০০০ সৈন্য বর্তমানে ম্যাসিডোনিয়ায় মজুত আছে, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া কোসোভোয় মোতায়েন করেছে ৪০ থেকে ৫০ হাজার সৈন্য। তাই বিজয় সুনিশ্চিত করতে হলে ন্যাটোকো সেখানে ১ লক্ষ কি ১ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য পাঠানো উচিত, যা বর্তমানে অসম্ভব।

ন্যাটোর কর্তাব্যক্তিরা, প্রধানত মার্কিন রষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন, ভেবেছিল যে, বিমান আক্রমণ শুরু হলেই যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি শ্রী স্লোবোদান মিলোসেভিচ ভয় পেয়ে তার আক্রমণাত্মক কাজকর্ম বন্ধ করে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য বাজি হবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। প্রথমত, বিমান আক্রমণের দোহাই দিয়ে সার্ব সেনারা আলবেনীয় মূলের লোকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা তীব্র করল। ফলে লক্ষ লক্ষ লোক কোসোভো ছেড়ে পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া,

ম্যাসিডোনিয়া ও মন্টিনিগ্রোতে পালাতে শুরু করল। দ্বিতীয়ত, যুগোশ্লাভিয়ার সমস্ত মানুষ (স্লাভ ও সার্বরা) দেশপ্রেমের দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে একত্রে শত্রুর মোকাবিলায় বদ্ধ পরিকর হল। এই খানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আলবেণীয় মূলের যে সব লোকেরা কোসোভোয় বসবাস করছে, ধর্মের দিক দিয়ে তারা সকলেই মুসলমান। কোসোভোর আয়তন খুবই ছোট, শ্রীলঙ্কার প্রায় অর্ধেক এবং সেখানকার ১৮ লক্ষ জনসংখ্যার ৯০ শতাংশেরই বেশী লোক আলবেনীয় মুসলমান। মুষ্টিমেয় বাদবাকীরা সার্ব ও অর্থোডক্স খ্রীষ্টান।

মুসলমানদের উপর অত্যাচার

বিশেষজ্ঞদের মতে সার্বিয়ার পুলিশ সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে সমস্ত আলবেনীয় মুসলমানকেই কোসোভো থেকে তাড়িয়ে দিত কিংবা মেরে ফেলত। কিন্তু ন্যাটোর বোমাবর্ষণ এই কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। বোমা বর্ষণ শুরু করার চার দিনের মধ্যেই বেশ কয়েক হাজার আলবেনীয় মুসলমানকে হত্যা করা হয় এবং প্রায় ৫ লক্ষ মুসলমান সব কিছুকে হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মুসলমান সীমা পেরিয়ে আলবেনিয়ায় প্রবেশ করে। উগ্রবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম সংগঠন "কোসোভো লিবারেশন আর্মি"-এর সন্ত্রাসবাদী নেতারা এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান প্রাণ ভয়ে পার্বত্য অঞ্চল পাগারুসা উপত্যকায় আশ্রয় নেয় এবং সার্বিয়ার ট্যাঙ্ক ও পদাদিক বাহিনী সেখানে তাদের আক্রমণ করে।

কোসোভোর রাজধানীর নাম প্রিষ্টিনা এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের নাম পেক (Pec)। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সার্বিয়ার আধাসামরিক বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। পেক-এর জনসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। আধাসামরিক বাহিনীর লোকেরা প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে সবাইকে মালপত্র গোছ গোছ করে নিতে বলে এবং শহরের কেন্দ্র কোজা (Koza) নামক স্থানে সমবেত হতে বলে। তার পর প্রায় ১৫ হাজার লোককে একটা খেলার স্টেডিয়ামে আটকে রাখা হয়। সারারাত সেখানে আটকে রাখার পর সকালবেলা তাদের বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক একইভাবে জাকোভিচা (Djakovica) শহরকেও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার, ৬ এপ্রিলের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার আলবেনীয় মুসলমান সীমান্ত পার করে মন্টেনিগ্রোতে পালিয়ে যায় এবং আরও হাজার হাজার মানুষ সীমান্তে অপেক্ষা করতে থাকে। সব থেকে বেশী সংখ্যক লোক আলবেনিয়াতে চলে যাবার চেষ্টা করে। বোমা বর্ষণ শুরু হবার এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েক লক্ষ লোক প্রাণভয়ে সেখানে পালিয়ে যায়। সংযুক্ত জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্ট অনুসারে ২ থেকে ৩ লক্ষ লোক ইতিমধ্যে সীমান্ত পেরিয়ে আলবেনিয়ায় ঢুকে গেছে এবং আরও কয়েক লক্ষ পার্বত্য পথে পায়ে হেঁটে কিংবা ট্রাকটরে করে সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটা সমীক্ষা বলছে যে প্রতিদিন প্রায়

৪,০০০ মানুষ আলবেনিয়ার সীমন্তে জড়ো হচ্ছে। এই সব উদ্বাস্তুদের মুখ থেকে আরও অনেক খবর জানা যায়। রাত্রিতে কামান দেগে সবার ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় এবং সকালে সৈন্যরা এসে তাদের হত্যা করতে থাকে। বলতে থাকে, "হয় এখান থেকে পালাও নয়তো মর। এটা তোমাদের নয়। তোমাদের দেশ আলবেনিয়া।" শোনা যায় প্রিজরেন (Prizren) শহর থেকে সার্ব সেনারা কয়েক হাজার লোককে সৈন্যদের মত মার্চ করিয়ে আলবেনিয়ার সীমান্তে নিয়ে আসে। ন্যাটোর এক কর্তাব্যক্তি জেমি শী (Jamie Shea)'র মতে, "১৯৭০-এর দশকে কাম্বোডিয়ার "খেমের রোজ" এর পরে এই আকারের হত্যা ও আতঙ্ক আর কোথাও দেখা যায় নি।"

রাজধানী প্রিষ্টিনাতে সেনারা হাজার হাজার আলবেনীয় মুসলমানকে ম্যাসিডোনিয়া গামী ট্রেনে তুলে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। সেনারা তাদের বলতে থাকে "তোদের জমি জায়গা এখন থেকে আমাদের হবে। তোরা পালা, না হলে সবাইকে কচুকাটা করব।" পর্যবেক্ষকদের মতে ১৮ লক্ষ কোসোভোবাসী মুসলমানদের সাফ করার কাজটা অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে অতি দ্রুত সেরে ফেলা হয় এবং প্রতিদিন প্রায় ২০ হাজার করে শরণার্থী প্রাণভয়ে পালাতে থাকে।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী ক্রমশ আবছা হয়ে আসা সেই সমস্ত ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যখন ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরে কোটি কোটি হিন্দুকে মুসলমানরা কচুকাটা করতে থাকে। হিন্দু রমণীর উপর তারা বলাৎকার করে, জোর করে ধয়ে নিয়ে যায়। বৃদ্ধ ও শিশুরাও রেহাই পায় না। কোটি কোটি হিন্দু সর্বস্বান্ত হয়ে ভারতে এসে উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে পশুর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। মনে করিয়ে দেয় সেসব কথা যখন কাশ্মীরের মুসলমানেরা হিন্দুদের কচুকাটা করতে থাকে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে কাশ্মীর থেকে তাড়ানো হয়। সেই সব হতভাগ্য উদ্বাস্তুরা জম্মুর উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে আজও পশুর জীবনযাপন করে চলেছে, আজও মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা হাজার হাজার নিরস্ত্র নিরীহ হিন্দু কে সেখানে হত্যো করে চলেছে। আজও কাশ্মীরের হিন্দুরা মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত হয়ে চলেছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন সার্বরা আলবেনীয় মূলের মুসলমানদের উপর এরকম নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে? কেন তাদের হত্যা করছে এবং কোসোভো থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে? তবে কি মুসলমানরাও এক কালে সার্বদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল? আজকের এই অত্যাচার কি তারই প্রতিশোধ? অথবা এটা কি মুসলমানদের দেশদ্রোহীতার শাস্তি? দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র করার শাস্তি? মুসলমানদের প্রতি সার্বদের চরম ঘৃণা না থাকলে তাদের পক্ষে পাইকারী দরে মুসলমান হত্যা করা সম্ভব হত না। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে, আলবেনীয় মূলের ওই সব মুসলমানদের প্রতি সার্বদের মনে এই চরম ঘৃণা জন্ম নিল কেন?

এই সব প্রশ্নের জবাব পেতে গেলে বর্তমান কোসোভো প্রদেশের ইতিহাস কিছুটা আলোচনা করা আবশ্যক।

মধ্যযুগে কোসোভো প্রদেশ সার্ব—সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখানকার অধিবাসীরা সকলেই ছিল সার্বজাতির লোক। উপরন্তু এই কোসোভো প্রদেশ ছিল সার্বজাতির কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। জেরুজালেম যেমন ইহুদীদের কাছে পবিত্র, তেমনি কোসোভোও সার্বদের কাছে পবিত্র। এর পর ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কী নামে পরিচিত তুরস্কের মুসলমানরা প্রথম মুরাদ'-এর নেতৃত্বে বলকান অঞ্চল আক্রমণ করে এবং গ্রীস ও আলবেনীয়া দখল করে নেয়। এই সময় আলবেনিয়ার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

পরে মুরাদ যখন সার্বিয়া আক্রমণ করে তখন আলবেনিয়ার সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তুর্কী সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেয়। ঐতিহাসিকদের মতে আলবেনিয়ার মুসলমানদের সাহায্য না পেলে তুর্কী বাহিনীর পক্ষে সার্বিয়া জয় করা অত সহজ কাজ হত না। সেই যুদ্ধে চরম জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়, আলবেনিয়ার মুসলমানদের সাহায্যেই তুর্কীরা সেই যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। যুদ্ধে বিজয় লাভ করে তুর্কীরা হাজার হাজার যুদ্ধ বন্দী সার্বকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এবং লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসামরিক জনগণকে হত্যা করে সার্বিয়ার মাটি রক্তে লাল করে ফেলে। তুর্কীদের সঙ্গে আলবেনিয়ার মুসলমানরাও এই সব গণহত্যায় যোগ দেয় এবং অসংখ্য সার্বকে হত্যা করে। এইভাবে চরম নিষ্ঠুরতা ও বীভৎস হত্যার মধ্য দিয়ে কোসোভো, অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এরপর প্রায় ৫০০ বছর ধরে কোসোভোয় তুর্কী শাসন চলে। এই সময়ে মুসলমানরা কোসোভো থেকে সার্বদের ক্রমাগত উৎখাত করতে থাকে এবং আলবেনিয়ার মুসলমানরা এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে থাকে। এই কাজে আলবেনীয় মুসলমানরা ইসলাম দ্বারা অনুমোদিত সকল পথই অনুসরণ করে যেমন, হত্যা, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, নারীজাতিকে অপহরণ করা, তাদের উপর বলাৎকার অন্যান্য অত্যাচার চালানো ইত্যাদি। আল্লার নির্দেশ অনুসারেই তারা বিধর্মী কাফেরদের উপর এই সব অত্যাচার করে তাই এতে তাদের কোনও পাপ বোধও থাকে না। এইভাবে ধীরে ধীরে কোসোভোর জন-চিত্রটা (demography)-ই সম্পূর্ণ পালটে গেল। জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের বেশী হয়ে গেল আলবেনিয় মুসলমান এবং মুষ্টিমেয় কিছু সার্বই সেখানে টিঁকে থাকতে পারল, তাও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধের সময় সার্বিয়া আবার কোসোভো দখল করে। ইতালী ও বলকান রাষ্ট্রগুলির মিলিত বাহিনীর ও তুর্কীবাহিনীর মধ্যে এই যুদ্ধ হয় এবং মুস্তাফা কামাল তুর্কীবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। যাই হোক, সার্ব সেনা যখন কোসোভোয় প্রবেশ করে তখন সেখানকার অবশিষ্ট সার্বদের কাছে তারা হল পরিত্রাতা। কিন্তু আলবেনীয় মুসলমানরা একে তাদের পরাজয় এবং পরাধীনতা বলেই গণ্য করল। এরপর ১৯১৮ সালে যখন সংযুক্ত

যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হল তখন কোসোভোকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা হল এবং ১৯৪৪ সালে যখন যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিষ্ট শাসন চালু হল তখনও কোসোভো সংযুক্ত যুগোশ্লাভিয়ার একটি প্রদেশ হিসাবে গণ্য হল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কোসোভোকে যুগোশ্লাভিয়ার একটি অংশ হিসাবেই মেনে নেওয়া হল।

কিন্তু উপরিউক্ত ব্যবস্থাদি কোসোভোর আলবেনীয় মুসলমানদের খুশি করতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে কোসোভো তাদের আদিভূমি নয় এবং সেখানে তারা দখলদার মাত্র। এই কারণে কোসোভোর মূল অধিবাসী সার্বদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ অনেক। তাদের ভাষাও সার্বদের থেকে আলাদা। এই সব কারণের সঙ্গে যুক্ত হল স্বভাবজাত মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব। তাই অনতিবিলম্বেই তারা আওয়াজ তুলতে শুরু করল যে, যুগোশ্লাভিয়ার অধীনে তারা থাকতে রাজী নয়। কোসোভোকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। উপরন্তু তারা এই অভিযোগ করতে শুরু করল যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোসোভোকে যুগোশ্লাভিয়ার অংশ হিসাবে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের (অর্থাৎ আলবেনীয় মূলের মুসলমানদের) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে।

এটাই হল অত্যন্ত বিপজ্জনক মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী কায়দা। যেই মুসলমানরা এক সাথে আলবেনীয় থেকে গিয়ে, অত্যাচার, হত্যা, উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে সেখানকার সার্বদের তাড়িয়ে কোসোভো অন্যায়ভাবে দখল করেছে, আজ সেই দলখদাররাই দাবী তুলছে যে, কোসোভো তাদের, কোসোভোর উপর সার্বদের কোনও অধিকার নেই। কোসোভোকে যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে। ঠিক যেন একটি চোর চুরির মালসুদ্ধ ধরা পড়ার পরেও চিৎকার করে বলছে, "চুরির মাল আমার, চুরির মাল আমার।" এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা ও সাবধান হওয়া একান্ত জরুরী। আজ পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের মদতে কাতারে কাতারে বাংলাদেশী মুসলমান ভারতে ঢুকছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। যখনই কোন জেলাতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে সেই মুহূর্তেই তারা কোসোভোর মুসলমানদের মতই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করবে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে এবং এই উদ্দেশ্যকে সাকার করার লক্ষ্যে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নানারকম অত্যাচার শুরু করে দেবে। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই কারণ দুনিয়ার সকল মুসলমানের একই চরিত্র, একই কোরান ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

যাই হোক, কোসোভোর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা অচিরেই তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম শুরু করে। যুগোশ্লাভ সরকার ও তার সার্বভৌমত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও আনুগত্য না থাকার ফলে তারা সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করতে থাকল এবং নানা রকম দেশদ্রোহী ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করতে থাকল, তবে তারা পূর্ণ

স্বাধীনতা ডাক না দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বশাসন (Autonomy) এর উপরই বেশী করে জোর দিতে থাকল। কারণ তারা খুব ভাল করেই বুঝতে পারল যে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার সার্থক করতে গেলে তার প্রথম পদক্ষেপই হল স্বশাসন।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে উপরিউক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বশাসনের দাবী নিয়ে তারা বহুবার বিদ্রোহ করে এবং সরকারকে সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সেই সব বিদ্রোহ দমন করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় তাদের দেশদ্রোহী কাজকর্ম আগেকার সকল নজিরকে অতিক্রম করে। ওই সময় যুগোশ্লাভিয়া যখন মিত্র শক্তির পক্ষে হয়ে ইতালী ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তখন কোসোভোর দেশদ্রোহী মুসলমানরা নাৎসীদের সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। নাৎসীদের কাছে তারা অনুরোধ জানায় যে তারা যেন কোসোভোকে যুগোশ্লাভিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে। এরপর মুসোলিনির বাহিনী যখন বলকান অঞ্চল দখল করে তখন তারা পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত কোসোভোকে আলবেনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে বৃহৎ আলবেনিয়া তৈরি করে। সেই সময় কোসোভোর মুসলমানরা সার্বদের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করে এবং কোসোভো থেকে তাদের বিতাড়িত করতে থাকে। এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সরকার কোসোভোর সার্বদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বহু সার্ব পরিবারকে কোসোভোয় বসিয়ে দেয়। এই সময় মুসলমানরযা নতুন এইসব সার্ব আগন্তুক পরিবারকে তাড়িয়ে দিয়ে কোসোভোর পূর্বেকার জন-চিত্র ফিরিয়ে আনতে থাকে। আগেকার সমস্ত নজিরকে ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধে মিত্র পক্ষের জয় হওয়াতে তাদের কিছুটা আশাভঙ্গ হলেও সার্ব বিতাড়নের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধ শেষ হবার পরেও হত্যা, আক্রমণ, লুণ্ঠন ইত্যাদি সমানভাবে চলতে থাকে এবং এই কারণে কোসোভোয় তখন সামরিক আইন জারি করা হয়।

এরপর ১৯৪৭ সাল যুগোশ্লাভিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটো সংবিধান সংশোধন করে কোসোভোকে স্বশাসন প্রদান করে। এর ফলে কোসোভো নামে মাত্র সার্বিয়া প্রদেশের অংশ হয়ে থাকল এবং কার্যক্ষেত্রে নিজস্ব পুলিশ, প্রশাসন ও পৃথক পার্লামেন্ট গঠন করার অধিকার পেয়ে কোসোভো প্রায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রেই পরিণত হল। এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হল পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মার্শাল টিটো, দুজনেই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবার জন্য লালায়িত ছিলেন এবং এই কারণে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের মহান ও উদার বিশ্বনেতা হিসাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। বিশ্বশান্তির দূত হিসাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। নিজেকে শান্তির দূত হিসাবে তুলে ধরতে গিয়েই নেহরু আজাদ কাশ্মীরে পাকিস্তান সেনার অবস্থান মেনে নিয়ে এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে অস্বীকার করে ১৯৪৮ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে অপমানজনক সন্ধি প্রস্তাব তৈরি করে তাকে মেনে নেন। তখন বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শমত পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করে দিলে কাশ্মীর সমস্যা সেখানেই শেষ হয়ে যেত।

কাশ্মীরের মুসলমানদের তোয়াজ করার জন্য সংবিধানের বিশেষ ধারা ৩৭০ প্রয়োগ করে তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নেহরু যে মহা ভুল করেছিলেন, তার সুহৃদ মার্শাল টিটো কোসোভোকে স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দিয়ে সেই রকমই এক মহা ভুল করলেন। তখনকার দিনে নেহরু ও টিটো, দুজনেই মহাপ্রতাপশালী একচ্ছত্র সম্রাট বিশেষ। তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করতেন। সেই সময় নেহরুর এই সব অযৌক্তিক কাজকর্মের সমালোচনা করার জন্য ভারতীয় সংসদে শ্যামাপ্রসাদ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি ছিল না। তবে সুখের কথা হল এই যে, যুগোশ্লাভিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি শ্রী শ্লোবোদান মিলোসোভিচ একজন বাস্তববাদী মানুষ। তাই কোন রকম ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে মুসলমানদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী পথই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং ন্যাটোর বোমাবর্ষণ তাঁকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করাবে বলে মনে হয় না।

মুসলমানদের অনমনীয় মনোভাব

কোসোভোকে স্বশাসনের ক্ষমতা দিয়ে মার্শাল টিটো সেখানকার মুসলমানদের যে আস্কারা দিলেন তার ফল হল অত্যন্ত মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। ১৯৮০ সালের টিটোর মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ অসম্ভব মাত্রায় বৃদ্ধি পেল এবং ছাত্ররা পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিল। কিছু কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী সংস্থা যুগোশ্লাভ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ছক কষতে শুরু করেছিল। এই সমস্ত চক্রান্তের সাথে সাথে তারা সার্বদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়ে দিল। লক্ষ্য হল পুরানো জনচিত্র, ৯০ শতাংশের বেশী আলবেনীয় মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনা।

কিন্তু ১৯৮৭ সালে মিলোসোভিচ রাষ্ট্রপতি হয়ে কোসোভোর মুসলমানদের শক্ত হাতে দমন করার নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি মার্শাল টিটো দ্বারা প্রদত্ত স্বায়ত্বশাসনের অধিকার রদ করলেন এবং কোসোভোকে সরাসরি বেলগ্রেড থেকে নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নিয়ে এলেন। এর ফল হল অভাবনীয়। কোসোভোর মুসলমানরা আলবেনিয়া ম্যাসিডোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়ার সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হল এবং তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ওই সব অঞ্চলের মুসলমানদের সহানুভূতি ও সক্রিয় সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল। এর পর ১৯৯১ সালে কমিউনিজমের পতনের পর এই সব অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ আরও বৃদ্ধি পেল এবং কোসোভোর মুসলমানরা ইব্রাহীম রুগোভা নামক এক ধর্মান্ধ ব্যক্তির নেতৃত্বে "ডেমোক্রেটিক লীগ অফ কোসোভো" নামে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করল।

ইব্রাহীমের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল কোসোভোর স্বশাসন ফিরিয়ে আনা। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক ডামাডোলের বাজারে রাতারাতি ফায়দা তোলার জন্য সে কোসোভোকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করে বসল। কিন্তু শক্ত মানুষ মিলোসোভিচের ভয়ে সে আরও এক পা এগিয়ে সশস্ত্র উত্থানের ডাক দিতে ক্ষান্ত থাকল। ১৯৯২ সালে জারি করা ইব্রাহীমের

এক বয়ান বলেছে, "*বর্তমানে সার্বিয়ার সেনা বাহিনীকে প্রতিরোধ করা বা তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার মত শক্তি আমাদের নেই। প্রকৃতপক্ষে সার্বরা একটা ছুতোর অপেক্ষায় বসে আছে এবং তা পেলেই তারা আমাদের ঝাড়েমূলে বিনাশ করবে। এরকম একটা অবস্থায় সবংশে নিধন হওয়ার চাইতে কিছু না করে প্রাণে বেঁচে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।*"

উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, একমাত্র সার্বিয়ার সেনাবাহিনীর ভয়েই ইব্রাহীম সহিংস পথে যেতে দ্বিধা করেছে এবং শান্তিপূর্ণ পথে থেকে স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে জোরদার করাকেই যুক্তিযুক্ত বলে স্থির করেছে। কিন্তু এই প্রকাশ্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পিছনে কি মুসলিম চক্রান্ত কাজ করেছে? ইব্রাহীমের অঙ্কে এটা ধরা পড়েছিল যে, অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে যে হারে কোসোভো থেকে সার্ব বিতাড়ন চলছে, এ ভাবে চলতে থাকলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই কোসোভোয় আর একজন সার্ব থাকবে না। সেই অবস্থায় স্বাধীনতা আপনা আপনি হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কাজেই ইব্রাহীম সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী সেই সব গোষ্ঠীগুলো মিলে ১৯৯৩ সালে "কোসোভো লিবারেশন পার্টি" (KLA) গঠন করল।

ইতিমধ্যে ১৯৯৫ সালে কোসোভোর মুসলমানরা আর একটা বড় ধাক্কা খেল। "ডেটন শান্তি সম্মেলন" (Dayton Peace Conference) আলোচনার মাধ্যমে বসনিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটালো ঠিকই, কিন্তু কোসোভোর স্বাধীনতার ব্যাপারে সেখানে কোনও আলোচনাই হল না। অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল যখন ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো নতুন যুগোশ্লাভিয়াকে স্বীকৃতি দিল; যার ফলে কোসোভোকে সার্বিয়ার একটি প্রদেশ হিসাবে মেনে নেওয়া হল। কোসোভোর মুসলমানরা একে ইব্রাহীমের শান্তিপূর্ণ নীতির ব্যর্থতা বলে মনে করল। বেশীর ভাগ মুসলমানই কে এল এর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হওয়াকেই সঠিক বলে বিবেচনা করল এবং কে এল এর পতাকাতলে সমবেত হলো। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল একটাই, সার্বিয়ার বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদের অভাব। এই সময় জার্মানী ও অন্যান্য দেশে বসবাসকারী কোসোভোর মুসলমানরা চাঁদা তুলে টাকা পয়সা পাঠাতে থাকল। ইতিমধ্যে ১৯৯৭ সালে আলবেনীয়া তার সেনাবাহিনী ভেঙে দিলে অস্ত্র পাওয়া খুব সহজ হয়ে গেল এবং বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের সাহায্যে কে এল এ বহু অস্ত্রশস্ত্র কিনে গোপনে কোসোভোয় এনে মজুত করল।

কিন্তু এসব বেশীদিন গোপন থাকল না। সার্বিয়ার গুপ্তচর বাহিনীর মাধ্যমে সার্বিয়ার পুলিশ মুসলমানদের গতিবিধির সমস্ত সংবাদই যথাসময়ে পেয়ে গেল। এই সব খবরের উপর ভিত্তি করে কোসোভোর পুলিশ ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কে এল এর এক গুপ্ত ঘাঁটিতে হানা দিয়ে বেশ কয়েকজন গেরিলাকে হতাহত করল। এই ঘটনায় সমস্ত কোসোভোতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। কে এল এর নেতাদের নির্দেশে কোসোভোর মুসলমানরা

অস্ত্রহাতে সার্বপুলিশকে মোকাবিলা করতে একত্র হয়। সার্বরা প্রথমে ইচ্ছে করেই পিছু হঠতে থাকল যাতে করে কে এল এর নেতাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে তারা জিতছে। অবস্থা একটু থিতিয়ে এলে গ্রীষ্মের সময় সার্বিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই আক্রমণের সামনে দাঁড়ানো মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হল না। তারা ত্রাঁহি ত্রাঁহি রবে কোসোভো ছেড়ে পালাতে শুরু করল। আক্রমণের প্রথম ঝটকাতেই আড়াই লক্ষ মুসলমান কোসোভো থেকে পালাল এবং কে এল এর সেনাপতিরা প্রাণ বাঁচাতে পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নিল।

ন্যাটোর আগমন

ঠিক এই সময়ে ন্যাটোর কর্তাদের অথবা তাদের নাম করে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের মনে মানবিকতা চাড়া দিয়ে উঠল। কোসোভোর মুসলমানদের দুঃখে তার হৃদয় বিদীর্ণ হল এবং স্থির করল যে, সার্ববাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত। তাই ন্যাটোর পক্ষ থেকে সার্বদের সাবধান করা হল যে, আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, নয়তো বোমাবর্ষণ শুরু করা হবে। ডেটন শান্তি চুক্তির সময় আমেরিকার পক্ষে নেতৃত্ব করেছিল রিচার্ড হোলব্রুক। সেই হোলব্রুক সাহেব মাঠে নেমে পড়ল এবং মিলোসোভিচকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ার শুরু করার জন্য তাকে রাজী করানো হল এবং প্যারিসের উপকণ্ঠে Rambonuillet নামক জায়গায় শান্তি আলোচনা হবে। প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হল যে, মিলোসোভিচ কোসোভোর কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে তার বাহিনী তুলে নেবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যেই মাত্র সার্বিয়া সেই সব অঞ্চল থেকে সেনা সরিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে কে এল এ সেখানে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করল।

এদিকে শান্তি আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব তৈরি হল তাতে লেখা হল যে, কোসোভোকে তার স্বশাসন ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তবে তাকে সার্বিয়ার একটি প্রদেশ হিসাবেই থাকতে হবে এবং সংখ্যালঘু সার্বদের সুরক্ষার গ্যারান্টী দিতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলমানদের কাছে কোসোভোর পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য না হবার ফলে তারা ঐ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করল। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছিল যে, শান্তি প্রক্রিয়া ঠিক মত কার্যকর হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ন্যাটো তার ৩০ হাজার সেনা কোসোভোয় মোতায়েন রাখবে। কিন্তু অনমনীয় মুসলমানরা তাতে স্বাক্ষর না করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টাই বিফলে গেল। অনেকেই মনে করেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়াও মুসলমানরা একজন সার্বকেও কোসোভোয় স্থান দিতে রাজী নয়, এবং এই কারণেই তারা শান্তি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। তারপর যা ঘটল তা আগেই বলা হয়েছে। সার্বরা তাদের আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটোও বোমাবর্ষণ শুরু করল এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রাণভয়ে পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া, ম্যাসিডোনিয়া ও মন্টিনিগ্রোতে পালাতে শুরু করল।

মুসলমানদের নারকীয় অত্যাচার

এই বছর গত এপ্রিল মাসে বিশ্ববিখ্যাত টাইম (TIME) সাপ্তাহিক প্রত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখক শ্রী ল্যান্স মোরো সাহেব যুগোশ্লাভ সরকারের আমন্ত্রণে বেলগ্রেড যান। সেখানে থাকাকালীন পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে কতকগুলো ফটো দেখায়। ফটোগুলোতে দেখা যায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা মানুষের দেহ। কোন মৃতদেহ আধপোড়া করে পোড়ানো হয়েছে, কোনটার হাত পা ও মাথা আলাদা করে কেটে ফেলা হয়েছে। কোন দেহের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, মাথা থেঁৎলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের লোকেরা শ্রী মোরো সাহেবকে বলেন যে, ফটোগুলোতে যাদের শবদেহ দেখানো হয়েছে তারা সবাই কোসোভোর সংখ্যালঘু সার্ব। অতি সম্প্রতি কে এল এর গেরিলারা এই সব অত্যাচার করেছে।

শ্রীমোরো সাহেবকে তারা আরও বলেন যে, ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী বাহিনীর সঙ্গে সার্বদের যে যুদ্ধ হয় হয় সেই যুদ্ধে সদ্য ধর্মান্তরিত আলবেনীয়রা তুর্কী বাহিনীকে যোগ দিয়ে সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে সার্বদের পরাজয় হবার পর হাজার হাজার সার্ব যুদ্ধ বন্দীকে পাইকারী দরে হত্যা করা হয় এবং আলবেনীয় মুসলমানরাও সেই হত্যাকাণ্ডে হাত লাগায়। সেই যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার পর কবর না দিয়ে মাঠে ফেলে রাখা হয়। শকুন, শিয়াল, কুকুরে তা খেয়ে সাফ করে।

এর পরে মোরো সাহেবকে তারা একটা মিউজিয়ামে নিয়ে যায় সেখানে কাঁচের বাক্সে রাখা একটা ছোট্ট যন্ত্র তাঁকে দেখানো হয়। একটা যন্ত্র দেখতে অনেকটা ⊂ এই রকমের। তবে মাথা দুটো ছুঁচলো ও ধারালো। শ্রীমোরো ওই অস্ত্রটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে তাঁকে বলা হয় যে মুসলমানরা সার্বদের দুটো চোখই এক সঙ্গে উপড়ে ফেলতে ওই ছোটখাট অস্ত্রটি ব্যবহার করত। তারা তাঁকে আরও বলে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কোসোভো ইতালীর দখলে চলে যায় তখন মুসলমানরা কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু সার্বকে কচুকাটা করে। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে সেই সব ঘটনা চাপা পড়ে যায়। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ১৩৮৯ সাল থেকে শুরু করে বিগত ৬০০ বছর ধরে আলবেনীয় মুসলমানরা সার্বদের উপর সে সব নৃশংস অত্যাচার ও জুলুম চালিয়েছে আজকের কোসোভোর ঘটনাবলী তারই প্রতিফল মাত্র। দখলদার আলবেনীয় মুসলমানরা কোসোভোর প্রকৃত অধিবাসীদের উৎখাত করে যে জমি জায়গা দখল করেছিল তা প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করেছে মাত্র।

হিন্দুর শিক্ষণীয়

উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে হিন্দুর সর্বপ্রথম যা শিক্ষণীয় তা হল পৃথিবীর সকল মুসলমানের চরিত্রই এক, কারণ সমষ্টিগতভাবে তারা একই ইসলামী তত্ত্ব, কোরান ও হাদিস দ্বারা পরিচালিত। তাই আজ যা কোসোভোয় ঘটেছে, কাল যে তা মুর্শিদাবাদ বা

মালদা, বা দিনাজপুরে ঘটবে না, তার জোর দিয়ে বলা যায় না। কাতারে কাতারে বাংলাদেশী মুসলমান আজ পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ঢুকে পড়ছে। এর যে কোন একটি জেলায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করে দেবে, বিতাড়িত করতে শুরু করবে এবং তাদের জমি জায়গা, বাড়ি ঘর দখল করতে শুরু করে দেবে। নবীর জীবিত কালে মদিনায় নাজির, কানুইকা ও কুরাইজা গোষ্ঠীর ইহুদীরা বসবাস করত। নবী মহম্মদ অত্যাচার উৎপীড়নের দ্বারা নাজির ও কানুইকাদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করে তাদের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। এর পর ৮০০ কুরাইজা পুরুষকে হত্যা ও তাদের নারী শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বেচে দিয়ে তাদের স্ববংশে উৎখাত করেন এবং জমি জায়গা সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কাজেই দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান যে এহেন নবীকেই অনুকরণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

এর পর কোসোভোর মুসলমানদের মত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বায়ত্বশাসন দাবী করবে এবং সবশেষ ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা দাবী তুলবে। এটা অবশ্যম্ভাবী এবং এটা ঘটবেই এবং এই কাজে তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই'র সাহায্য নেবে। শান্তিপূর্ণভাবে দাবী আদায় না হলে নানারকম দেশদ্রোহী ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম শুরু করবে এবং সহিংস বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথ গ্রহণ করবে। আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এইভাবে তারা ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আলাদা করে নিয়েছে।

হিন্দুর দ্বিতীয় শিক্ষণীয় হোল ন্যাটো তথা আমেরিকার ভূমিকা। কোসোভোর ব্যাপারে আমেরিকার কার্যকলাপ এক ভয়ঙ্কর নজির সৃষ্টি করে চলেছে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অনুসারে কোসোভো যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত সার্বিয়ার একটা প্রদেশ মাত্র। সেখানে কোন রকম সহিংস বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ দেখা দিলে যুগোশ্লাভিয়ার অধিকার আছে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনার, সহিংস কার্যকলাপকে স্তব্ধ করার। এটা নিতান্তই যুগোশ্লাভিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সেই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়ে ন্যাটো তথা আমেরিকা যুগোশ্লাভিয়ার সার্বভৌমত্বকে পদদলিত করেছে। এই নজির অত্যন্ত বিপদজনক। যাটের দশকে রাশিয়া পোল্যান্ডে ট্যাঙ্ক নামিয়েছিল বলে তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে রাশিয়ার নিন্দা করা হয়েছিল এবং পোল্যান্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে আমেরিকা রাশিয়ার কড়া সমালোচনা করেছিল। আজ আমেরিকা তার থেকেও জঘন্য অপরাধ যুগোশ্লাভিয়ার উপর করে চলেছে।

আমাদের পক্ষে এই নজির অত্যন্ত বিপদজনক এই কারণে যে, আজ কেরালার বা বাংলার বা অন্ধ্রের মুসলমানরা যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ শুরু করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী তা দমন করতে অগ্রসর হয় তবে মুসলমানদের উপর অত্যাচারের দোহাই দিয়ে, ভারতের সার্বভৌমত্বকে উল্লঙ্ঘন করে আমেরিকা ভারতের উপর বোমাবর্ষণ করে

দিতে পারে। এই কারণে ভারতের হিন্দুদের একান্ত কর্তব্য হল কোসোভোর ব্যাপারে ন্যাটোর ভূমিকাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা এবং অবিলম্বে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য ন্যাটোর উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করা।

আর একটি কথা বলে এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করবো। কোসোভোর মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে আমেরিকা চোখের জল ফেলছে, কিন্তু এই মুসলমানরাই যে অতীতে, এমন কি ৫০ বছর আগেও সার্বদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে, সেই ব্যাপারে সে নীরব কেন? প্রকৃত ঘটনা হোল, ইসলাম যে কি বস্তু সে ব্যাপারে আমেরিকার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তবে মনে হয় সেদিনের আর বেশী বাকী নেই। আমেরিকার নিগ্রোরা যে হারে মুসলমান হচ্ছে, মুসলমান নিগ্রো নেতা ফারাক খান যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে তাতে খুব শীঘ্রই যে খোদ আমেরিকার মাটিতেই মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ শুরু হয়ে যাবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমেরিকার কানে জল যাবে সেদিন, যেদিন সেখানকার মুসলমানরা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী তুলবে এবং আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হবার কথা বলবে।

রক্তপিপাসু ইসলাম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ

বিগত প্রায় এক বছর ধরে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে জঘন্য অত্যাচার চলছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, নির্বিশেষে ঠাণ্ডা মাথায় নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। ঘরে আগুন দিয়ে সেই আগুনের মধ্যে শিশুদের ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পরিবারের সবাইকে ঘরে বন্ধ করে সেই ঘরে আগুন দিয়ে সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে দেওয়া হচ্ছে। মাথাটা নারকোলের মত ফাটানো হচ্ছে। স্বামী ও ভাইদের সামনে মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে বলাৎকার করা হচ্ছে। মেয়েদের স্তন ও ছেলেদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফলা হচ্ছে। হাতুড়ী দিয়ে সারা গায়ে পেরেক ঢুকিয়ে মা বাবার সামনে শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। লোহা গরম করে মেয়েদের যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা সেখানে অ্যাসিড ঢালা হচ্ছে। আরও যে সব অত্যাচার হচ্ছে তা লেখা সম্ভব নয়।

এসব অত্যাচারের কাহিনী পড়লে প্রথমেই মনে হয়, কোন মানুষের মধ্যে সামান্যতম মনুষ্যত্ব, সামান্যতম মানবিকতা থাকলেও সে এইসব নৃশংস ও হিংস্র কাজ করতে পারে না। একমাত্র রক্ত-পিপাসু হিংস্র জানোয়ারদের পক্ষেই এসব কাজ সম্ভব। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে তারা তো একই দেশের মানুষ একই দেশ মায়ের সন্তান এবং একই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সেই মানুষগুলোকে এরকম হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করল কে?

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, তারা একই রকম দেখতে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই দেশের মানুষ হলেও তারা মুসলমান। এককালে তারাও হিন্দু ছিল। খুঁজলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ৫০ কিংবা ১০০ কিংবা ২০০ বছর আগে তাদের বাপ-ঠাকুরদারা কলমা পড়ে, ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন। আর এই ইসলামই তাদের ভিতর থেকে মনুষ্যত্বকে হরণ করে তাদের এক একটি হিংস্র জানায়ারে পরিণত করেছে। কারণ ইসলামের উদ্দেশ্যই হল, মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে তাকে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করা। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কি কারণে এবং কোন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ইসলাম প্রতিটি মুসলমানকে জানোয়ারে পরিণত করে?

হিন্দু ধর্ম বলে, সব মানুষই সমান। সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। তাই কাউকে ঘৃণা করতে নেই। কাউকে কষ্ট দিতে নেই। কিন্তু ইসলাম বলছে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা'

কলমা গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেছে, তারা হল মুসলমান বা মোমেন। আর যারা ওই কলমা গ্রহণ করেনি, যারা কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদকে বিশ্বাস করে না, তারা হল কাফের। আল্লা শুধু মুসলমানদেরই ভালবাসেন এবং কাফরদের তিনি চরমভাবে ঘৃণা করেন। শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন আল্লা সমস্ত কাফেরদের নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। পক্ষান্তরে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' কলমা গ্রহণ করার জন্য আল্লা মুসলমানদের পাহাড়প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেবেন। অত্যন্ত পাপসক্ত ও অধঃপতিত মুসলমানকেও আল্লা তার জান্নাতে বা স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

তাই কোরাণ বলছে—"**আল্লার দৃষ্টিতে কাফেররা হল অত্যন্ত ঘৃণিত জীব ও ঈশ্বরহীন পশু** (কোরাণ-৭/১৭৯)।"**এরা নিষ্ঠুরভাবে বধযোগ্য**" (ঐ-৩৯/৩০-৩২)।"**এদের যেখানে পাবে বন্দী করবে ও হত্যা করবে**" (৪/৮১-৯১)।" "**আল্লা এদের জন্য মর্মন্তু শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন**" (ঐ-৪/১৪৭-৪৮; ৮/১০-১৪)। "**কোরাণে অবিশ্বাস করার ফলে এরা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে**" (ঐ-৩/৮৫)।" **সেখানে আল্লা তাদের অনন্তকাল ধরে আগুন ঝলসাবেন এবং প্রত্যেকবার ঝলসাবার পর আল্লা আবার নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবেন। যাতে তারা অবিরাম শাস্তি ভোগ করতে পারে।**" (ঐ-৪/৫৬)

আল্লার দৃষ্টিতে কাফেররা এতই ঘৃণিত যে, কাফেরদের ও কাফের মহিলাদের ওপর যে কোন নারকীয় অত্যাচার করার অধিকার তিনি মুসলমানদের দিয়ে রেখেছেন। লুটপাট করে তাদের সহায়-সম্বল, ধন সম্পদ ও জায়গা-জমি আত্মসাৎ করার অধিকার তিনি মুসলমানদের দিয়ে রেখেছেন। কুমারী, সধবা, বিধবা, যে কোন রকমের কাফের রমণীর ওপর বলাৎকার করার অধিকারও আল্লা তাদের দিয়ে রেখেছেন। যে সব মুসলমান কাফেরদের ওপর অত্যাচার করবে, আল্লার দৃষ্টিতে তা হবে পুণ্যের কাজ। এই সব কাজের জন্য আল্লা তাদের চরমভাবে পুরস্কৃত করবেন। যে মুসলমান কাফের হত্যা করবে সে হবে 'গাজী'। আল্লার জান্নাতে এই গাজীরা হবেন বিশিষ্ট অতিথি। আল্লা তাদের সসম্মানে সর্বোচ্চ স্বর্গ বা জান্নাৎ-ই ফেরদৌসে নিয়ে যাবেন।

হিন্দু ধর্ম বলে—সত্য কথা বলবে, সত্য পথে চলবে, সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করবে এবং তবেই ভগবানের কৃপা, করুণা ও আশীর্বাদে পাবে। কিন্তু ইসলাম বলছে পথটাই আসল। ইসলাম কবুল করে মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করাই সঠিক পথ। আর সব পথই ভুল পথ। আল্লাই আসল ভগবান, অর সবই মেকি ভগবান। তাই ভুলপথে থেকে মেকি ভগবানের আরাধনা করে কোনই লাভ নেই। ভুল পথে থাকার ফলে কাফেরদের সমস্ত সৎ কাজ ও সৎ জীবন-যাপন নিষ্ফল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে, মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করে সঠিক পথে চলার জন্য আল্লা মুসলমানদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আদর করে তাদের জান্নাতে (স্বর্গে) নিয়ে যাবেন।

সেইখানে তারা দুধের নহর (খাল) থেকে দুধ, মধুর নহর থেকে মধু এবং মদের নহর থেকে যত ইচ্ছা মদ খাবে। আর খাবে সুস্বাদু স্বর্গীয় খাবার ও ফলমূল। সেখানে তারা যা খাবে তা সবই হজম হয়ে যাবে। তাই মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না।

সেই আল্লার জান্নাতে মুসলমানদের বয়স ৩২ বছরের বেশি বাড়বে না। তাই তারা চির যৌবন পাবে। সেখানে প্রত্যেক মুসলমান পাবে হাজার হাজার হুরী বা স্বর্গীয় রমণী। হরিণ-নয়না সেই সব সুন্দরীদের আল্লা আলোর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের গায়ের রং ডিমের খোলার মত। তাদের গা থেকে ছড়ায় মৃগনাভির গন্ধ। তারা যে সব কাপড় জামা পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে।

আল্লার সেই জান্নাতে প্রত্যেক মুসলমান পাবে একখানা করে মুক্তার প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে থাকবে ৭০টি চুনীর বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে থাকবে ৭০টি পোখরাজের মহল। প্রত্যেক মহলে থাকবে ৭০টি ঘর। প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০টি কার্পেটে ঢাকা ৭০টি আরাম কেদারা। এবং প্রত্যেক আরাম কেদারায় বসে থাকবে একজন করে হুরী। হিসাব করলে দেখা যাবে প্রত্যেক মুসলমান ৭০×৭০×৭০×৭০×৭০=১৬৮০৭০০০০০ বা ১৬৮ কোটি ৭ লক্ষ হুরী পাবে। আল্লা প্রত্যেক মুসলমানকে অসীম যৌনক্ষমতা দেবেন, যাতে সে প্রত্যেকটি হুরীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া করতে পারে। কোন হুরীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া শুরু কালে তা ৬০০ বছর স্থায়ী হবে। তা ছাড়া সমকাম বা পায়ুকাম করার জন্য প্রত্যেকটি মুসলমান পাবে ৮০,০০০ হাজার স্বর্গীয় কিশোর। এদের বয়স কখনও ১৬ বছরের বেশি বাড়বে না, তাই তারা চিরকিশোর থাকবে।

কাজেই মুসলমান সমাজ হচ্ছে এমন এক সমাজ, যেখানে শিশু বয়স থেকেই একজন মুসলমানকে শেখানো হচ্ছে যে, কাফেরদের ওপর অত্যাচার করা পুণ্যের কাজ। কাফের নারীদের বলাৎকার করা পুণ্যের কাজ। কাফেরদের ধন-সম্পত্তি ও জায়গা-জমি লুটপাট করা পুণ্যের কাজ। এবং কাফের হত্যা করা সর্বাপেক্ষা পুণ্যের কাজ। আর এই সব পুণ্যের কাজের পুরস্কার হিসাবে তাদের সামনে রাখা হচ্ছে ইহলোকে কাফেরদের থেকে লুট করে আনা ধন-সম্পত্তি বা গণিমতের মাল এবং পরলোকে জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ের যৌন স্বেচ্ছাচার।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, নিতান্ত শিশু বয়স থেকে কোন মানুষকে এই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললে তার ফল কি হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই ইসলামী শিক্ষাই ধীরে ধীরে একজন মানুষকে অত্যন্ত পাপাসক্ত এবং রক্তপিপাসু হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করে তোলে।

হিন্দু ধর্ম বলে, সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ সংসর্গ, পরোপকার ও ভগবানের আরাধনার মধ্য দিয়ে মনকে পবিত্র করতে হবে এবং আত্মার উন্নতি করতে হবে। হিন্দু বিশ্বাস করে যে, এটাই

ধর্মের লক্ষ্য এবং এভাবে সাধনার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরত্ব লাভ করে। পুনর্জন্ম-চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই মুক্তি বা মোক্ষলাভই হল হিন্দুর ধর্মাচরণের অন্তিম লক্ষ্য এবং চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি।

কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য কি? মানুষের আত্মার উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামের কোন মাথাব্যথা নেই। ইসলামের অন্তিম লক্ষ্য হল, পৃথিবীর সমস্ত কাফেরদের নির্বিচারে হত্যা করে, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সমস্ত পৃথিবীকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। সব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। এরই নাম হল 'জিহাদ'।

তাই কোরাণ বলছে,—"**হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লা ও তার রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লারপথে জিহাদ (যুদ্ধ) কর। ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আল্লা তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন। ইহাই মহাসাফল্য**" (কোরাণ—৬১/১১-১২)।" "**আল্লা তাঁর রসুলকে সুপথ ও সত্যধর্ম প্রেরণ করেছেন এবং তিনিই একে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন**" (ঐ-৬১/৯)। "**তোমরা জিহাদ করতে থাক। যতক্ষণ না আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়**" (ঐ-৮/৩৯)।

আমাদের দেশের এক ধরণের লোকেরা প্রচার করে চলেছেন যে, সব ধর্মই এক। সব ধর্মের মধ্য দিয়েই নাকি ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু যাকে ধর্ম বলে জানে, ইসলাম সে রকমের কোন ধর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হল এক জঘন্য আসুরিক তত্ত্ব। ইসলামের উদ্দেশ্য ভগবানকে পাওয়া নয়। ইসলামের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামের তথা আরবের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। তাই ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এবং সেই কারণেই আল্লা সমস্ত সক্ষম মুসলমানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কোরাণ বলছে—"**কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওঁৎ পেতে থাকবে**" (কোরাণ-৯/৫)। "**যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে**" (২/১৯১)। "**তাদের গ্রেফতার কর, যেখানে পাও হত্যা কর**" (৪/৮৯)। "**কাফেরদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। ওরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক**" (ঐ-৯/১২৩)। "**যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে জিহাদে মোকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর**" (৪৭/৪)। "**তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্ত সমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্ত্তন কর, অথবা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার কর**" (ঐ-৫/৩৩)। "**ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানে পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে**" (ঐ—৩৩/৬১)।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোরাণের এই সমস্ত বাণীই মুসলমানদের হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করছে। কোরাণের এই সমস্ত পাশবিক নির্দেশের দ্বারা চালিত হয়েই আজ মুসলমান নামক পশুর দল বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালাচ্ছে। নারী শিশু সহ কাশ্মীরের হিন্দুদের গুলি করে হত্যা করছে। এবং ওই সব জায়গা থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করছে।

শুধু তাই নয়, এই পশ্চিমবঙ্গেও যেখানে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি, সেই সব জায়গাতেও জিহাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। নিরুপায় হয়ে সেই সব অঞ্চলের হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে জায়গা জমি ফেলে রেখে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হচ্ছে। লুটপাট করে মুসলমানরা তাদের সহায়-সম্বল, ধনসম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। আগে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার এবং তার পুলিশী বাহিনী কোন পদক্ষেপ নেয়নি এবং বর্তমানে তৃণমূল সরকারও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সরকার ভোটের লোভে মুসলমানদের তোষণ করে চলেছে। এই বামফ্রণ্ট ও তৃণমূল সরকারের মদতেই প্রতিদিন হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমান সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। এভাবে প্রায় ২ কোটি বাংলাদেশী মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ঢুকে পড়েছে। ফলে বাংলাদেশের সীমানা অলিখিতভাবে ২৫ থেকে ৩০ মাইল ভারতের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ৯টি জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আরও বিপদের কথা হল, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান তৃণমূল সরকার যে উলঙ্গ মুসলমান তোষণ শুরু করেছে, তার ফলে এই রাজ্যের ইসলামীকরণ আরও দ্রুত হচ্ছে।

সব থেকে আতঙ্কের ব্যাপার হল, এই প্রক্রিয়া যদি অবাধে চলতে থাকে তা হলে অচিরেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান প্রধান হয়ে যাবে। হিন্দু বাঙালীর পক্ষে তখন দুটো রাস্তা খোলা থাকবে। (১) মুসলমান হয়ে যাওয়া অথবা (২) পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে পালাতে হবে। যাই হোক, তখন তারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ইসলামী দেশ হয়ে গেলে তাঁরা কোথায় যাবেন? এই প্রশ্নটা আজ সমস্ত বাঙালী হিন্দুকেই গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। প্রথমত অনুপ্রবেশ এবং দ্বিতীয়ত একাধিক বিবাহ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়ছে। কাজেই সমস্ত বাঙালী হিন্দুর পক্ষেই চরম বিপদের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এখন থেকে সাবধান না হলে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আর উপায় থাকবে না।

অগ্রগতির পথে ভারত

ভারতের ভিক্ষাপাত্র বর্জন ঃ আর্থিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি

(এক)

বিগত ২০০৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার (বি জে পি'র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার) এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দিল্লির অর্থমন্ত্রক পাশ্চাত্যের ২২টি দেশকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে,তাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য ভারতের আর দরকার নেই। ওই ২২টি দেশ থেকে ভারত বছরে ৬০ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ গ্রহণ করে। কাজেই ওই ২২টি দেশ থেকে যে ঋণ পাওয়া যেত তা সমগ্র বিদেশি ঋণের প্রায় ২৫ শতাংশ। ভারত আজ উন্নয়ন খাতে বছরে প্রায় ৪০০০ কোটি ডলার খরচ করে। তাই মোট বিদেশী ঋণ ওই খরচে ছয় শতাংশ মাত্র। এবং উপরিউক্ত ২২টি দেশ থেকে যে ঋণ পাওয়া যায়, তা মোট খরচের মাত্র ০.৮ শতাংশ।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই আমাদের অর্থমন্ত্রক উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওই ২২টি দেশ থেকে নেওয়ায় ঋণের অর্থ প্রধানত কিছু রাজ্য ও রেলওয়ের উন্নয়নে খরচ করা হত। তাই বিশেষজ্ঞ মহলের অনেকে মনে করেন যে, ওই ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দিলে কিছু দুর্বল রাজ্য ও রেলওয়ের উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ওই ২২টি দেশকে এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বেসরকারি স্তরে কোনও সংস্থাকে যদি তারা ঋণ দেয় তবে সরকার আপত্তি করবে না।

ভারত বছরে যে পরিমাণ বিদেশি ঋণ গ্রহণ করে তার প্রায় ৬০ শতাংশ বা ১৩০ কোটি ডলার আসে বিশ্বব্যাংক থেকে। বাকি ঋণ ভারতে নেয় ছ'টি দেশ থেকে, যার মধ্যে রয়েছে জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া। যদিও এখনও পর্যন্ত ভারতের তরফ থেকে বিশ্বব্যাংককে ও ওইসব দেশগুলিকে কোনও চিঠি দেওয়া হয়নি, তবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, অদূর ভবিষ্যতে ভারত ওই সমস্ত দেশ এবং বিশ্বব্যাংকসহ রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থা থেকেও ঋণ নেওয়া বন্ধ করে দেবে।

ভারত সরকারের পক্ষে উপরিউক্ত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে, কারণ, ভারতের বিদেশী মুদ্রাভাণ্ডার আজ সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করে ৮২০০ কোটি ডলার বা প্রায়

৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছতে পেরেছে। ভিক্ষাপাত্র হাতে দরজায় দরজায় ভিক্ষা করার স্তর ভারত অতিক্রম করতে পেরেছে। ভারত আজ ভিক্ষুক নয়, বরং ভিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে। গত বছর ভারত এশিয়া ও আফ্রিকার ছোট ছোট দরিদ্র দেশগুলোকে ৬০ কোটি থেকে ৭০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। এবং আমাদের অর্থমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বর্তমান আর্থিক বছরে ওই সাহায্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হবে।

সব মিলিয়ে বর্তমান ভারতের মোট বিদেশি ঋণ আছে ৫৪০০ কোটি ডলার। গত বছর ভারত ঋণ পরিশোধ করতে ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। কিন্তু বিদেশি মুদ্রাভাণ্ডার তেজি হওয়ার ফলে এবং যত শীঘ্র সম্ভব বিদেশের ধার-দেনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ বছর ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বাড়িয়ে ৬০০ কোটি ডলার করা হবে।

এককালে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীরা অনেক দেশকে ভৌগোলিকভাবে দখল করে শোষণ করত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভৌগোলিক অধিকার ছেড়ে দিয়ে শুধু আর্থিক দিক দিয়ে শোষণ করার রীতি চালু হয়, যার নাম হয় 'Neo Colonialism' বা 'নয়া উপনিবেশবাদ'। এই নয়া উপনিবেশবাদের মূলস্লোগান হল, "ওদের ঋণের দায়ে ডুবিয়ে দাও এবং পদানত করে রাখ" (Bury them under debt and rule)। এই নীতি লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক ছোট ছোট দেশসহ ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মতো বড় দেশগুলোকেও নিঃস্ব করে দিয়েছে। কিন্তু সুখের কথা হল, ভারত সেই ঋণের জাল ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

এ বছর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি যখন চীন সফরে যান তখন চীন ও ভারতের আর্থিক প্রগতি নিয়ে অনেক তুলনামূলক আলোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইসব আলোচনায় দেখানো হয় যে, আর্থিক দিক দিয়ে চীন ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে। ফলে, ভারতের অর্থনীতিবিদরা তো বটেই, দেশের সাধারণ মানুষও হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করে। এই সময় পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরা বলতে থাকেন যে, ২৫ বছর আগেও চীন ও ভারতে মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল প্রায় সমান। কিন্তু ১৯৭৮ সালে দেঙ জিয়াওপিং দ্বারা চীনে অর্থনীতির উদারীকরণের ফলে চীন দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে।

ভারত ও চীন থেকে যে সব পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, চীনের তুলনায় ভারতে নিরক্ষরতা ও শিশুমৃত্যুর হার প্রায় দ্বিগুণ এবং চীনে মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, চীনের কমিউনিস্ট সরকারের প্রদত্ত ওই সমস্ত পরিসংখ্যান কোনও নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বার যাচাই করা হয়নি। মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা তথ্য পরিবেশন ও মিথ্যা লিখনে কমিউনিস্টরা যে সিদ্ধহস্ত তা কারও অজানা নয়। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার ভূরি ভূরি

মিথ্যা কথা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রচার করেছিল। ওই সব বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গে হাজার হাজার কোটি টাকার বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। ফলে, এই রাজ্য শিল্পে প্রথম স্থানে চলে গিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সবার চাইতে এগিয়ে, ইত্যাদি ডাহা মিথ্যা কথা। এর আগে, ১৯৯০-এর দশকে তারা সাক্ষরতা অভিযানের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে আর একের পর এক জেলাকে সম্পূর্ণ সাক্ষর বলে প্রচার করতে থাকে। কিন্তু পরে প্রমাণ হয় যে, তারা ডাহা মিথ্যা প্রচার করেছিল। এই রাজ্যের মানুষকে চূড়ান্ত ধাপ্পা দিয়েছিল। তাই চীনের কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রকাশিত পরিসংখ্যানের প্রতি সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক।

তবে এটাও ঠিক যে, সাংহাই বা বেজিংয়ের চকচকে বিমান বন্দর, উঁচু উঁচু ইমারত ও প্রশস্ত রাস্তাঘাটের কাছে দিল্লি, মুম্বই বা কলকাতা অনেক ম্লান। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে, চীনের মানুষ বসবাস করছে স্বাধীনতাহীন এক জেলখানায়। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে সেখানে কিছু নেই। সেখানে তিয়েন আনমেনে ছাত্র সংহারের মতো নারকীয় ঘটনা বা 'ফালুন গঙ'পন্থীদের ওপর নির্যাতন ও দমন-পীড়নের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে। সেই তুলনায় ভারতের মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করে তা অভাবনীয়। অনেকে আবার ভারতের এই গণতন্ত্রকেই দোষারোপ করেন এবং বলেন যে, এই গণতন্ত্রের জন্যই ভারত চীনের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে এক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "যদি দেঙ জিয়াওপিং-কে ভোটারদের খুশি রাখা এবং নির্বাচনে জিতে ফের ক্ষমতায় আসার চিন্তা করতে হত, তবে তাঁর পক্ষে আর্থিক উদারীকরণ চালু করা সম্ভব হত না।"

তবে এটাও সত্য যে, দিল্লিতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার অগে ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্র ছিল তা বলা চলে না। তখন যা ছিল তা হল, কংগ্রেস দলের একদলীয় শাসন। উপরন্তু, স্তালিনের রাশিয়া থেকে জওহরলাল নেহরু যে সমাজতন্ত্র ধার করে এনছিলেন, তাও ছিল স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠার পক্ষে প্রতিকূল। আর্থিক সংরক্ষণের নীতি তখন ছিল খুবই কঠোর। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও প্রশাসনের স্তরে দুর্নীতিকেও অনেকে ভারতের পিছিয়ে পড়ার জন্য দায়ী করে থাকেন। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার ভারতের গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এই গণতন্ত্রের জন্যই ভারত কমপিউটার সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তির মতো অত্যাধুনিক ক্ষেত্রে চীনকে পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে। এবং মুক্তচিন্তা ভারতে স্বীকৃত বলেই তা সম্ভব হতে পেরেছে।

অনেকে আবার মনে করেন যে, চীনের এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ হল, ভারতের থেকে ১২ বছর আগে সে আর্থিক উদারীকরণ ঘটিয়েছে। সেই তুলনায় দশ বছর আগেও ভারতে লাইসেন্স-রাজ আর্থিক প্রগতির গলা টিপে ধরেছিল। সামান্য বিনিয়োগের জন্যও দিল্লি থেকে অনুমোদন সংগ্রহ করতে হত। মাত্র এই সেদিন, ১৯৯১ সালে, অর্থমন্ত্রী ডঃ

মনমোহন সিংয়ের আমলে ভারতে আর্থিক উদারীকরণের নীতি গৃহীত হয়, যা চীনে হয়েছিল ১৯৭৮ সালে।

এই সমস্ত বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্কের পরেও যে প্রশ্নটি অনেক বিশেষজ্ঞ তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল, চীন যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে তা কতখানি নির্ভরযোগ্য। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, চীন তার তথ্যকে যথাসম্ভব ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে, বড় করে দেখায়। পক্ষান্তরে ভারত, যা সত্য তার থেকেও কম করে দেখায়। তাঁরা মনে করেন, চীন যে গত ১০ বছর ধরে দেখিয়ে আসছে যে, তার বার্ষিক গড় উৎপাদন বা 'জি ডি পি' শতকরা ৯ থেকে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই হিসাব খুবই সন্দেহজনক। কাজেই বিষয়টা আরও গভীরে গিয়ে বিচারের দাবি রাখে।

এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিগত ১৯৮০ সালে চীন ও ভারতের লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৮.২ কোটি ও ৬৮.৭ কোটি। তখন দুই দেশে মাথাপিছু আয়ও ছিল প্রায় সমান। কিন্তু ২১ বছর পরে, ২০০১ সালে, ভারতের লোকসংখ্যা ও মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৩ কোটি ৩০ লক্ষ এবং ৪৫০ ডলার। আয়ের দিকে চীনের ক্ষেত্রে তা হয় যথাক্রমে ১২৭ কোডি ২০ লক্ষ এবং ৮৯০ ডলার। অর্থাৎ, ২০০১ সালে চীনের মানুষ ভারতীয়দের থেকে ৭০ শতাংশ বেশি সচ্ছল হয়ে যায়। ফলে আজ চীনের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা প্রায় ২৯ শতাংশ।

কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মত হল, এইসব সংখ্যাতত্ত্বের কয়েকটির মধ্যে জাল জুয়াচুরি বিদ্যমান এবং ভারত সেই জাল জুয়াচুরির শিকার। চীনের ব্যাপারে আর একটি তথ্য, যা সর্বাপেক্ষা সন্দেহজনক, তা হল বিদেশি বিনিয়োগ। চীন দাবি করে যে, গত বছর সেখানে ৫,২৭০ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতীয় পরিসংখ্যান বলছে যে, এখানে বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ২৩০ কোটি ডলার।

ভারতীয় অর্থনীতিবিদ সাধনা শ্রীবাস্তব উপরিউক্ত বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে অনেক গরমিল ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমত তিনি দেখেছেন যে, হংকং থেকে চীনে যে বিনিয়োগ হয়, চীন তা ঘরোয়া বিনিয়োগ বলে না দেখিয়ে বিদেশি বিনিয়োগ হিসাবে দেখায়। এই রকম আরও অনেক জাল-জুয়াচুরি বাদ দেওয়ার পর শ্রীমতী শ্রীবাস্তব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, চীনের প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগ ঘোষিত বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক। পক্ষান্তরে ভারতের ক্ষেত্রে তা ঘোষিত বিনিয়োগের প্রায় তিন গুণ।

এরপর শ্রীমতী শ্রীবাস্তব ওই প্রকৃত বিনিয়োগ রাশিকে উভয় দেশের জি ডি পি দিয়ে ভাগ করে দেখেছেন যে, ভারতের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে জি ডি পি-র ১.৭ শতাংশ এবং চীনের ক্ষেত্রে তা সামান্য বেশি, প্রায় ২ শতাংশ। শেষ পর্যন্ত যেটুকু ব্যবধান

পাওয়া গেল, শ্রীমতী শ্রীবাস্তব তা বিদেশে বসবাসকারী চীনাদের কৃতিত্ব বলে দাবি করেছেন। বলেছেন যে, বিদেশে বসবাসকারী চীনারা অনাবাসী ভারতীয়দের তুলনায় তাদের আয়ের কিছু বেশি অংশ স্বদেশে বিনিয়োগ করে, তাই এই তফাত।

ভারত ও চীনের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে চীন ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে। গত ২০০২ সালে চীনের জি ডি পি-র ৩৫ শতাংশ ছিল এই শিল্পের অবদান। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা ছিল মাত্র ১৫ শতাংশ। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, চীনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বিশ্ব বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে ফেলেছে। অনেকের মতে, চীনের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে কারণ চীনা পণ্যের দাম খুবই সস্তা। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে দামে চীন তার পণ্য বিক্রি করছে, ভারতে তার কাঁচামালের দামই অনেক বেশি। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, চীনা সরকার কাঁচামাল ও রপ্তানিশুল্কের ওপর যে ভরতুকি দেয়, তার ফলেই চীন কম দামে জিনিস বিক্রি করতে পারে। অনেকে এ ব্যাপারে বিচার করে দেখেছেন যে, ভারত সরকার যদি চীনের সমহারে ভরতুকি দেয় তবে ভারতীয় পণ্যের দাম কম করে ১৭ শাতংশ হ্রাস করা সম্ভব।

কিন্তু ভারতের পক্ষে আনন্দের বিষয় হল, চীনা পণ্যের মান ভারতীয়ত পণ্যের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। বছর দুই আগে যখন চীনা পণ্য ভারতে আসতে শুরু করে তখন অনেকে আশংকা প্রকাশ করেছিল যে, সস্তা চীনা পণ্য ভারতের বাজারদখল করে ফেলবে। ফলে ভারতীয় শিল্প মার খাবে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতের ক্রেতারা বুঝতে পারেন যে, চীনা পণ্য অত্যন্ত নিম্ন মানের। কাজেই ফল হল বিপরীত। ভারতে চীনা পণ্যের আমদানি কমে গেল এবং চীনে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বেড়ে গেল। বছর শেষে দেখা গেল, চীন ও ভারতের পারস্পরিক বাণিজ্য ভারতের পক্ষে উদ্বৃত্ত বাণিজ্য হয়েছে।

এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের দাম, কীভাবে কমানো যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ড্রাস্ট্রিজ বা সি আই আই গত বছর একটি কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশন লক্ষ্য করে যে, ভারতে বিক্রয়কর ও অন্তঃশুল্ক (excise duty) চীনের তুলনায় অনেক বেশি। কাজেই ভারতীয় পণ্যের দাম কমাতে হলে সবার আগে করের বোঝা কমাতে হবে। ওই কমিশন আরও লক্ষ্য করে যে ভারতে আমদানি শুল্ক চীনের প্রায় দ্বিগুম। ভারতে এই শুল্ক ২৪ শতাংশ, কিন্তু চীনের মাত্র ১৩ শতাংশ। কাজেই যে সব শিল্পের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সে সব শিল্পের পণ্যের দাম অনেক বেশি হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ওই কমিশন বলে যে, শুধু এই কারণে ভারতে তামার দাম চীনের থেকে ২৫ শতাংশ বেশি।

করের বোঝা কমানোর জন্য ওই কমিশন দেশব্যাপী 'ভ্যালু আডেড ট্যাক্স' বা 'ভ্যাট' চালু করার সুপারিশ করে, কিন্তু বিরোধীদের আন্দোলনের ফলে সরকারের পক্ষে তা চালু

করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কমিশনের অন্যান্য সুপারিশগুলির অন্যতম হল (১) বিদ্যুতের খরচ কমানোর জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলোকে ঢেলে সাজানো ও (২) শ্রম-আইন সংশোধন।

আজ উৎকৃষ্ট গুণমানের জন্য ভারতীয় পণ্য বিশ্ববাজারে খুবই আদৃত হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে পণ্যের দাম কমাতে পারলে ভারতীয় পণ্য যে বিশ্ববাজারের একটা বড় অংশ দখল করতে সক্ষম হবে তা বলাই বাহুল্য। তাই অনেকে মনে করেন যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে চীনকে ধরে ফেলা তো যাবেই, ভারত তাকে অতিক্রম করে গেলেও আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না।

(দুই)

১৯৯১ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের সময় আর্থিক উদারিকরণ নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু তখনকার কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে তা কার্যকর করা স্থগিত রাখে। কারণ, এই প্রক্রিয়া শুরু হলে, অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও প্রথম দিকে অনেক শ্রমিক বেকার হতেন। তাই বলতে গেলে, ১৯৯৮ সালে, বর্তমান এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই আর্থিক উদারিকরণের কাজ শুরু হয়। তখন থেকেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হতে থাকে।

প্রথমদিকে ওইসব বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে ভারতের কোম্পানীগুলিকে প্রবল এক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে সুখের কথা হল ভারতীয় কোম্পানিগুলি সেই প্রথম ধাক্কা সামলে উঠতে পেরেছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদে তারা তাদের পণ্যসামগ্রীর গুণমান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে পেরেছে। উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য তাদের কর্মী সংকোচন করতে হয়েছে। 'ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম' বা 'ভি আর এস' এবং 'আর্লি রিটায়ারমেন্ট স্কিম' বা 'ই আর এস' চালু করে অনেক কর্মীকে বসিয়ে দিতে হয়েছে। তবে আজ তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং সর্বোন্নত বাজারেও আজ ভারতীয় পণ্য রপ্তানি হচ্ছে। সব থেকে বড় কথা হল, গত ২০০২-০৩ আর্থিক বছরে তারা রেকর্ড পরিমাণ লাভ করেছে এবং ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নতুন জোয়ার নিয়ে এসেছে। যে সমস্ত গতানুগতিক শিল্প, যেমন সিমেন্ট, ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং, যেগুলি এতদিন কোনও মতে ধুঁকতে ধুঁকতে চলছিল, সেগুলি যেন নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে।

টাটা স্টিল বা টিসকো গত ২০০২-০৩ আর্থিক বছরে লাভ করেছে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা, [illegible] গত ২০০১-০২ সালের লাভের প্রায় পাঁচ গুণ। ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছরে ধরে লোকসান করার পর 'স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিঃ' বা 'সেইল' গত বছর লাভের মুখ দেখেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার এক অঙ্ক থেকে দুই অঙ্কে পৌঁছেছে।

এরমধ্যে সরকারের তরফে সুদের হার কমিয়ে দেওয়ার ফলে কোম্পানিগুলি ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে কম সুদে টাকা ধার করতে পারছে,যা কাজকর্মে এক নতুন গতি এনে দিয়েছে। অবস্থা বর্তমানে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, ব্যাংকগুলি টাকা ধার দেওয়ার লোক পাচ্ছে না। সাধারণ মধ্যবিত্তের পিছনেও ব্যাংকগুলি টাকা নিয়ে দৌড়চ্ছে। বলছে, টাকা ধার নাও। টাকা ধার নিয়ে বাড়ি করো, গাড়ি কেনো বা টিভি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন কেনো। এরকম অবস্থা এর আগে ভারতে কোনও দিন হয়নি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ব্যবসায় তেজিভাব, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি নেই। গত তিন বছর ধরে জিনিসপত্রের দাম, বিশেষ করে চাল, গম, আটা, ময়দা ও চিনির দাম প্রায় এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় কোম্পানিগুলি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। কারণ, তারা আশা করেছিল, চাহিদা বাড়বে। কিন্তু চাহিদা আশানুরূপ না বাড়ার ফলে কোম্পানিগুলি মার খাচ্ছিল, রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলির আগমনের ফলে বাধ্য হয়ে তাদের কর্মী সংকোচন করতে হয়েছে, এবং পণ্যের গুণগত মান উন্নত করতে হয়েছে। ফলে কর্মীপ্রতি উৎপাদন বেড়েছে এবং সেই কারণেই লাভের অঙ্ক বেড়েছে। আজ থেকে মাত্র পাঁচ বছর আগে টিসকোর একজন কর্মী গড়ে প্রতি বছর ১৩৩ টন ইস্পাত উৎপাদন করত। কর্মী সংকোচনের ফলে গত বছর তা বেড়ে ২৪৫ টন হয়েছে। অনেক কোম্পানি তাদের কর্মী প্রতি উৎপাদন দ্বিগুণ করে ফেলেছে। 'ইনডেক্স অব ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন' বা 'আই আই পি' হল একটি সরকারি সূচক যাতে কর্মীপ্রতি কোন কোম্পানি কত উৎপাদন করছে তা প্রকাশ করা হয়। গত বছরের এই তথ্য বলছে যে, ভারতের ৬০ শতাংশ কোম্পানি গত এক বছরে কর্মীপ্রতি উৎপাদন বাড়িয়েছে ৩০ শতাংশ এবং ৩০ শতাংশ কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে তা ছিল কর্মীপ্রতি জাতীয় গড় উৎপাদনের থেকে বেশি।

এইসব ঘটনা আর্থিক ক্ষেত্রে এমন তেজিভাব এনে দিয়েছে যে, মুম্বইয়ের শেয়ার বাজারের সূচক 'সেনসেক্স' সম্প্রতি ৪০০০ অঙ্কের মান অতিক্রম করে গিয়েছে। ভারতের বড় বড় কোম্পানিগুলির মালিকবর্গ তাই বর্তমান এন ডি এ সরকার এবং তার দ্বারা গৃহীত আর্থিক নীতিগুলির ওপর খুবই প্রসন্ন। 'কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি' বা 'সি আই আই' হল এরকম শিল্প মালিকদের একটি সংগঠন। গত জুলাই মাসে চেন্নাইয়ে 'সি আই আই'-র জাতীয় কাউন্সিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় বড় ৮০ জন শিল্পপতি তাতে অংশগ্রহন করেন।

'মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা' কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং 'সি আই আই'-র সভাপতি আনন্দ মাহিন্দ্রা এই সভায় বলেন, "আমরা এটা জানাতে পেরে খুবই খুশি যে, ভারতের

কোম্পানিগুলি আজ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে।" তিনি আরও বলেন, "আশা করা যায় যে, ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের এই সুদিন বর্তমান আর্থিক বছরের পরেও চলতে থাকবে।" 'বাজাজ অটো'র চেয়ারম্যান রাহুল বাজাজ বলেন, "ভারতীয় অর্থনীতি যদি বছরে ছয় শতাংশ হারেও বৃদ্ধি পায় তবু ভারত হবে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ। চীনের পরেই হবে ভারতের স্থান।"

অনেক শিল্পপতি অবশ্য দুঃখ করে বলেন যে, শিল্পে রেকর্ড মুনাফা হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই তুলনায় বিনিয়োগ হচ্ছে না। 'সেন্টার ফর মনিটরিং অব ইন্ডিয়ান ইকোনমি' নামক সংস্থার সভাপতি মহেশ ব্যাস বলেন, "গত ২০০২-০৩ আর্থিক বছরটি ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বছর এবং ১৯৯৪-৯৫-এর পর উন্নতির এতটা জোয়ার এই প্রথম। কিন্তু সেই অনুপাতে বিনিয়োগ হয়েছে খুবই কম।" বিনিয়োগ কম হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বিনিয়োগ একেবারেই হয়নি বা হচ্ছে না সেটাও ঠিক নয়। অন্যান্য কিছু কিছু ক্ষেত্র, যেমন তথ্যপ্রযুক্তি, টেলিফোন যোগাযোগ, গৃহস্থালির সরঞ্জাম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে ভালোই বিনিয়োগ হচ্ছে। অরও একটি ক্ষেত্রে বিশাল বিনিয়োগ হচ্ছে, তা হল গৃহনির্মাণ।

তার থেকেও বড় কথা হল, আজকাল শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ হচ্ছে না। বিনিয়োগ হচ্ছে পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য। ব্যাংকিং ও বিমা ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে যে বিনিয়োগ হচ্ছে তা চোখে পড়ার মতো। বিদেশি ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যই যে এই বিনিয়োগ হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। তাই 'রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ'-এর কর্ণধর বিবেক দেবরায় বলেছেন, "আজকাল যে সব বিনিয়োগ হচ্ছে তা অনেক বাস্তবসম্মত এবং অর্থবহ।"

আরও একটি ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ হচ্ছে। তা হল, পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্র। টেলিফোন পরিষেবাকে বিশ্বমানের করার জন্য গত চার বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে সরকারের তরফ থেকে এরকম ৪৭টি ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান হল, উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত রাস্তা তৈরির প্রকল্প। চারটি রাস্তা চক্রাকারে চারটি প্রধান শহর, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বই ও দিল্লিকে যুক্ত করবে, যার মোট দৈর্ঘ্য হবে ৭,৩০০ কিমি। অন্য দুটি রাস্তা সরাসরি কলকাতা ও মুম্বই এবং দিল্লি ও চেন্নাইকে যুক্ত করবে। এর মোট দৈর্ঘ্য হবে ৫,৮৪৬ কিমি। আশা করা যায় যে, শেষোক্ত ৫,৮৪৬ কিমি রাস্তা ২০০৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এবং ৭,৩০০ কিমি অন্য রাস্তাগুলি ২০০৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। ছয় থেকে আট লেনের এইসব রাস্তা তৈরি হলে ভারত যে বিশ্বমানের

সড়ক যোগাযোগের মালিক হবে তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। এর ওপর রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর 'গ্রামীণ সড়ক যোজনা', যার উদ্দেশ্য হল দেশের সমস্ত গ্রামকে পাকা সড়ক দিয়ে যুক্ত করা। এইসব রাস্তা তৈরি হলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বর্তমানে এইসব রাস্তা তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিদিন ৩৫ থেকে ৪০ কোটি টাকা খরচ করে চলেছে।

কোনও আর্থিক প্রগতিই প্রগতি নয়, যদি তা কর্মসংস্থার করতে না পারে। ১০৩ কোটি মানুষের এই দেশে প্রতি বছর যে হারে মানুষ বাড়ছে, সেই হারে কর্মসৃজন না হলে কোনও প্রগতিই চোখে ধরা পড়বে না। আগেই বলা হয়েছে যে, ২০০০ ও ২০০১ সাল নাগাদ টিসকো, টাকা মোটরস (পূর্বেকার টেলকো), মারুতি, বাজাজ অটো, সেইল ইত্যাদি বড় বড় সংস্থা কর্মী সংকোচন করার ফলে অনেকে কর্মচ্যুত হয়েছে। কিন্তু সেইসব কোম্পানিই আজ বলছে, এই বছরের শেষে তাদের সংস্থাগুলিতেও প্রচুর কর্মসংস্থান হবে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, বর্তমান আর্থিক বছরের শেষের দিকে বেসরকারি সংস্থাগুলিতে কর্মীর সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে ব্যাংক, বিমান প্রভৃতি পরিষেবা ক্ষেত্র, ওষুধ-চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, তথ্যপ্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, গৃহস্থালির সরঞ্জাম এবং সংবাদ মাধ্যম ক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থার হবে বলে বিশেষজ মহলের অনুমান। অনেকের মতে, শুধু বিমা ক্ষেত্রেই এক লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করেন যে, এবার কর্মসংস্থানের জোয়ার আসবে বটে, তবে তা বেতনের জোয়ার নিয়ে আসবে না। এবং সেটাই হবে স্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কৃষি ক্ষেত্রেও উন্নয়নের এক জোয়ার আগতপ্রায়। ফলে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং গ্রামগুলিও প্রাচুর্যপূর্ণ হবে। আর একটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে তা হল গৃহনির্মাণ ক্ষেত্র। গত দু'বছরে এই ক্ষেত্রে যে বৃদ্ধি হয়েছে তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গত ২০০০-০১ সালে এই ক্ষেত্রে লগ্নির পরিমাণ ছিল ২০০০ কোটি টাকা। গত ২০০২-০৩ সালে তা বেড়ে ৭০,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। অর্থাৎ গত দু'বছরে এই ক্ষেত্রে ব্যবসা বেড়েছে ৩৫ গুণ।

সেইরকম আরও কয়েকটি ক্ষেত্রেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। এই ক্ষেত্রগুলি হল গৃহস্থালি সরঞ্জাম, কমপিউটার ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং মোটর গাড়ি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে এইসব ক্ষেত্রে ব্যবসা কতটা বেড়েছে তা বুঝতে সুবিধা হবে। গত ১৯৯১ সালে ওয়াশিং মেশিনের মোট বাজার ছিল ৮ কোটি টাকা। দশ বছর পরে, ২০০১ সালে তা বেড়ে ১,৮২৯ কোটি টাকা হয়েছে। ১৯৯১ সালে কমপিউটার বিক্রির মোট পরিমাণ ছিল ৭১৯ কোটি টাকা। ২০০১ সালে তা বেড়ে ৯,৬৮৪ কোটি টাকা হয়েছে। ১৯৯১ সালে ৩৮২ কোটি টাকার টেলিভিশন বিক্রি হয়েছিল। ২০০১ সালে তা বেড়ে

৭,৪২০ কোটি টাকা হয়েছে। ১৯৯১ সালে মোটর গাড়ি বিক্রি হয়েছিল মোট ২,০৫৮ কোটি টাকার। ২০০১ সালে তা বেড়ে ১৬,৪৪৩ কোটি টাকা হয়ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিগত ১০ বছরে ওয়াশিং মেশিনের বিক্রি বেড়েছে ২৫০ গুণ, কমপিউটারের বিক্রি বেড়েছে ২৫০ গুণ, কমপিউটারের সরঞ্জামের বিক্রি বেড়েছে সাড়ে ১৩ গুণ, টেলিভিশনের বিক্রি বেড়েছে সাড়ে ১৯ গুণ, এবং মোটর গাড়ির বিক্রি বেড়েছে ৮ গুণ।

এই প্রসঙ্গে ভারতের মোটর গাড়ি শিল্প আরও বিশেষ কিছু আলোচনার দাবি রাখে। ভারতে নির্মিত মারুতি গাড়ি আজ বিশ্বের নানান দেশে, এমনকি, ব্রিটেন, ফ্রান্স বা জার্মানির মতো উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও রপ্তানি হচ্ছে। সেইরকম হিউন্ডাইয়ের ছোট গাড়ি স্পেন, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম এবং গ্রিসে রপ্তানি হচ্ছে। গত ১৯৯৮-৯৯ সালে ভারত মোট ২৮,১২২টি গাড়ি বিদেশে রপ্তানি করে। মাত্র চার বছর পরে, ২০০২-০৩ সালে তা বেড়ে ৭১,৬৫৩টিতে দাঁড়ায়। মোটর বাইকের ক্ষেত্রেও তাই। ১৯৯৮-৯৯ সালে ভারত রপ্তানি করেছিল ৩৫,৪৬১টি মোটর বাইক। ২০০২-০৩ সালে তা বেড়ে ১,২৬,০০০ হয়। ২০০৩-০৪ সালে বাজাজ অটো রপ্তানি করেছে ৬০,০০০ এবং হিরো হোন্ডা রপ্তানি করেছে ৩০,০০০ মোটর বাইক। এছাড়া মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরিও একটা ক্ষেত্র। ভারতে তৈরি এইসব যন্ত্রাংশ আজ বিদেশের অনেক নামী কোম্পানিও কিনতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে আমেরিকার 'জেনারেল মোটরস' এবং জার্মানির 'ডেমলার-ক্রাইসলার'-এর মতো কোম্পানি। গত ১৯৯৮-৯৯ সালে ভারত মোট ২৭০০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ রপ্তানি করেছিল। চার বছর পরে, ২০০২-০৩ সালে তা বেড়ে ৩৯৭০ কোটি টাকা হয়।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যখন সুদের হার হ্রাস করেছিল, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি না হওয়ার ফলে সে অসন্তোষ অচিরেই অনেকটা মিলিয়ে যায়। বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব হল, বর্তমান আর্থিক বছরে মুদ্রাস্ফীতির মানকে ৩.৮ শতাংশের বেশি হতে না দেওয়া। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হল, ইরাক যুদ্ধের প্রাক্কালে তেলের দাম না বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি আরও কম হত। এসব সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে মাত্র ২.৭ শতাংশ।

গত ১৯৯৯-২০০০ সালে যখন আর্থিক উদারিকরণের প্রক্রিয়া চালু করা হয় এবং লোকসানে চলা সরকারি শিল্প সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ শুরু হয় তখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম নেতারা তাকে 'কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি' আখ্যা দিয়ে ব্যাপক হইচই শুরু করেছিলেন। তাঁরা প্রচার করছিলেন যে, বিশ্বব্যাংক ও সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার জলের দরে সরকারি সংস্থাগুলিকে বিদেশিদের কাছে বেচে দিচ্ছে। বিশেষ করে 'ভারত অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি' বা 'বালকো'-র

বেসরকারীকরণের সময় তাঁরা আকাশ বাতাস মথিত করে ফেলেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টে তাঁরা মামলা করেছিলেন। বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ শৌরি স্টারলাইট ইন্ডাস্ট্রিজের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বালকোকে খুব কম দামে তাদের কাছে বিক্রি করেছেন।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের এইসব অভিযোগ সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বলে, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনেই বালকোকে স্টারলাইটে কাছে বিক্রি করা হয়েছে এবং ওই হস্তান্তরের মধ্যে কোনও রকম আর্থিক কারচুপি নেই। কিন্তু আজ যখন সেই বালকো তার উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি করে মহানন্দে কাজ করে চলেছে, মোটা মুনাফা করছে, তা নিয়ে আমাদের বামপন্থী নেতারা টুঁ শব্দটি করছে না। এখানে বালকো শুধু একটা উদাহরণ মাত্র। যেমন সরকারি সংস্থা, সরকারি হোটেল ইত্যাদি বেসরকারিকরণ হয়েছিল, আজ তারা সকলেই মোটা অঙ্কের মুনাফা করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। সব থেকে মজার কথা হল, যে কেন্দ্রীয় সরকারকে 'জনবিরোধী' বলে আমাদের নেতারা দিনরাত চেঁচামেচি করছেন, সেই জনবিরোধী সরকার সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ-ভাতা বাড়িয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের 'জনদরদী' সরকার সেই বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা কর্মচারীদের দিচ্ছে না। হিসাবমতো ১৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাকি ছিল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর দু'মাস অগে মাত্র চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা আমাদের 'জনদরদী' সরকার কর্মচারীদের দিতে শুরু করেছে। বাকি ১০ শতাংশ কবে দেবে, বা আদৌ দিতে পারবে কিনা, সে ব্যাপারে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মহাশয় এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যপার হল, লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে। আমাদের প্রবীণ সি পি এম নেতৃত্ব এত দিন কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে সমান দূরত্বে থেকে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ার কথা বলে এসেছেন। কিন্তু এবার তাঁরা সরাসরি কংগ্রেস শিবিরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার কথা ঘোষণা করেছেন। ভেবেছেন যে, এভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচন লড়ে তাঁরা কেন্দ্রের এন ডি এ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। কিন্তু বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বলে মনে হয় না।

আগেই বলা হয়েছে যে, দেশের বড় বড় শিল্পপতি বর্তমান এন ডি এ সরকার এবং তার দ্বারা গৃহীত আর্থিক নীতির ওপর খুবই প্রসন্ন। তাই তাঁরা এটাই চাইবেন যে, বর্তমান আর্থিক প্রগতি অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকুক। অর্থাৎ কেন্দ্রে এন ডি এ সরকারই ক্ষমতায় থাকুক। এ ব্যাপারটাও আমাদের শিল্পপতিদের নজর এড়ায়নি যে, বিরোধীরা অনেক চেষ্টা করেও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনতে পারেনি। যে সব অভিযোগ আনার চেষ্টা করেছিল, তার সব ক্ষেত্রেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, সেগুলি ছিল সাজানো অভিযোগ।

কাজেই আশা করা যায় যে, আগামী নির্বাচনে ভারতের শিল্পপতিরা বর্তমান এন ডি এ সরকারকেই সমর্থন করবেন। তাঁরা কখনওই চাইবেন না যে, কিছু দুর্নীতিপরায়ণ এবং

জনগণের দ্বারা পরিত্যক্ত রাজনীতিক ক্ষমতায় এসে আর্থিক প্রগতির সমস্ত সম্ভাব বানচাল করে দিক। এ ব্যাপারে সি আই আইয়ের সভাপতি আনন্দ মহিন্দ্রর মন্তব্য খু প্রণিধানযোগ্য। আগেই বলা হচ্ছে যে, চেন্নাইয়ের সভায় তিনি বলেছিলেন, ‘‘আশা ক যায় যে, ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের এই সুদিন বর্তমান আর্থিখ বছরের পরেও চল থাকবে।” এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে এটাই প্রকাশ পায় যে, বর্তমান আর্থিক বছরের পরে বর্তমান এন ডি এ সরকারই ক্ষমতায় থাকবে এবং তবেই আর্থিক সুদিন নিরবচ্ছিন্নভা চলতে থাকবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে এটাই দেখা গিয়েছে, যে রাজনৈতিক দল ব্যবসা মহলের সমর্থন পেয়েছে, সেই দলই সরকার গড়েছে। আগামী নির্বাচনেও সেই দল ক্ষমতায় যাবে যে দলের পিছনে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মহলের সমর্থন আছে।

ভারতের মহাকাশ বিজয়

গত ২২ অক্টোবর ২০০১ ইণ্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) তার পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল্ (পি এস এল ভি-সি ৩) রকেট অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার শার সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করল। চৌদ্দ তলা বাড়ির সমান উঁচু এই মহাকাশযান ৩টি উপগ্রহকে মহাকাশে ৫৭২ কিমি উপরে বয়ে নিয়ে গেল এবং তাদের নিজ নিজ কক্ষপথে স্থাপন করল। উপগ্রহ তিনটির মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় এবং বাকি দুটো বিদেশী। এরা হল ভারতের টেকনোলজি এক্সপেরিমেন্ট স্যাটেলাইট (টি ই এস বা 'টেস') জার্মানীর 'বাইস্পেকট্রাল অ্যাণ্ড ইনফ্রারেড ডিটেকশন স্যাটেলাইট' (বার্ড) এবং বেলিজয়ামের 'প্রোজেক্ট ফর অন বোর্ড অটোনমি' (প্রোবা) স্যাটেলাইট। এর মধ্যে ভারতীয় উপগ্রহ টেস ছিল সব থেকে ভারী, ওজন ১,১০৮ কেজি এবং অন্য দুটি উপগ্রহের ওজন যথাক্রমে ৯২ কেজি ও ৯৪ কেজি।

অর্থাৎ পি এস এল ভি—সি৩ রকেটটি মোট ১,২৯৪ কেজি ওজন ৯৭০ সেকেণ্ডের মধ্যে মহাকাশে ৫৭২ কিমি উচ্চতায় তুলেছে এবং কক্ষপথে স্থাপন করেছে। রকেটের সবথেকে ওপরে, শঙ্কু আকৃতির কক্ষে উপগ্রহগুলি রাখা ছিল এবং ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম আববণের দ্বারা তারা সুরক্ষিত ছিল।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, আলোচ্য উৎক্ষেপণটি ইসরো-র বিশাল পি এস এল ভি প্রকল্পের ৬ষ্ঠ উৎক্ষেপণ। প্রায় আড়াই বছর আগে, ১৯৯৯ সালের ২৬ মে, ৫মে উৎক্ষেপণটি করা হয়েছিল। তখন পি এস এল ভি—সি২ রকেটের সাহায্যে মোট ১,২০৫ কেজি ওজনের ৩টি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল।

২২ অক্টোবর পূর্ব নির্ধারিত সময় ঠিক সকাল ১০টা ২৩ মিনিটে পি এস এল ভি—সি৩ রকেটে অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং কালবৈশাখীর মেঘের মতো গুরুগম্ভীর গর্জন করতে করতে তা ওপরে উঠতে থাকে। টেলিভিশনের দৌলতে আমাদের অনেকের পক্ষেই সেই মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য উপভোগ করা সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। খুব ধীরে চলা শুরু করলেও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তা ঘণ্টায় প্রায় ৩০০০ কিমি গতিবেগ অর্জন করে ওপরে উঠতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বয়ং শ্রীহরিকোটায় উপস্থিত থেকে ভারতীয়

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের এই সাফল্য প্রত্যক্ষ করেন। সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরো-র চেয়ারম্যান কে কস্তুরিরঙ্গন সাংবাদিকদের বলেন, "এই সাফল্যের জন্য আমি সত্যিই খুব খুশি।" তিনি আরও বলেন যে, উৎক্ষেপণের ৪০ মিনিট পরে, ৫৭২ কিমি উচ্চতায় ওঠার পর সর্বপ্রথম ভারতীয় উপগ্রহ টেস-কে কক্ষপথে স্থাপন করা হয় এবং তারপর যথাক্রমে বার্ড ও প্রোবা-কে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

অ্যানট্রিকস কর্পোরেশন হল ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা-সংস্থা। এই সংস্থার সঙ্গে জার্মানী ও বেলজিয়ামের ১০ লক্ষ ডলারের এক চুক্তি হয় এবং এই চুক্তির ফলেই পি এস এল ভি—সি-৩ বার্ড ও প্রোবা উপগ্রহকে মহাকাশে তোলে এবং কক্ষপথে স্থাপন করে।

ভারতীয় উপগ্রহ টেস-এর বিশেষত্ব হল, এর মধ্যে রয়েছে যন্ত্রচালিত একটা ক্যামেরা যে মহাকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠের ছবি তুলবে এবং সেই ছবি সামরিক বিভাগের দপ্তরে পাঠাবে। এই ক্যামেরাটি বিদেশ থেকে আমদানি করে বসানো হয়েছে এবং এর রিসোলিউশন হল এক মিটার। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে এক মিটার মাপের যেকোন বস্তুর ছবি ওই ক্যামেরা নিখুঁত ভাবে তুলতে পারবে।

অনেকদিন থেকেই আমাদের সামরিক বিভাগের লোকেরা এরকম একটি ক্যামেরার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে আসছিল। বিশেষ করে ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধের সময় এরকম একটি ক্যামেরার অভাব দারুণভাবে অনুভূত হয়। সামরিক কর্তারা অভিযোগ জানাতে থাকেন যে, এর ফলে তাঁদের পক্ষে পাকিস্তান সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়া অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে খুবই অসুবিদা হচ্ছে।

এতদিন ক্যামেরাযুক্ত নিজস্ব উপগ্রহ না থাকার ফলে সামরিক বিভাগকে বিদেশী কোন সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছবি চড়া দামে কিনতে হত। 'আইকোনস' হল এরকম একটি সংস্থা যাকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রতি বর্গফুট ছবির জন্য ২০ ডলার থেকে ২৫ ডলার মূল্য দিতে হত। এবং আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের 'ডিফেন্স ইমেজ প্রসেসিং অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস সেন্টার' বা ডিপাক-কে সেই চড়া মূল্যে তা কিনতে হত। এছাড়া আরও একটা অসুবিধা ছিল। বিশেষ কোন একটা ছবি চাইলে তা পেতে অন্তুতপক্ষে ১৫ দিন অপেক্ষা করতে হত। সাধারণ অবস্থায় এই বিলম্ব তেমন কোন অসুবিধার সৃষ্টি করতো না বটে, তবে যুদ্ধকালীন সময়ে এই বিলম্ব কোনমতেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। দেরিতে আসার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার আর কোন উপযোগিতা থাকত না। কাজেই নিজস্ব উপগ্রহ হবার ফলে সামরিক বাহিনীর পক্ষে এখন তৎক্ষণাৎ ছবি পাওয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে বিশাল খরচের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে। উপরন্তু টেস-এর ক্যামেরা দিয়ে আরও পরিশীলিত ও নিখুঁত ছবি পাওয়া সম্ভব হবে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে যে, আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে আমেরিকা ১০ সেমি রিসোলিউশন ক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা তাদের গুপ্তচর উপগ্রহে বসাতে সক্ষম হয়েছে, যা

৫০০ কিমি উচ্চতা থেকে ভূ-পৃষ্ঠে রাখা একটা বই-এর ছবি নিখুঁতভাবে তুলতে সক্ষম। এর চেয়েও চাঞ্চল্যকর সংবাদ হল এই যে, ১৯৯৮ সালে পোখরান বিস্ফোরণের সময় ভারতীয় কলাকুশলীরা সেই ক্যামেরার চোখে ধূলো দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখতে পেরেছিলেন।

আজ থেকে প্রায় আড়াই বছর আগে, ১৯৯৯ সালের ২৬ মে, বেলা ১১টা ৫২ মিনিটে ইসরো তার পি এস এল ভি—সি-২ রকেট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছিল। এই মহাকাশযানটিও ৩টি উপগ্রহকে মহাকাশে নিয়ে যায়, যার মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় এবং বাকি দুটো বিদেশী। ইসরো নির্মিত ১,০৫০ কেজি ওজনের ভারতীয় উপগ্রহটির নাম ছিল 'ওশ্যানস্যাট'। বিভিন্ন সামুদ্রিক তথ্য পাঠানোই হল এর কাজ। বিদেশী উপগ্রহ দুটোর মধ্যে একটা ছিল কোরিয়ার, যার নাম ছিল 'কিটস্যাট' এবং ওজন ছিল ১১০ কেজি। অন্যটা ছিল জামার্নীর, যার নাম ছিল 'ডি এল আর টুবস্যাট' এবং ওজন ছিল ৪৫ কেজি। অর্থাৎ ৩টি উপগ্রহের মোট ওজন ছিল ১,২০৫ কেজি। পি এস এল ভি—সি-২ রকেট প্রথমে ভারতীয় উপগ্রহটিকে কক্ষপথে স্থাপন করে। তার ৫০ সেকেন্ট পরে কোরিয়ার 'কিটস্যাট'এবং তারও ৫০ সেকেণ্ড পরে জার্মানীর 'টুবস্যাট' উপগ্রহকে তাদের কক্ষপথে স্থাপন করে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, উপরিউক্ত পি এস এলভি—সি-২ রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা তথা ইসরো-র উপগ্রহ ও রকেট তৈরির কারিগরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলেই ভারতের নাম আন্তর্জাতিক মহাকাশ সঙ্ঘ বা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ক্লাব-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সম্মানীয় ক্লাবের অন্য সদস্যরা হল আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান এবং কন্সর্টিয়াম অফ ইয়োরোপিয়ান নেশনস্, যার প্রতিনিধিত্ব করে ফ্রান্স। এই একই সঙ্গে ভারত মহাকাশ কারিগরি ও মহাকাশ যানে করে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের আন্তর্জাতিক ব্যবসার অংশীদার হয়। বিশ্বজোড়া এই ব্যবসার মোট পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি ডলার। এবং এই প্রথম ভারত কোরিয়া ও জার্মানির উপগ্রহ দুটি মহাকাশে তুলে ১২ লক্ষ ডলার আয় করে।

১৯৯৩ সালে ভারত সর্বপ্রথম পি এস এল ভি শ্রেণীর মহাকাশ যান উৎক্ষেপণ করার চেষ্টা করে। প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তী সব পি এস এল ভি রকেটই সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়। উপরিউক্ত পি এস এল ভি—সি-২ ছিল এই শ্রেণীর ৫ম উৎক্ষেপণ।

পি এস এল ভি শ্রেণীর রকেটগুলোর বিশেষত্ব হল, এরা যেসব উপগ্রহ মহাকাশে নিয়ে যায় তার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভূ-পৃষ্ঠের ছবি তোলা, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। মাটির তলায় কোথায় জল আছে, কোথায় তেল আছে ইত্যাদি খুঁজে বের করাও এদের কাজ। এইসব উপগ্রহ যখন পৃথিবীকে পাক খায় তখন তারা পৃথিবীর দুই মেরুর ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এদিকে পৃথিবীও তার আহ্নিক গতির জন্য ঘুরে চলেছে।

তাই এরা যখন পৃথিবীর ওপর দিয়ে উড়ে যায় তখন পৃথিবী পৃষ্ঠের সমস্ত অঞ্চলের ছবি তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

ভারত আজ পর্যন্ত যে সব গবেষণামূলক ও অন্যান্য উপগ্রহ এই সব পোলার কক্ষপথে স্থাপন করেছে, তারা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক তথ্য পাঠিয়ে চলেছে। এইসব তথ্য ভারত আজ আমেরিকা সহ ৬টি দেশের কাছে বিক্রি করছে। গত ১৯৯৮ সালে এইসব তথ্য বিক্রিকরে ভারত ৫০ লক্ষ ডলার আয় করে। এই আয় মোট আন্তর্জাতিক ব্যবসার প্রায় ১৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের অনুমান আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই আয় বেড়ে ৫০ কোটি ডলার হবে। এছাড়া ওই বছর ভারত বিভিন্ন দেশের কাছে উপগ্রহের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিক্রি করেও প্রায় ১৫ লক্ষ ডলার আয় করে। এর থেকেও বড় কথা হল, উপগ্রহ তৈরি করার অন্যতম প্রধান সংস্থা, আমেরিকার 'হিউজেস'-ও ভারতীয় যন্ত্রাংশের এক বড় খরিদ্দার।

মহাকাশ বিষয়ে ভারত যে বিশ্বমানের কারিগরি অর্জন করেছে, ইসরো তা প্রমাণ করে দিয়েছে আজ থেকে প্রায় ৮ মাস আগে। গত এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখে (২০০১) ইসরো জি এস এল ভি—ডি ২ রকেট সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করে ভারতীয় কারিগরির উৎকর্ষতা প্রমাণ করে দেয়। ওইদিন বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে ওই রকেটটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়, যা ১.৫৩ টন ওজনের ইনস্যাট শ্রেণীর একটি উপগ্রহকে ৩৬,০০০ কিমি উচ্চতায় জিও-স্টেশনারি কক্ষে স্থাপন করে।

এর প্রায় এক মাস আগে, ২৮ মার্চ এই রকেটটিকে উৎক্ষেপণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ৪টি স্ট্র্যাপ-অন বুস্টার মোটরের মধ্যে একটা মোটর ঠিকমত কাজ না করায় সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ত্রুটি ছিল খুবই সামান্য। তাই ১ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তা মেরামত করা সম্ভব হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে ডঃ কস্তুরিরঙ্গন বলেন, "মহাকাশ বিষয়ক কাজ হল ক্ষমাহীন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করার মতো ব্যাপার। সামান্য ভুল-ভ্রান্তি মহা গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে।"

ইনস্যাট শ্রেণীর উপগ্রহগুলোর কাজ হল যোগাযোগ রক্ষা করা। এদের মাধ্যমে দূর দেশের খবরাখবর, টেলিফোনে কথাবার্তা ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। পৃথিবীর বিষুবরেখা বরাবর, কিংবা তার খুব কাছ দিয়ে এই শ্রেণীর উপগ্রহরা পৃথিবীকে পাক খায়। পৃথিবী যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, এগুলোও সেইরকম ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করে। কাজেই পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হবে এরা যেন আকাশে স্থির দাঁড়িয়ে আছেএ। একেই বলে জিও-স্টেশনারি কক্ষ। ভারত এ পর্যন্ত এ রকম বেশ কয়েকটি উপগ্রহ তৈরি করে মহাকাশে পাঠিয়েছে এবং তারা জিও-স্টেশনারি কক্ষে থেকে কাজও করছে।

ইসরোর পক্ষে এতদিন এই উপগ্রহদের মহাকাশে তোলার মতো শক্তিশালী রকেট তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই ইয়োরোপের 'অ্যারিয়ান' রকেটের সাহায্যেই তাদের মহাকাশে

পাঠানো হত। এবং প্রতিটি উৎক্ষেপণের জন্য ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার খরচ করতে হত। কাজেই জি এস এল ভি—ডি-২ রকেটের সফল উৎক্ষেপণ এটাই প্রমাণ করল যে, ইনস্যাট জাতীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ভারতকে আর কোন বিদেশী সংস্থার দ্বারস্থ হতে হবে না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীকস্তুরিরঙ্গন বলেন, "জি এস এল ভি-র সফল উৎক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে ভারত মহাকাশ কারিগরির ক্ষেত্রে একটা বড় ধাপ অতিক্রম করল।"

এক কালে ভারতকে উপগ্রহগুলোও বিদেশ থেকে, বিশেষ করে আমেরিকা থেকে কিনে আনতে হত। কিন্তু বর্তমানে আই আর এস জাতীয় রিমোট সেন্সিং উপগ্রহ এবং ইনস্যাট শ্রেণী যোগাযোগ উপগ্রহ তৈরি করার কারিগরি ভারতের করায়ত্ত্ব হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে জি এস এল ভি এবং পি এস এল ভি শ্রেণীর রকেটের সাহায্যে সেই সব উপগ্রহদের কক্ষে স্থাপন করার শক্তিও ভারত অর্জন করে ফেলেছে। ফলে আর্থিক ব্যাপারেও অনেক সাশ্রয় হবে। আগের থেকে অন্তত ৩০ শতাংশ কম খরচে উপগ্রহ তৈরি করে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে।

প্রায় ১৬ তলা বাড়ির সমান (৪৯.১ মিটার) উঁচু ও ৪০১.৪ টন ভারী জি এস এল ভি—ডি-১ রকেটটি ৪টি অংশ বা স্টেজ-এ বিভক্ত ছিল। প্রথম বা সর্বাপেক্ষা নীচের অংশে ছিল ৪টি স্ট্র্যাপ-অন বুস্টার ইঞ্জিন এবং একটা প্রধান ইঞ্জিন। সাধারণভাবে এই ইঞ্জিনগুলোকে মোটর বলা হল। দ্বিতীয় অংশে ছিল তরল জ্বালানীর দ্বারা চালিত একটি মোটর। রকেটের তৃতীয় অংশটাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এতে বসানো ছিল রাশিয়ার তৈরি একটি ক্রায়ো ইঞ্জিন। ক্রায়ো শব্দের অর্থ হল অতি শীতল। ক্রায়ো ইঞ্জিনের মধ্যে অতি শীতলতায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তরল অবস্থায় রাখা থাকে। তরল অক্সিজেনের সাহায্যে তরল হাইড্রোজেন জ্বালিয়ে এই ইঞ্জিন শক্তি উৎপাদন করে। এই কারণে এই ইঞ্জিনের নাম ক্রায়ো ইঞ্জিন।

(২)

১৯৯২ সালে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ২৩৫ কোটি টাকার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে রাশিয়া ভারতকে বেশ কয়েকটি ক্রায়ো ইঞ্জিন এবং সেই ইঞ্জিন তৈরি করার কারিগরি ভারতকে হস্তান্তর করতে সম্মত হয়। কিন্তু আমেরিকা সেই চুক্তি কার্যকর করতে বাধা দেয় এবং বলে যে, এই চুক্তি কার্যকর করলে 'মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম' (এম টি সি আর) নামক আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘিত হবে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ রকেট বা মিসাইল তৈরি করতে সক্ষম তারা এম টি সি আর চুক্তির মাধ্যমে অঙ্গীকার করেছিল যে, এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোন দেশ অন্য দেশের হাতে রকেট তৈরির কারিগরি তুলে দেবে না।

আজ বহু ক্ষেত্রেই এই চুক্তি লঙ্ঘিত হচ্ছে। তবুও আমেরিকা তাতে বাধা দিল। কারণ, আমেরিকা ভয় পেল যে, এই প্রযুক্তি হাতে পেলে ভারত ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক

মিসাইল (আই সি বি এম) তৈরি করে ফেলবে এবং সামরিক দিক দিয়ে অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

যাই হোক, আমেরিকার বাধা দানের ফলে রাশিয়া ভারতকে ক্রায়ো ইঞ্জিনের প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করল। বদলে শুধু রাশিয়ার তৈরি ৭টি ক্রায়ো ইঞ্জিন সরবরাহ করতে রাজি হল। এইভাবে রাশিয়া থেকে কেনা একটা ক্রায়ো ইঞ্জিন উপরিউক্ত জি এস এল ভি—ডি-২ রকেটে ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৮ এপ্রিল বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে জি এস এল ভি—ডি-১ রকেটের প্রথম অংশে অগ্নিসংযোগ করার ১৬০ সেকেণ্ডের মধ্যে তা ৭২ কিমি ওপরে উঠে গেল এবং তখন তার গতিবেগ দাঁড়ালো প্রতি সেকেণ্ডে ২.৬ কিমি। এরপর প্রথম অংশটা আলাদা হয়ে ভারত মহাসাগরে পড়ল এবং দ্বিতীয় অংশটা কাজ শুরু করল। এই দ্বিতীয় অংশ ১৫০ সেকেণ্ড কাজ করে রকেটটিকে ১১৫ কিমি ওপরে তুলল এবং তখন তার গতিবেগ দাঁড়াল প্রতি সেকেণ্ডে ৩.৯৬ কিমি। এরপর কাজ শুরু করল তৃতীয় অংশ এবং তার ক্রায়ো ইঞ্জিন। ৩১৪ সেকেণ্ড ধরে কাজ করে ক্রায়ো ইঞ্জিন তাকে ১৯৫ কিমি উচ্চতায় তুলে দিল এবং তখন তার গতিবেগ দাঁড়ালো প্রতি সেকেণ্ডে ১.২ কিমি। এরপর তৃতীয় অংশটা আলাদা হয়ে ইন্দোনেশিয়ার কাছে সমুদ্রে পড়ল। বাকি থাকলে চতুর্থ অংশ যার মধ্যে ছিল জিস্যাট-১ যোগাযোগ উপগ্রহ।

তারপর শুরু হল ভূ-পৃষ্ঠের কন্ট্রোল রুম থেকে জটিল বিভিন্ন যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, যা এক সপ্তাহ ধরে চলবার পর জিস্যাট-১ উপগ্রহ ৩৬,০০০ কিমি উচ্চতায় বৃত্তাকার পথে পৃথিবীতে পাক খেতে থাকল। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে রুশ স্পেস এজেন্সী 'গ্লাভকস্‌মস'-এর চেয়ারম্যান এ আই ডুনায়েড বলেন, "এই সফল উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত বিশ্বের এক অন্যতম অন্তরীক্ষ শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করল। এরকম আর কয়েকটি উৎক্ষেপণের পর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিশ্ব বাজারে ভারতের প্রবেশ কেউই আটকাতে পারবে না।" ইউরোপের 'অ্যারিয়ান' মহাকাশ সংস্থার বাণিজ্যিক বিভাগের অধিকর্তা ডিডিয়ার অবিন বলেন, 'ভারতের পক্ষে এটা এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এর দ্বারা ভারতীয়রা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা যা করবে বলে একবার মনস্থ করে তা তারা করে দেখায়। তারা সময় নেয় বটে, তবে দেখিয়ে দেয় যে, সাফল্য লাভে তারা সক্ষম।'

আগেই বলা হয়েছে যে, উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিশ্ব বাজারে পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি ডলার। এই অঙ্ক ক্রমশই বাড়ছে, কারণ বিভিন্ন টেলিফোন কোম্পানী, অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থা ও ব্যাঙ্ক, সবাই মহাকাশে নিজ নিজ উপগ্রহ স্থাপন করতে চাইছে। বর্তমানে উপগ্রহ উৎক্ষেপণের বিশ্ব বাজারের প্রায় ৬০ শতাংশ দখল করে আছে ইউরোপের অ্যারিয়ান। তারপরই আমেরিকা ও রাশিয়ার স্থান। চীনও জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অগ্রবর্তীদের ধরে ফেলতে।

এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, ইসরো-র বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি, দেশীয় কারিগরি ও দেশীয় উপকরণ দিয়ে এই সব বিশাল বিশাল রকেট তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক বাজারের থেকে অর্ধেকেরও কম দামে এই সব রকেট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে আকাশে উপগ্রহ তোলা এবং তাকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা আজ একটা আন্তর্জাতিক ব্যবসা। তাই পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র আজ তাদের উপগ্রহ সস্তায় কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য ভারতীয় রকেট ব্যবহার করতে এগিয়ে আসছে।

মাস দুয়েক আগে আমেরিকার বিদেশ সচিব শ্রীমতী হিলারি ক্লিনটন যখন ভারত সফরে আসেন তখন ভারত ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার ফলে আমেরিকা তার উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ভারতের রকেট ব্যবহার করতে পারবে। সেই উপগ্রহ আমেরিকার নিজস্ব রকেট দিয়ে কক্ষপথে স্থাপন করতে যে খরচ পড়বে, ভারতীয় রকেট দিয়ে তার তিন ভাগের এক ভাগ খরচে করা যাবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ইসরো-র চেয়ারম্যান শ্রী মাধবন নায়ার বলেন যে, ইসরো জি এস এল ভি-এমকে ৩ পর্যায়ের যে রকেট ২০১০ সালে তৈরি করেছে তার ফলেই অনেক কম টাকায় উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে উপগ্রহ ব্যবহারকারীরা ৪ টন ওজনের বড় বড় উপগ্রহের দিকে ঝুঁকছে। এখানে টন বলতে মেট্রিক টন বুঝতে হবে, যার মান ১০০০ কেজি। কিন্তু ভারতের জি এস এল ভি-র ক্ষমতা হল বড় জোর ২ টন ওজনের উপগ্রহকে আকাশে তোলা। তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভারত খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে তেমন একটা সুবিধা করতে পারবে না। এর থেকেও বড় কথা হল, ইসরো আজ নিজেই ৪ টন ওজনের বড় উপগ্রহ তৈরি করতে শুরু করেছে এবং সেইসব উপগ্রহকে উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোকেই হয়তো বিদেশী কোন রকেটের সাহায্য নিতে হবে। তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের অধিকর্তা মাধবন নায়ার বলেন, 'ব্যবসায়িক সাফল্য পেতে গেলে আমাদের উৎক্ষেপণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে অবশ্যই ৪ টন করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে খরচও কমাতে হবে। বিদেশী খরিদ্দরাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, আমাদের উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা যেমন নির্ভরযোগ্য, তেমনই সস্তা।'

কিন্তু ইসরোকে শক্তিশালী সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে হলে যেটা প্রয়োজন তা হল, মূলধন বিনিয়োগ। সুদক্ষ বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদের অভাব আমাদের নেই। অভাব হল টাকার। তাই শ্রীডিডিয়ার অবিন বলেন, ''ইসরোর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন শুধু টাকার।'' বাস্তবিক পক্ষে টাকার অভাবের জন্যই ইসরোকে অনেক সময় 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণ করতে হচ্ছে। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, বর্তমানে বাৎসরিক ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ইসরোকে তার কাজকর্ম সীমিত রাখতে হচ্ছে। সেই তুলনায় আমেরিকা 'নাসা'র বাৎসরিক

বাজেট হল ১,৫০০ কোটি ডলার। এবং ইউরোপের অ্যারিয়ানের বাজেট হল বাৎসরিক ৫০০ কোটি ডলার।

প্রায় ২৫ বছর হল, ইসরো বিভিন্ন ধরণের উপগ্রহ এবং তাদের মহাকাশে পাঠানোর মতো উপযুক্ত রকেট তৈরির কাজে রত হয়েছে। এই ২৫ বছরে ইসরো প্রথম বারের মতো জি এস লে ভি—ডি-১ রকেটে ক্রায়ো ইঞ্জিন ব্যবহার করেছে। রাশিয়ার তৈরি ইঞ্জিনই সেখানে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ক্রায়ো ইঞ্জিন নিজে তৈরি করতে পারলে ইসরো রকেট তৈরির কারিগরিতে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে। এই কারণে ইসরোর বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা রাশিয়ান ইঞ্জিনের আদলে সম্পূর্ণ দেশীয় উপকরণের সাহায্যে ক্রায়ো ইঞ্জিন তৈরি করার কাজে হাত দেন।

প্রায় ৭ বছর পরিশ্রম করে তাঁরা যে ক্রায়ো ইঞ্জিনটি তৈরি করেন, ২০০০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কন্যাকুমারীর কাছে মহেন্দ্রগিরিতে অবস্থিত ইসরোর 'লিকুইড প্রোপালশন সিস্টেম সেন্টার'-এ তা পরীক্ষা করা হয়। শুধু এই দেশের মানুষ নয়, অন্যান্য অনেক দেশের বিজ্ঞানীরাও অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছিল, এই পরীক্ষার ফলাফল কি হয় জানার জন্য। কারণ এই পরীক্ষার সাফল্য ভারতকে বিশ্বের এক অন্যতম অন্তরীক্ষ শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে।

ভারতের রকেট বিজ্ঞানীরা ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকেই ক্রায়ো ইঞ্জিনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই ইঞ্জিনের কারিগরি যোগাড় করার জন্য আমেরিকা ও ফ্রান্সের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের খালি হাতেই ফিরতে হয়। ভারতকে তাই অগত্যা তৎকালীন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হতে হয়। এরই পরিণতি হিসাবে ১৯৯২ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ১৩৫ কোটি টাকার চুক্তি হয়, যা আগেই বলা হয়েছে।

যাই হোক, ১৬ ফেব্রুয়ারির সেই পরীক্ষার দিন ইঞ্জিনটি খুব ভালভাবেই কাজ করতে শুরু করল। ইঞ্জিনটির চলার কথা ছিল ৩০ সেকেন্ড, কিন্তু ১২ সেকেণ্ড চলার রপর তা থেমে গেল। দেখা গেল যে, ইঞ্জিনটিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য জলস্রোতের যে ব্যবস্থা ছিল তাতে কিছু ত্রুটি হয়েছিল। ফলে ইঞ্জিনটি অত্যধিক গরম হয়ে যায় এবং ইঞ্জিনের স্বয়ংক্রিয় সেফ্‌টি ডিভাইস তাকে থামিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু 'ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজ প্রোডাক্ট'-এর অধিকর্তা শ্রী ভি জ্ঞানগান্ধী একে বিফলতা বলে মানতে নারাজ। তিনি সাংবাদিকদের বললেন, "আমরা অকৃতকার্য হয়েছি তা আমি কখনোই স্বীকার করব না। বরং দেখতে পাচ্ছি যে, শতকরা ৭৫ ভাগেরও বেশি আমরা সাফল্য লাভ করেছি।" তিনিও আরও বলেন, "অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা যতখানি সাফল্য দিয়েছে তা চমকপ্রদ।"

'বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার'এর অধিকর্তা শ্রীমাধবন নায়ার বললেন, "ইঞ্জিনটি ১২ সেকেন্ড চলার ফলে প্রায় ৮০০ রকমের বিভিন্ন তথ্য নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এর

ফলেক্রটি দূর করার কাজ অনেক সহজ হবে।" তিনি আরও বলেন, "এইসব তথ্য ব্যবহার করে আমরা হয়তো রাশিয়ান ইঞ্জিনের থেকে আরও উন্নততর ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলতে পারবো।" এখানে বলে রাখা উচিত যে, যদি ভারতীয় বিজ্ঞানীরা উন্নত মানের ক্রায়ো ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলতে পারেন তবে তাঁদের পক্ষে ৪ টন ওজনের উপগ্রহ আকাশে তোলার মতো শক্তিশালী রকেট তৈরি করা সম্ভব হবে। ফলে ভারত মহাকাশ সংক্রান্ত বিশ্ব বাজারের বড় অংশীদার হয়ে উঠতে পারবে। বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়ার ভাণ্ডারে এমন রকেট মজুত আছে যা এক সঙ্গে ৮ থেকে ১৬টি উপগ্রহ মহাকাশে তুলতে সক্ষম। ভারতের অন্তিম লক্ষ্য হল সেই রকম শক্তিশালী রকেট তৈরি করা। তবে সুখের কথা হল, এ বছর (২০০২) ফেব্রুয়ারি মাসে সাফল্যের সঙ্গে সেই ক্রায়োজনিক ইঞ্জিনটির পরীক্ষা সমাপ্ত করেছেন। ফলে ওই ইঞ্জিনের জটিল কারিগরিও আমাদের বিজ্ঞানীদের করায়ত্ব হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে, ১৯৭৫ সালে আর্যভট্র উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মধ্যে দিয়ে ইসরো তার যাত্রা শুরু করেছিল। প্রথম থেকেই ইসরোর কাজ ছিল দুটি ধারায় বিভক্ত। প্রথমত বিভিন্ন ধরণের উপগ্রহ তৈরি করা এবং দ্বিতীয়ত, ওই সব উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করার মতো শক্তিশালী মহাকাশযান বা রকেট তৈরি করা। ১৯৮২-৮৩ সালের মধ্যেই ইসরো উপগ্রহ তৈরির ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে পেরেছে এবং ইনস্যাট শ্রেণীর যোগাযোগ উপগ্রহ তৈরি করেছে। এরপর ১৯৮৭ সালে ইসরো 'আই আর এস' শ্রেণীর অত্যাধুনিক দুরাণুমান (বা রিমোট সেন্সিং) উপগ্রহ তৈরি করে।

কিন্তু রকেট তৈরির ব্যাপারে ইসরো প্রথমবারের মতো বড় রকমের সাফল্য অর্জন করে ১৯৯৭ সালে। ওই বছর ইসরো পি এস এল ভি—সি-১ রকেট সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করে আই আর এস-১ ডি উপগ্রহকে মহাকাশের কক্ষে স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত জিস্যাট-১ উপগ্রহকে জি এস এল ভি—ডি-১ রকেটের সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করে ইসরো ভারতকে বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আর একটি বিরাট সাফল্য হল অ্যান্টি-মিসাইল ডিফেন্স শিল্ড তৈরি করা। কোন শত্রু দেশ যদি ভারতকে লক্ষ্য করে রকেটের সাহায্যে পরমাণু বোমা দিয়ে আঘাত করতে আসে তবে ভারত অন্য একটি রকেট (ইন্টারসেপটিয়িভ মিসাইল) দিয়ে তাকে আকাশেই আঘাত করে বিনষ্ট করা সম্ভব হবে। বিগত ৯০-এর দশকে পাকিস্তান ও চীনের পরমাণু বোমার সম্ভাব্য আক্রমণ ভারতকে চিন্তিত করে তোলে। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতের পক্ষে অ্যান্টি-মিসাইল শীল্ড তৈরি করা জরুরি হয়ে পড়ে।

এই বছর (২০১২) ৬ই মে তারিখে পি টি আই-র একটি সংবাদে প্রকাশ যে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, দিল্লী ও মুম্বাই শহরকে অ্যান্টি-মিসাইল শীল্ড দ্বারা সুরক্ষিত করা হবে, যা তে কোন শত্রু দেশ এই দুই শহরকে পরমাণু বোমাবাহী মিসাইল দিয়ে আঘাত করতে

না পরে। ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ওর্গানাইজেশন (বা ডি আর ডি ও) দ্বারা উদ্ভাবিত এই প্রযুক্তি বহুবার সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করার পর তা আজ সুরক্ষার কজে ব্যবহৃত হতে চলেছে। যে কোন একটি ২০০০ কিমি বা তার বেশি পাল্লার মিসাইলকে এই প্রযুক্তির দ্বারা একটি ইন্টারসেপটিং মিসাইল দিয়ে আকাশেই ধ্বংস করে ফেলা যাবে। যে পৃথ্বী মিসাইল তৈরি করা হয়েছিল, তার কিছু রদ বদল করেই তাকে ইন্টারসেপটিং মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

বিগত ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে ডি আর ডি ও-র বিজ্ঞানীরা এই অ্যান্টি-মিসাইল শীল্ড সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করেন। ঐ দিন বঙ্গোপসাগরের একটা জাহাজ থেকে একটা আক্রমণকারী মিসাইল উৎক্ষেপণ করা হয় এবং উড়িষ্যার উপকূল থেকে ইন্টারসেপটিং মিসাইলটি উৎক্ষেপণ করা হয়, যা ঐ আক্রমণকারী মিসাইলটিকে আকাশেই আঘাত করে ধ্বংস করে দেয়। এই সঙ্গে সঙ্গে ভারত মিসাইল তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকা, রাশিয়া ও ইস্রাইলের সমকক্ষ হয়ে ওঠে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়।

এখন পর্যন্ত ইসরো মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কাজেই রত রয়েছে। তবে এই কাজের জন্য সে যে সমস্ত রকেট উদ্ভাবন করেছে তার গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবহার সম্ভব। এখন পর্যন্ত অগ্নি-২ হল ভারতের সর্বাপেক্ষা কার্যকর মিসাইল। এই অগ্নি-২ মিসাইল ৮০০ কেজি ওজনের কোন পারমাণবিক বোমা দিয়ে ২০০০ থেকে ২৫০০ কিমি দূরের কোন লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে সক্ষম। তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের ঘাউরি ও শাহিন মিসাইলের ক্ষমতা হল অনুরূপ পারমাণবিক বোমা দিয়ে ১৫০০ থেকে ২০০০ কিমি দূরের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করা।

কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের পি এস এল ভি এবং জি এস এল ভি শ্রেণীর রকেটকে সামরিক মিসাইল হিসাবে ব্যবহার করলে তা ২ টন ওজনের ভারি হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে ৫০০০ থেকে ৬০০০ কিমি দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করতে সক্ষম হবে। ফলে সমগ্র চীন, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সহ আফ্রিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার অংশ বিশেষ এর আওতার মধ্যে এসে যাবে। এই ক্ষমতা যে ভারতকে বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ সামরিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। উপরন্তু এই ক্ষমতা শত্রু ভাবাপন্ন প্রতিবেশী দেশগুলোর মনেও ভীতির সঞ্চার করবে।

এ বছর (২০১২) ১৯শে এপ্রিল উড়িষ্যার হুইলার দ্বীপ থেকে সকাল ৮টা ৭ মিনিটে উৎক্ষেপণ করা হোল ভারতের প্রথম ইন্টারকান্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল (বা আই সি বি এম) অগ্নি-৫। সাড়ে ১৭ মিটার লম্বা, ২ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট ৫০ টন ওজনের রকেটটি মাথায় দেড় টন ওজনের একটা নকল বোমা নিয়ে উঠে গেল ৪০০ কিমি ওপড়ে তার পর

আবার নেমে এসে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে আঘাত হানল৫০০০কিমি দূরে ভারত মহাসাগরে রাখা লক্ষ্য বস্তুকে। এই মিসাইলের পাল্লার মধ্যে এসে গেল পুরো চীন ভূখণ্ড, পুরো মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব ইউরোপের সব দেশ। এর সঙ্গে সঙ্গে ভারত উঠে গেল চীন সহ অল্প কয়েকটি আই সি বি এম শক্তিধর দেশগুলোর একজন সম্মানীয় সদস্য হিসাবে।

পুরো চীন দেশ আওতার মধ্যে এসে যাওয়ায় চীনা নেতা ও বিশেষজ্ঞরা তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে শুরু করে দিল। চীনের সেনাবাহিনীর (পি এল এ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার প্রধান শ্রী ডু ওয়েনলঙ বললেন যে, ভারত যা করেছে তাকে বিশ্বের কাছে কম করে দেখাচ্ছে। তাঁর মতে অগ্নি-৫ ৮০০০ কিমি দূরের লক্ষ বস্তুকে আঘাত করার ক্ষমতা রাখে।

শ্রী ঝ্যাঙ ঝাওঝঙ হলেন চীনা সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমীর প্রফেসর। তিনি গ্লোবাল টাইমস্ নামক এক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন যে, অগ্নি-৫ এর পাল্লা তো ৮০০০ কিমি হবেই এবং এমন কি বিশেষ কিছু রদবদল করে এর পাল্লা ৮০০০ কিমির বেশিও করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, অগ্নি-৫-কে নিয়ে ভারতের খুব একটা দম্ভ করার তেমন কোন কারণ নেই। চীনের কাছে যে অস্ত্র ভাণ্ডার মজুদ আছে তা ভারতের নেই। তিনি আরও বলেন, ‘ভারতের এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা উচিত যে, চীনের পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার ভারতের থেকে অনেক শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য।

ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের মহা উত্থান ঃ

'ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং সিস্টেম' হল ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা। এ বছর (১৯৯৯) মার্চ মাসে এই পত্রিকা বিশ্বের সফটওয়ার প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বের ব্যাংকগুলোর কাছে যে সংস্থা যত বেশিটাকা সফটওয়ার বিক্রি করেছে, সেই হিসাবে তাদেরতালিকায় সাজানো হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ব্যাংগালোরের 'আই-ফ্লেক্স সলিউশন' নামক সংস্থার 'ফ্লেক্সিকিউব' নামক সফটওয়ার স্থান পেয়েছে তালিকার শীর্ষে। গত ১৯৯৮ সালে 'আই-ফ্লেক্স' এই উন্নত সফটওয়ারটি উদ্ভাবন করে, যা বর্তমানে বিশ্বের ৫০টি দেশের ১২০টি বৃহৎ বাংক ব্যবহার করছে। কেনিয়ায় এই 'ফ্লেক্সিকিউব' এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে, সেখানকার শতকরা ৮০টি ব্যাংক তা ব্যবহার করছে। শুনলে প্রত্যেক ভারতীয়র মনে গর্ব হবে যে, বিশ্বের তাবড় তাবড় আন্তর্জাতিক ব্যাংক এবং 'ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড' বা 'আই এম্ এফ' ও ব্যাঙ্গালোরর এই 'ফ্লেক্সিকিউব' ব্যবহার করছে।

গত ২০০২ সালে মুম্বইয়ের শেয়ার বাজারে 'আই-ফ্লেক্স'-এর শেয়ারের দাম ছিল ৫০০ টাকা। মাত্র এক বছর পরে, ২০০৩ সালের মার্চ মাসে, তা বেড়ে ৯০০ টাকা হয়। অর্থাৎ, এক বছরের মধ্যে ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি। এই একটি উদাহরণ থেকেই অনুমান করা চলে যে, বর্তমানে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যবসা কেমন চলছে। বিশাল টাকার ব্যবসা, বিশাল অঙ্কের বরাত এবং অবিশ্বাস্য অংকের মুনাফায় এই ব্যবসা আবার ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। বিগত ২000 সালে আমেরিকা ও ইউরোপে মন্দার কারণে এই ব্যবসা কিছুটা মার খায়। আগে যেখানে বছরে ৫০ শতাংশ হারে ব্যবসা বাড়ছিল, সেই বৃদ্ধির পরিমাণ হঠাৎ ২০ শতাংশে নেমে আসে। তবে বর্তমান তেজি ভাব দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সেই মন্দা কাটিয়ে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের পুনরুত্থান শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই পুনরুত্থানের ফলেই গত বছর সফটওয়ার রপ্তানির পরিমাণ পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ৮০০ কোটি ডলার বা ৩৮,৪০০ কোটি টাকার অংকে পৌঁচেছে।

গত নয়ের দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় সংস্থাগুলি যখন তথ্য প্রযুক্তির ব্যবসায় নামে, তখন তাদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল 'আই বি এম', 'ই ডি এস', বা 'ওরাকল্'-এর মতো বিশাল বিশাল মার্কিন বহুজাতিকের সঙ্গে। কিন্তু সস্তায় আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা

দিতে সমর্থ হওয়ার দরুণ তাদের ব্যবসা খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। উপরন্তু, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ১০ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানও এতে সাহায্য করে। এই সময়ের ব্যধানের ফলে আমেরিকার সংস্থাগুলি সেখানে যখন রাত্রি তখন ভারতীয় সংস্থাগুলির কাছে তাদের সমস্যা জানাতে সক্ষম হয়। অপরদিকে, আমাদের সংস্থাগুলি আমেরিকায় ভোর হওয়ার আগেই সমাধানগুলি পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু ২০০০-০১ সালে যখন আমেরিকায় মন্দা দেখা দিল, তখন তার ধাক্কা আমাদের কোম্পানিগুলির ওপরেও এসে লাগল। এর প্রায় বছরখানেক পরে আমেরিকায় মন্দার ভাব কেটে গেল। তারা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল। কিন্তু এর মধ্যে প্রতিযোগিতা এত বেড়ে গিয়েছে যে কত সস্তায় কত ভালো কাজ পাওয়া যায় সেটাই তাদের সমস্যা হিসেবে এখন দেখা দিয়েছে।

ভাগ্যগুণে আমাদের সংস্থাগুলি তাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হওয়ার ফলে ভারতে আবার ব্যবসার জোয়ার দেখা দিয়েছে। ভারতের পাঁচটা সংস্থার সঙ্গে তাদের বিশাল অঙ্কের বাণিজ্যিক চুক্তি হয়েছে। ভারতের এই পাঁচটা সংস্থা হল, 'টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস' বা 'টি সি এস', 'ইনফোসিস টেকনোলজিজ', 'উইপ্রো টেকনোলজিজ', 'সত্যম কমপিউটার সার্ভিসেস' এবং 'এইচ সি এল টেকনোলজিজ'। এই পাঁচটা সংস্থা ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির প্রায় ৪০ শতাংশ ব্যবসা দখল করে রয়েছে। একা টিসিএসই গত বছর ১০০ কোটি ডলারের কাজ রপ্তানি করেছে।

এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে জোয়ার লেগেছে, তার আজ সবে শুরু। ভবিষ্যতে তা এত বিশাল আকার নেবে যে আজ আমাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হল বিদেশের, বিশেষ করে আমেরিকার বিশাল বিশাল বহুজাতিক সংস্থাগুলো আজ দলে দলে ভারতে আসতে শুরু করেছে। বিগত সাতের ও আটের দশকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানীগুলি তাদের কাজকর্মের বহুলাংশে এশিয়ায়, বা বিশেষ করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তর শুরু করেছিল। এর প্রধান কারণ ছিল, এশিয়ার সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন-ব্যয় কমানো। এর ফলেই, সেই সময় মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের কপাল খুলে গিয়েছিল। এশিয়ার চার বাঘ হিসাবে তাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই একই কারণে, আজ তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটারের বহুজাতিক পাশ্চাত্য সংস্থাগুলি দলে দলে এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে আসতে শুরু করেছে।

মাত্র বছর তিনেক আগে, এই একবিংশ শতাব্দীরে শুরুতে, ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি ছিল তথ্য প্রযুক্তির ব্যস্ততম কেন্দ্র। সানফ্রান্সিসকোর দক্ষিণে অবস্থিত এই 'হাইটেক' অঞ্চল ছিল বিশাল এক জমজমাট ব্যবসা কেন্দ্র। কিন্তু আজ সেই জায়গার অবস্থা যেন জনমানবহীন শূন্যপুরীর মতো। রাতে বেজি ও দিনেরবেলায় কাঠবিড়ালীর অবাধ বিচরণ

ক্ষেত্র। যেসব বাড়িতে ছিল জমজমাট অফিস, আজ সেই সব বাড়ির সামনে ঝুলছে 'ভাড়াটে চাই' বিজ্ঞাপন। যে সান্তাক্লারা শহরে এক বর্গফুট মেঝের ভাড়া ছিল ৬.৫ ডলার, আজ তা নেমে এসেছে ১ ডলারে। তা সত্ত্বেও ভাড়াটে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকে বিনা ভাড়াতেই ঘরবাড়ি ছেড়ে দিতে রাজি। বাড়িটা অন্তত পরিচ্ছন্ন থাকবে।

কিন্তু বাঙ্গালোরের দিকে তাকালে দেখা যাবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র। সেখানে 'উইপ্রো' কোম্পানি ১৫৮ একর জমির ওপর গড়ে তুলেছে 'ইলেকট্রনিক্স সিটি', যেখানে মাথা তুলছে নিত্যনতুন অট্টালিকা, আর কাজ করছে ৬,৫০০ কর্মী। উইপ্রোর মোট ১৩,০০০ কর্মীর মধ্যে অর্ধেক কাজ করছে এই ইলেকট্রনিক্স সিটিতে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান মাত্র দুবছর পরে, ২০০৫ সালে এই কর্মী সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে প্রায় ২০,০০০ হবে।

কিন্তু পৃথিবী বিখ্যাত 'মাইক্রোসফট' যেখানে অবস্থিত, সেই রেডমন্ড শহরের অবস্থা এতটা খারাপ নয়। কারণ, মাইক্রোসফটের হাতে রয়েছে দুটি সফটওয়ার, 'উইন্ডো' ও 'অফিস'-এর একচেটিয়া কারবার। যার ফলে সে বছরে ১০০ কোটি ডলারের ব্যবসা করছে। বর্তমানে এ সংস্থার যে অর্থ ব্যাংকে জমা আছে তার পরিমাণ ৫,০০০ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই অর্থ মালিক বিল গেটস পাশ্চাত্যে বিনিয়োগ করবে না। বিনিয়োগ করবেন এশিয়ায়। এমনও হতে পারে যে, পুরো টাকাটা তিনি শুধু ভারতেই বিনিয়োগ করে ফেলতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের মত হল, কারিগরির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যর এরকম স্থানান্তর কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক টিমোথি বেসনাহান বলেন, "কমপিউটারের কারিগরি যেমন পালটেছে, তেমনই পালটেছে তার মূল কেন্দ্র। বড় বড় কমপিউটারের যুগে কেন্দ্র ছিল নিউ ইয়র্ক। কমপিউটার যখন ছোট আকার নিল, তখন তার কেন্দ্র চলে গেল বস্টনে। তেমনি পার্সোনাল কমপিউটারের জন্ম হল ফ্লোরিডা ও হিউস্টনে, কিন্তু তার ব্যবসা কেন্দ্র চলে গেল সিলিকন ভ্যালিতে।"

যদিও বিশেষজ্ঞরা তথ্যপ্রযুক্তির পশ্চিম থেকে পূর্বে স্থানান্তরকে এক স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন, কিন্তু এই স্থানান্তরের ফলে সিলিকন ভ্যালির বৃহৎ সংস্থাগুলো প্রায় ডুবতে বসেছে। বর্তমান আর্থিক বছরে 'সিবেল' Siebel ও 'সান' Sun-এর মতো দুই সার্থক সংস্থাও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফলাফল করেছে।

অনেকে মনে করেন যে, প্রথম দিকে (১) সফটওয়ার নির্মাণ, (২) তথ্যপ্রযুক্তি ও (৩) অফিস পরিচালনা পৃথক তিনটি বিভাগ ছিল, কিন্তু আজ আর তা নেই। তিনটি ক্ষেত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। ফলে সব সংস্থাকেই তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্রের লোক রাখতে হচ্ছে। ফলে কর্মী সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু বর্তমানে প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে এত বেশি কর্মী রাখা পাশ্চাত্যের সংস্থাগুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই সস্তা কর্মীর খোঁজে তারা ভারতে আসছে। তারা দেখছে যে, একজন দক্ষ আমেরিকান কর্মীকে যে বেতন দিতে হয়, তার চার ভাগের একভাগ

বেতনে সমান দক্ষতার ভারতীয় কর্মী পাওয়া যায়। তাই ভারতে এসে ব্যবসা করলে উৎপাদন ব্যয় দুই-তৃতীয়াংশ কমানো সম্ভব।

এর ফল হিসেবেই বছর দুই-তিন আগে সিলিকন ভ্যালির ছোট ছোট কিছু সংস্থা প্রথমে ভারতে আসতে শুরু করে। সেই পথ ধরে আজ আমেরিকার বিশাল বিশাল বহুজাতিক সংস্থাগুলোও ভারতে আসতে শুরু করে দিয়েছে। মাস দুই আগে, গত জুলাই মাসে, মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি 'ওরাকল' ঘোষণা করেছে যে, ভারতের দুটো শাখা সংস্থায় কর্মীসংখ্যা তিন হাজার থেকে বাড়িয়ে ছ'হাজার করা হবে। এর দুটো শাখার মধ্যে একটা ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, 'ওরাকল' হল 'মাইক্রোসফট'-এর মতোই একটি বৃহৎ সংস্থা, এবং এর কর্মকর্তারা আশা করেন যে, 'অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা 'মাইক্রোসফট'-কে ছাড়িয়ে যাবেন।

সেই রকম 'মাইক্রোসফট'-ও সম্প্রতি ভারতে তাদের কাজকর্ম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার এক ব্যাপক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। আমেরিকার আর এক বৃহৎ সফটওয়ার সংস্থা হল 'অ্যাক্সেনচার' (Accenture)। সম্প্রতি এই সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, ভারতে তার কাজকর্ম ব্যাপকভাবে বাড়াবে এবং কর্মীসংখ্যা চার হাজার থেকে তিনগুণ বাড়িয়ে ১২,০০০ করা হবে। 'জেনারেল ইলেকট্রিক' বা 'জিই' হল অফিস নিয়ন্ত্রণের সফওয়ার তৈরি করার সংস্থা। বিগত দু-তিন বছরের মধ্যে ভারতে কাজকর্ম বাড়ানোর জন্য কর্মীসংখ্যা বাড়িয়ে তারা ১১,০০০ করেছে। এইভাবে ক্রমশ-অধিক থেকে অধিকতর মার্কিন সংস্থা তাদের ব্যবসার আংশিক বা পুরোটাই ভারতে স্থানান্তর করতে শুরু করেছে।

প্রধানত দু'ভাবে তারা ভারতে কাজ করছে। ছোট ও মাঝারি সংস্থাগুলি প্রধানত পুরো কাজটাই কোনও ভারতীয় সংস্থাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। আর বড় সংস্থাগুলি ভারতের মাটিতে নিজেদের শাখা-সংস্থা তৈরি করে কিংবা কোনও ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে মিলেমিশে যৌথ সংস্থা তৈরি করে কাজ করছে। ভারতীয় কোনও নামী সংস্থাকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা যে একেবারে হচ্ছে না, তা বলা যায় না। কয়েক মাসে আগে বৃহৎ মার্কিন সংস্থা 'ই ডি এস' ভারতীয় নামী সংস্থাকে 'সত্যম' জানিয়ে দেয় যে, তারা তাদের কোম্পানিকে কারও কাছে বিক্রি করবে না।

এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা উচিত হবে, বিশ্বের বর্তমান কারিগরি একটা বিশেষ পর্যায়ে উন্নত হতে পেরেছে বলেই মার্কিন সংস্থাগুলির পক্ষে ভারতে আসা সম্ভব হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে উপগ্রহের মাধ্যমে অতি দ্রুত সংবাদ ও তথ্যাদির আদান-প্রদানের সুযোগ। ভারত যে সমস্ত 'জিও-স্টেশনারি' বা পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির থাকার উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে, তারাও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান উত্থানের পিছনে আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীদেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

এ ব্যাপারে আর এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের অবদানও স্মরণ করা কর্তব্য। বিগত নয়ের দশকের শেষের দিকে যখন আমেরিকা ও ইউরোপে তথ্যপ্রযুক্তির প্রথম জোয়ার আসে, তখন ভারত থেকে অনেক কমপিউটার বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ বিদেশে চলে যান। এবং অনেক বড় বড় সংস্থায় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। কিন্তু ২০০০ বা ২০০১-এর মন্দার সময় তাঁরা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। ভারতীয় কোম্পানিগুলি তখন এঁদের অভিজ্ঞতার ফলে লাভবান হয়। অত্যাধুনিক কারিগরি, বিশ্বমানের পরিষেবা এবং বৃহৎ আকারের প্রকল্প নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে ভারতীয় সংস্থাগুলি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

বর্তমানে ভারতের শহরগুলির মধ্যে বাঙ্গালোর হয়ে উঠেছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যস্ততম কেন্দ্র। গতবছর ভারত যে ৮০০ কোটি ডলার মূল্যের সফটওয়ার বিদেশে রপ্তানি করেছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ রপ্তানি হয়েছে এই শহর থেকে। এই শহরের সংস্থা 'ইনফোসিস' একাই গত ২০০১-০২ আর্থিক বছরে ২,৬০৩ কোটি টাকার সফটওয়ার রপ্তানি করে। পরের বছর তা বেড়ে, ৩,১৯৫ কোটি টাকা হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সংস্থা ১৯৯৩ সালে ১০ টাকা দামের শেয়ার বাজারে ছেড়ে প্রথম যখন ভারতীয় পুঁজি-বাজারে প্রবেশ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মুম্বইয়ের শেয়ার বাজারে সেই শেয়ারের দাম হয় ৯৫ টাকা। এবং যে সমস্ত ভাগ্যবান তখন ৯,৫০০ টাকা বিনিয়োগ করে ১০০ শেয়ার কিনেছিলেন, দশ বছর বাদে আজ ২০০৩ সালে তার দাম চড়তে চড়তে হয়েছে ৫৯,৬৩,০০০ টাকা।

এই একটি উদাহরণ থেকেই অনুমান করা চলে যে, ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়ারের ব্যবসা কীভাবে বেড়েছে বা বাড়ছে। যে ব্যবসা ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩৩ কোটি ডলার বা ১, ০২০ কোটি টাকা নিয়ে যাত্রা করেছিল, আজ ২০০২-২০০৩ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,২৫০ কোটি ডলার বা ৫৮,০০০ কোটি টাকা, যা ভারতের মোটর গাড়ি শিল্পের সমান। এই শিল্পে আজ পর্যন্ত সরাসরি সাত লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে, যার প্রায় সবটাই বেশি বেতনে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ পেয়েছেন আরও বেশ কয়েক লক্ষ যুবক যুবতী। আজ এই শিল্প হয়ে উঠেছে দেশের সর্বপ্রধান সম্পদ সৃষ্টিকারী ক্ষেত্র এবং দেশের আর্থিক অগ্রগতির সর্বপ্রধান সহায়। তার থেকেও বড় কথা হল, ভারতের এই শিল্প বিশ্বের সর্বোন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লড়ে বড় হয়েছে। যা বলা যেতে পারে যে, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। এবং এর জন্য ভারতের সকল মানুষের কাছে তা এক গর্বের বিষয়।

সব শেষে বলা যায় যে, মহাকাশ গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি, এই দুই ক্ষেত্রকে বলা চলে 'হাইটেক' বা সর্বাধুনিক কারিগরির ক্ষেত্র। এবং এই দুই ক্ষেত্রেই ভারতের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা এক কথায় অভাবনীয়। এই সাফল্য যে ভারতকে আর্থিক দিকে সমৃদ্ধ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে সঙ্গে তা সকল ভারতীয় মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান ফিরিয়ে দেবে। দীর্ঘ পরাধীনতার অবসাদ ও হীনন্মন্যতা বা Colonial hang-over থেকে তাদের মুক্ত হতে সাহায্য করবে।

ভারতে গৃহনির্মাণ শিল্পের বিস্ময়কর উত্থান

আজ থেকে ৭/৮ বছর আগের কথা। দিল্লির কয়েকটা হোটেলের মালিক হরলাল সিংহ ছেলেকে সঙ্গে করে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশের সীমানায় অবস্থিত গাজিয়াবাদ এলাকায় গিয়েছেন। 'গাজিয়াবাদ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' সেখানে একটি আবাসন কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছে। তৈরি করেছে ১৩৫২টি ফ্ল্যাট। কিন্তু একটাও বিক্রি হচ্ছে না। হরলালের উদ্দেশ্য হল, কী করে ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি করা যায় এবং তা থেকে দু'পয়সা রোজগার করা যায়।

জায়গাটা তখন ছিল প্রায় জঙ্গল। মাথা সমান হোগলার বন। হঠাৎ তাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল একটা সাপ। হরলাল ছেলেকে বলল, "এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ। আমরা সব ফ্ল্যাটগুলোই কিনে নেব।" যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর ফ্ল্যাটগুলো কিনতে হল না। গাজিয়াবাদ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র সঙ্গে তাঁর এক চুক্তি হল এবং ঠিক হল তাঁরা যৌথভাবে ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি করবেন। হরলাল প্রথমে ফ্ল্যাটগুলোর কিছুটা অংশ বদল করালেন এবং দাম কিছুটা কমিয়ে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেল। এরপর থেকে হরলাল সিংকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। ইতিমধ্যে ওই এলাকায় তিনি ১২,০০০ ফ্ল্যাট তৈরি করে বিক্রি করেছেন। তাঁর কোম্পানি 'শিপ্রা এস্টেট' গত ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট ৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। গতবছর সেই ব্যবসা ফুলে ফেঁপে প্রায় ১০০ কোটি টাকা হয়েছে।

হরলাল সিং-এর মতোই কৃতিত্বের অধিকারী দিল্লির উপকণ্ঠে গুরগাঁও-এর প্রোমোটার কে পি সিং। তিনিও এ পর্যন্ত ১২,০০০ ফ্ল্যাট তৈরি করে বিক্রি করেছেন। তাঁর আশা, আগামী ৫ বছরে তিনি আরও ১২,০০০ ফ্ল্যাট বিক্রি করবেন। দিল্লির আরএক শহরতলির নাম সূরজ কুণ্ড। সেখানকার ডেভেলপার কোম্পানী 'এরস্ গ্রুপ' গত এক বছরে, ১,৩০০ ফ্ল্যাট বিক্রি করে ২০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। মুম্বই শহরের 'হিরানন্দানী কনস্ট্রাকশন' হল তিনটি শহরতলি পাওয়াই, থানে ও বেরসোবা-র এবং 'নির্মল লাইফস্টাইল' হল মুলুন্দ এলাকার প্রোমোটার। গত বছর তারা যত ফ্ল্যাট তৈরি করেছিল, তা সবই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। পাঁচ বছর আগে হিরানন্দানী-র বাৎসরিক ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৭৫ কোটি টাকা। গত বছর তা বেড়ে ৩২৫ কোটি টাকা হয়েছে। "নির্মল লাইফ স্টাইল"-ও গত বছর প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা ব্যবসা করেছে।

'কুমার বিল্ডার্স' হল পুনার ললিত কুমার জৈন-এর প্রোমোটারি সংস্থা। বর্তমানে পুনা তার ২২টা আবাসন প্রকল্পে কাজ চলছে, যার সব ফ্ল্যাট বিক্রি হলে ২৫০ থেকে ৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা হবে। কলকাতার সুমিত দাব্রিওয়ালা-র 'ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন গ্রুপ' গত বছর ৯৯১টি ফ্ল্যাট তৈরি করেছে, যার মধ্যে ৮৫০টি ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। "হাইল্যান্ড পার্ক প্রজেক্ট" নামে পরিচিত এইসব আবাসনের ফ্ল্যাটগুলোর দাম ১৪ লাখ ৫০ হাজার থেকে শুরু করে ৬০ লাখ টাকা। এইসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মুম্বই-এর 'নির্মল লাইফস্টাইল'-এর মালিক ধর্মেশ জৈন বলেন, "গত ৫ বছরে ডেভেলপার ও কনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলোর ব্যবসা অন্ততপক্ষে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।"

বর্তমানে বাঙ্গালোর হয়ে উঠেছে কমপিউটার বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির পীঠস্থান। ফলে সেখানে তৈরি হয়েছে এক শ্রেণীর কর্মী, যাদের হাতে আসছে প্রচুর কাঁচা পয়সা। যাদের বয়স এখনও ৩০ পার হয়নি, তারাও করছে মোটা মাইনের চাকরি। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেখানে বাড়ছে বসতবাড়ী বা ফ্ল্যাটের চাহিদা। সেখানকার প্রেমোটার কোম্পানি 'প্রেস্টিজ গ্রুপ'-এর ব্যবসা গত ২০০২-০৩ বছরে ২০০ কোটি টাকা অতিক্রম করে গিয়েছে। চেন্নাই-এর ডেভেলপার কোম্পানি 'চৈতন্য বিল্ডার্স'-এর এম ডি রমেশ কুমার রেড্ডি বলেন, "এখানে এখন ১৫ লাখ থেকে ৬৫ লাখ টাকা দামের ফ্ল্যাটে ভালো চাহিদা রয়েছে এবং আমাদের ব্যবসাও বাড়ছে।" এইসব বড় বড় শহরগুলির মতো কোয়েম্বাটুর, হায়দরাবাদ বা আমেদাবাদের মতো ছোট শহরগুলোতেও রমরমিয়ে চলছে প্রোমোটারি ব্যবসা। তৈরি ও বিক্রি হচ্ছে হাজার হাজার ফ্ল্যাট, হাজার হাজার বাড়ি।

কারা কিনছে এইসব বাড়ি ও ফ্ল্যাট? তিন চার বছর আগেও দেখা যেত যে, বয়স্ক লোকেরাই এইসব ফ্ল্যাট কিনতে আসছে। তখন ক্রেতাদের গড় বয়স ছিল ৪৪ বছর। কিন্তু আজ সেই গড় বয়স ৩০-এ নেমে এসেছে। কারণ অনেক অল্পবয়সী যুবক, যাদের বয়স এখনও ৩০ পার হয়নি, তারাও ফ্ল্যাট কিনতে আসছে। এইসব অল্পবয়সীরা যে শুধু সম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য ফ্ল্যাট বা বাড়ি কিনছে তা নয়। তাদের নজর হল জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, একটু ভালোভাবে, একটু আয়েসিভাবে থাকা।

কিভাবে বাড়ছে এই গৃহনির্মাণ শিল্প? প্রথমত, যারা এইসব বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনছে, তাদের বেশিরভাগই চাকুরিজীবী। তারা গৃহ-ঋণ নিয়েই এসব কিনছে। জমি কেনা থেকে শুরু করে বাড়ি তৈরি করা, অথবা ফ্ল্যাট কেনার জন্য গৃহঋণ দেওয়ার সব থেকে বড় ভারতীয় সংস্থা হল 'হাউসিং ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইনান্স কর্পোরেশন' বা 'এইচ ডি এফ সি'। পাঁচ বছর আগে এই সংস্থা যে পরিমাণ গৃহঋণ দিয়েছিল তা ছিল ৩,৪২৫ কোটি টাকা। গত বছর তা বেড়ে ৯,৯৫১ কোটি টাকা হয়েছে। গত ২০০১-০৩ সালে বিজয়া ব্যাংক মোট গৃহঋণ দিয়েছিল ৬৬ কোটি টাকা। মাত্র এক বছর পরে, ২০০২-০৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪৮২

কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে গৃহঋণের পরিমাণ বেড়েছে ৭ গুণেরও বেশি। বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা ও ব্যাংকগুলো গত ২০০০-০১ আর্থিক বছরে মোট গৃহঋণ দিয়েছিল ২০০০ কোটি টাকা। মাত্র দু'বছরের মধ্যে ২০০২-০৩ আর্থিক বছরে তা বেড়ে ৬৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। বিশেষজ্ঞের অনুমান, বর্তমান আর্থিক বছরে তা ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯০,০০০ কোটি টাকা হবে।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে মুম্বইয়ের 'হিরানন্দানী কন্ট্রাকশন'-এর মালিক নিরঞ্জন হিরানন্দানী বলেন, "২০০১-০২ সাল থেকে ২০০২-০৩ সালের মধ্যে গৃহনির্মাণ শিল্পের বাজার ১৩,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬৫,০০০ কোটি টাকা হয়েছে। এবং আমার অনুমান, আগামী ৫ বছরের মধ্যে তা বেড়ে ১,২০,০০০ কোটি টাকা হবে।" গত বছর প্রায় ১৫ লক্ষ শহরবাসী এবং সমগ্র দেশের ৫০ লক্ষ মানুষ নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, ৫ বছর পরে এই সংখ্যা ৩ কোটি হবে। কাজেই গৃহনির্মাণের এই জোয়ার চলতে থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে তা বন্ধ হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই।

এত অল্প সময়ের মধ্যে গৃহনির্মাণ শিল্পে এই বিস্ফোরণ কেন হল? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হল, প্রথমত, দেশের মানুষের সচ্ছলতা বেড়েছে। ঋণ করে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা বেড়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ওমান কনস্যালট্যান্ট'-এর ডিরেক্টর রাজীব কুমার বলেন, "গত ১৯৯৭ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কর্মীদের বেতন আড়াই থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতাও বেড়েছে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে বেতন বেশি বেড়েছে তা হল, টেলি যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি, আর্থিক সংস্থা ও ব্যাংক।" তিনি আরও বলেন, "বর্তমানে ভারতের ২৫ লক্ষ পরিবারের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকা অতিক্রম করেছে। এই সচ্ছলতা বৃদ্ধি কারণে তারা বেশি টাকার ফ্ল্যাট কিনতেও ইতস্তত করছে না। আগে তারা বার্ষিক আয়ের ৩ থেকে ৪ গুণ দামের ফ্ল্যাট খুঁজত। কিন্তু বর্তমানে তারা বার্ষিক আয়ের ১০ থেকে ১২ গুণ দামের বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনছে।"

দ্বিতীয় কারণ হল, গৃহঋণের সুদের হার। গত ১৯৯৯ সালে এই সুদের হার ছিল ১৬.৫ শতাংশ, কিন্তু আজ তা ১০ শতাংশে নেমে এসেছে। সুদের হার হ্রাস পাওয়ার ফলে আরও বেশি বেশি লোক গৃহঋণ নিতে আসছে। ফলে ঋণের মোট পরিমাণ বাড়ছে (সারণি দ্রষ্টব্য)। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আয়করের রেহাই। বাৎসরিক সুদের পরিমাণ (১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত) আয় থেকে বাদ যাচ্ছে। উপরন্তু মূল ঋণের পরিশোধের পরিমাণের (৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত) ২০ শতাংশ আয়কর রেহাই পাওয়া যাচ্ছে। তাই গৃহঋণ নিতে লোকের উৎসাহ বাড়ছে।

তৃতীয় কারণ হল, শিল্পপতিরা ব্যাংকগুলো থেকে তেমন বেশি ঋণ না নেওয়ার ফলে ব্যাংকের টাকা জমে যাচ্ছে। তাই তারা সেই টাকা গৃহঋণ ক্ষেত্রে লগ্নী করছে। ফলে গৃহঋণ

দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে বাঙ্গালোরের বাসিন্দা এস মঞ্জুনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, ‘‘বাঙ্গালোর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আমার নামে একটা জমি ন্যাস্ত (allot) করে। এরপর থেকে গৃহঋণ দেওয়ার ৭টি সংস্থা আমার পিছনে ঘুরতে থাকে। একটি সংস্থা প্রস্তাব দেয় যে, তাদের লোক রবিবার আমার বাড়িতে এসে কাগজপত্র দেখবে এবং তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করবে।” যাঁরা ঋণ নিচ্ছেন, তাঁরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, তেমনি ঋণ দেওয়ার সংস্থাগুলোরও ব্যবসা বৃদ্ধি হচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গত ৫ বছরে এই সংস্থাগুলোর ব্যবসা ৩০ থেকে ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

একদিকে বেতন বৃদ্ধির ফলে আর্থিক সচ্ছলতার বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কম সুদে সহজ ঋণ, এর ফলেই অল্পবয়সী যুবকরাও গৃহঋণ নিতে এগিয়ে আসছেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাঁদের মতে, গৃহনির্মাণ শিল্পে বর্তমান জোয়ারের আর একটি কারণ হল, লোকের আয় বাড়ছে, কিন্তু সেই তুলনায় জমি-জায়গা, বাড়ি ঘর ইত্যাদি সম্পত্তির দাম তেমন বাড়ছে না। অনেকের মতে তা কমছে। এইচ ডি এফ সি'র মতে, ১৯৯৭-৯৮ এর তুলনায় বিষয় সম্পত্তির (real estate) দাম ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ কমেছে।

গৃহনির্মাণ শিল্পে এই জোয়ারের ফলে শুধু যে প্রোমোটার, ডেভেলপার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রী, এরাই লাভবান হচ্ছে তা নয়। লাভবান হচ্ছে সিমেন্ট ও ইস্পাত শিল্প, লাভবান হচ্ছে জমি-জায়গা ইত্যাদির মধ্যস্থতাকারী সংস্থাগুলো, লাভবান হচ্ছে ইন্টেরিয়র ডেকরেটর কোম্পানিগুলো। আর লাভবান হচ্ছে আসবাবপত্র তৈরি করার সংস্থা ও ছুটোর মিস্ত্রীরা। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে চেন্নাই-এর ডেভেলপার রমেশ কুমার রেড্ডি বলেন, ‘‘লোকেরা নতুন বাড়ি বা নতুন ফ্ল্যাটে যখন ঢুকছে, তখন তারা তাদের আসবাবপত্র ও গৃহস্থালীর সাজসরঞ্জামের বেশির ভাগ অথবা পুরোটাই ফেলে দিয়ে সব আবার নতুন করে কিনে নতুন বাড়িঘর সাজাচ্ছে। ফলে এই সমস্ত আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রেও ব্যবসা বাড়ছে।”

তিনি আরও বলেন, ‘‘এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, যাঁরা বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনছেন, তাঁরা তা বসবাস করার জন্যই কিনছেন। ভাড়া দিয়ে রোজগার বাড়ানো বা দাম বাড়লে বেচে দেওয়ার জন্য কিনছেন না। তাই গৃহ নির্মাণের মূল ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে আনুষঙ্গিক এইসব ক্ষেত্রের ব্যবসা।” আরও বড় কথা হল, মূল গৃহনির্মাণের শিল্পেরসঙ্গে এই আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের ব্যবসা যোগ করলে দেখা যাবে যে, গত বছর এই শিল্পে ১,০০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হয়েছে।

‘‘গৃহনির্মাণ শিল্পে এই জোয়ার দেশের সিমেন্ট শিল্পকেও চাঙ্গা করে তুলেছে”, বলেন গুজরাট অম্বুজা সিমেন্ট কোম্পানির অফিসার কিরণ নন্দ। তিনি আরও বলেন, ‘‘গত বছর দেশে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদন হয়েছে, যার ১৬ থেকে ১৭ শতাংশ, অর্থাৎ

প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন সিমেন্ট গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে বিক্রি হয়েছে।" সেই রকম, গত বছর দেশে ইস্পাৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। এবং এর প্রায় ২৫ শতাংশ, বা ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

আসবাবপত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের মধ্যে লোকেরা অনেক দামি দামি জিনিসও ব্যবহার করছেন, যেমন ইতালির বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, জার্মানির বাথরুম সরঞ্জাম, আরও কত কি। অনেকে মার্বেলের মেঝে পছন্দ করছেন, তাই তৈরি হয়েছে দেশি ও বিদেশি মার্বেলের এক বিশাল বাজার। আর কিনছেন চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার জন্য অত্যাধুনিক সুরক্ষা সরঞ্জাম। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'গোদরেজ অ্যান্ড বয়েস' কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটার মেহেরনস লিথাওয়ালা বলেন, "বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের হাই-টেক সুরক্ষা সামগ্রীর বিক্রি বছরে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে।"

সব থেকে বড় প্রশ্ন হল, গৃহনির্মাণ শিল্পের এই তেজিভাব কতদিন বজায় থাকবে? বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আগামী ৫ বছর এই তেজিভাব থাকবেই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর কী হবে? এ ব্যাপারে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মত হল, সুদের হার বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং তা আরও কমতে পারে। চাকুরিজীবীদের বেতনও বাড়বে বই কমবে না। কাজেই জমি-জায়গার দাম যদি তেমন না বাড়ে তবে গৃহনির্মাণ শিল্পের এই তেজিভাবও চলতে থাকবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, যদি দেশের সম্পদ বা 'জি ডি পি' অন্ততপক্ষে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, তবে গৃহনির্মাণ শিল্পের তেজিভাবও বজায় থাকবে।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে আরও দু-একটি কথা বলা সঙ্গত হবে। দেশের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ছে বলেই যে গৃহনির্মাণ শিল্পের এই উত্থান শুরু হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই বলা যায় যে, দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে বলেই গৃহনির্মাণ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবসা-বাণিজ্যের চমকপ্রদ বৃদ্ধি হচ্ছে। দেশের সার্বিক অর্থনীতি যে সবল হচ্ছে তার আর একটি প্রমাণ হল, বর্তমানে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য বাড়ছে। এ বছরের গোড়ার দিকে ১ ডলারের মূল্য ৫০ টাকা ছুঁই ছুঁই করছিল। আজ তা ৪৫ টাকায় নেমে এসেছে। উপরন্তু, গত ২৫ সেপ্টেম্বরের 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া'র একটি খবর বলছে যে, ভারত সরকার 'ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড' বা 'আই এম এফ'-কে টাকা ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। এটা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির আরেকটা প্রমাণ।

সকলেই স্বীকার করবেন যে, সতীনের শ্রীবৃদ্ধি কোনও মহিলার পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হয় না। তাই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশের এই আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী নেতাদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। জ্বালা হওয়ারই কথা। অন্যান্য কুচক্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদীরা কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের

বিরুদ্ধে অর্থিক দুর্নীতি আরোপ করতে কত চেষ্টাই করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনও অভিযোগকেই দাঁড় করাতে পারলেন না। এখন তাঁরা বলতে শুরু করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার জন-বিরোধী, তাই তাকে এখনই ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে হবে। কিন্তু কেন কেন্দ্রীয় সরকার জন-বিরোধী, তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। সব থেকে বড় কথা হল, কমরেডরা যতই চেঁচান না কেন, দেশের লোকের বুঝতে বাকি নেই, কারা দুর্নীতিগ্রস্ত, কারা সরকারি টাকা আত্মসাৎ করে এবং ক্ষমতা থেকে কাদের টেনে নামানো দরকার।

সারণী

বছর	শতকরা সুদের হার	মোট গৃহঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১৯৯৯	১৬.৫০	১১,৩৫২
২০০০	১৫.০০	১৯,৭২৩
২০০১	১৩.২৫	২২,৪২৫
২০০২	১২.৫০	২৭,৩৫৯
২০০৩	১০.০০	৪৫,০০০

উৎকর্ষতার জন্যই ভারতীয় পণ্য আজ বিশ্বমানে উঠতে পেরেছে

'মাইকেলিন' হল আমেরিকার একটি বহুজাতিক টায়ার কোম্পানী। বছর তিনেক আগে ওই কোম্পানী চীনে একটি টায়ারের কারখানা স্থাপন করবে বলে স্থির করে। টায়ার তৈরি করতে কার্বন-ব্ল্যাক নামে একটি উপাদান লাগে। রবারের সঙ্গে কার্বন-ব্ল্যাক মিশিয়ে টায়ার তৈরি করা হয়। আমাদের বিড়লাদের কিছু কোম্পানীকে একসঙ্গে 'আদিত্য বিড়লা গ্রুপ' বা 'এ ভি বিড়লা গ্রুপ' বলা হয়ে থাকে। এই 'এ ভি বিড়লা গ্রুপ' তাদের থাইল্যাণ্ড, মিশর ও মালয়েশিয়ার কারখানায় ওই কার্বন-ব্ল্যাক তৈরি করে। বর্তমানে 'মাইকেলিন' আদিত্য বিড়লাদের কার্বন-ব্ল্যাক বহুল পরিমাণে ব্যবহার করছে এবং তার গুণমানে 'মাইকেলিন'-এর কার্যকর্তারা খুবই সন্তুষ্ট।

তাই চীনে কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর 'মাইকেলিন'-কর্মকর্তারা আদিত্য বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী কুমারমঙ্গলম্ বিড়লাকে চীনে গিয়ে একটা কার্বন-ব্ল্যাক তৈরি করার কারখানা খুলতে বললেন। এবং তার তৈরি কার্বন-ব্ল্যাক দিয়েই তাঁরা চীনে টায়ার তৈরি করবেন বলে জানালেন। তাঁদের অনুরোধে কুমার মঙ্গলম্ বিড়লা চীনের একটি কার্বন-ব্ল্যাক তৈরি করার কোম্পানী কিনে ফেললেন। তার নাম দিলেন 'বিড়লা লিয়াওনিং কার্বন-ব্ল্যাক কোম্পানী'। এর ফলে কুমারমঙ্গলম্ বিড়লা হয়ে গেলেন পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম কার্বন-ব্ল্যাক প্রস্তুতকারী। আর 'মাইকেলিন'ও নিশ্চিন্তে বিড়লাদের কার্বন-ব্ল্যাক ব্যবহার করে টায়ার উৎপাদন করাতে শুরু করে দিল।

আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যের একটি শহরের নাম 'ক্যালহৌন'। এই শহরের লোকেরা গতবছর ১২ই মে দিনটি উৎসব আনন্দ করে কাটায়। কারণ আমাদের মাহীন্দ্র এন্ড মাহীন্দ্র কোম্পানী 'ক্যালহৌন'-এ যে ট্র্যাক্টর তৌরি করার কারখনা স্থাপন করেছে, তা ১২ মে তারিখে উৎপাদন শুরু করেছিল। 'মহীন্দ্র এ্যান্ড মহীন্দ্র' কোম্পানীর ট্র্যাক্টর আজ জর্জিয়ার তো বটেই, আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। চেন্নাই-এর টি ভি এস কোম্পানীর মোটরবাইক আজ চীনে এতটা জনপ্রিয় হয়েছে যে, কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রী বেনু শ্রীনিবাসন গতবছর চীনে মোটরবাইক তৈরি করার একটি কারখানা স্থাপন করেন। সেইরকম 'ইস্পাৎ অ্যালয়' গ্রুপের চেয়ারম্যান শ্রী প্রমোদ মিত্তাল লিবিয়ার একটি ইস্পাৎ তৈরির কারখানা স্থাপন করেন পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ভারতীয় ইস্পাতের চাহিদা পূরণ করার জন্য। গত বছর (২০০৩ খ্রীঃ) এই কারখানা কাজ শুরু করেছে এবং সেখানে বছরে ২০ লক্ষ টন ইস্পাৎ তৈরি হবে।

ভারতীয় ওষুধ কোম্পানীগুলোর তৈরি ওষুধ আজ এত সুনাম অর্জন করেছে যে আমেরিকা ও ইয়োরোপের দেশগুলোর ডাক্তাররাও তাদের রোগীদের ভারতীয় কোম্পানীর তৈরি ওষুধ ব্যবহার করতে বলছেন। এই বাড়তি চাহিদা পূরণ করতে 'র‍্যানব্যাক্সি' ও 'ওকহার্ট'-এর মত ভারতীয় কোম্পানীগুলো বৃটেন ও আমেরিকার বেশ কয়েকটি ওষুধের কারখানা কিনে সেখানে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানে তাদের ৫০ থেকে ৭০ ভাগ আয় বিদেশের এইসব কারখানার তৈরি ওষুধ বিক্রী করে আসছে। এই সব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'র‍্যানব্যাক্সি' কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ভি এস ব্রার বলেন, "ভারতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে আজ চিন্তা-ভাবনার এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা ক্রমেই ভারতের বাইরে ব্যবসা বিস্তৃত করার জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। ভারতীয় পণ্যের গুণগত উৎকর্ষতার জন্যই তা সম্ভব হচ্ছে।" সেই রকম 'এসার (ESSAR) গ্রুপ'এর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী রবি রুইয়া বলেন, "ভারতীয় পণ্যসামগ্রী আজ তার উৎকর্ষতার জন্যই সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় নিজের স্থান করে নিতে পারছে।"

এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় পণ্যের সুখ্যাতি আজ সর্বত্র। 'হিরো' সাইকেল সংস্থা গত ১৯৮৪ সালে 'হিরো-হোন্ডা' নামে মোটরবাইক তৈরি শুরু করে। সেই 'হিরো-হোন্ডা' মোটরবাইক উৎকর্ষতায় জাপানের 'হোন্ডা' মোটরবাইককেও আজ অতিক্রম করে সারা বিশ্বে সব থেকে বেশি বিক্রীর মোটরবাইকে ও হিরো-হোন্ডা কোম্পানী' বিশ্বের সব থেকে বড় মোটরবাইক কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ এই মোটরবাইক ব্যবহার করছে। গত বছর এই কোম্পানী ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার মোটরবাইক রপ্তানী করেছে এবং কোম্পানীর মোট রপ্তানী ১০০ কোটি ডলার বা ৪৫০০ কোটি টাকা অতিক্রম করে গিয়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'হিরো-হোন্ডা'র চেয়ারম্যান শ্রী ব্রিজমোহন লাল মুঞ্জাল বলেন, "ভারতের প্রথম চার-স্ট্রোকের বাইক CD-100 দিয়ে কোম্পানী তার যাত্রা শুরু করেছিল। আজ আমাদের 'স্প্লেন্ডার' হয়েছে বিশ্বের সব থেকে বেশি বিক্রীর মোটরবাইক।"

ভারতে তৈরি পণ্যের আজ এতই সুখ্যাতি যে, গুরগাঁও-এর অশোক কাজারিয়ার কোম্পানী কাজারিয়া সেরামিক্স্ লিমিটেড হয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মেঝের টাইলস তৈরি করার কোম্পানী। বিশ্বের বৃহত্তম ১২টি কম্পিউটার কোম্পানী ব্যবহার করছে ভারতের 'মোসার বেয়ার' কোম্পানীর 'কমপ্যাক্ট ডিস্ক' বা সি ডি। মহীন্দ্র এ্যান্ড মহীন্দ্র কোম্পানীর ট্র্যাক্টর দখলকরে নিয়েছে মেক্সিকো দেশটির পুরো বাজার। এই কোম্পানীর 'স্কর্পিয়ো' গাড়ী প্রচুর পরিমাণে বিক্রী হচ্ছে ইতালি ও স্পেন-এর মত দেশে। পৃথিবীর মানুষ প্লাস্টিকের টিউব টিপে যে দাঁতের মাজন ক্রীম বার করছে, সেই সব তিনটি টিউবের মধ্যে একটি টিউব তৈরি করেছে ভারতের 'এসেল প্রোপ্যাক' (Essel Propack) কোম্পানী। বাজাজ কোম্পানীর 'পালসার' আজ মেক্সিকোর মানুষের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মোটরবাইক। ভারতের বি সি এল কোম্পানীর তৈরি অ্যাল্‌কালাইন ব্যাটারি আজ এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে গতবছর এই কোম্পানী

১০ কোটি ব্যাটারি রপ্তানী করতে পেরেছে। বালকৃষ্ণ গোয়েঙ্কাদের ছিল পারিবারিক চাল ও গমের ব্যবসা। বছর তিনেক আগে তারা স্থির করল যে, তোয়ালে তৈরি করে বিদেশে রপ্তানী করবে। তারা আজ কম দামে এত ভাল তোয়ালে তৈরি করছে যে, সারা বিশ্বে তা আদৃত হচ্ছে। ফলে তারা মাল তৈরি করে সারতে পারছে। যে অর্ডার তাদের হাতে আছে তাতে আগামী দু-বছর তাদের নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকবে না।

বর্তমান এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন আর্থিক উদারীকরণ এবং বিশ্বায়ন চালু করা হল, তখন অনেকেই ভয় পেয়েছিল যে, বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে ভারতীয় শিল্পের অকাল মৃত্যু হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল হয়েছে উল্টো। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, বা শুধু অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মারিয়া হয়ে, ভারতীয় কোম্পানীগুলো তাদের পণ্যের উৎকর্ষতা এতটা বাড়িয়ে ফেলল যে, ভারতে তৈরি, বা 'Made in India' ছাপ বিশ্বের মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হল। ফলে ভারতীয় পণ্য বিশ্ব বাজারে তার স্থান করে নিল। এবং বাড়তে থাকল ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী।

গত ২০০২-০৩ অর্থিক বছরে ভারতের ১০০টা বৃহত্তম কোম্পানী মোট ব্যবসা করেছিল ৭০,০০০ কোটি টাকার। কিন্তু বর্তমান ২০০৩-০৪ সালে ১৬টি বড় কোম্পানীর প্রত্যেকে রপ্তানী করেছে ৫০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের পণ্য। অর্থাৎ প্রথম ৩১টা কোম্পানী রপ্তানী করেছে মোট ২৩,৫০০ কোটি টাকার পণ্য। পরবর্তী ১৫০ টা কোম্পানীর প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানী করেছে। শুধু লৌহ-ইস্পাৎ ক্ষেত্রেই মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকা অতিক্রম করে গিয়েছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ভারতীয় ইস্পাৎ সব থেকে বেশি রপ্তানী হচ্ছে চীনে। গত বছর (২০০৩ খ্রীঃ) বিশ্ববিখ্যাত 'ফোর্বস্' কোম্পানী বিশ্বের ১৮টি কোম্পানীর একটি তালিকা প্রকাশ করে, যারা বছরে ১০০ কোটি ডলার (বা ৪,৫০০ কোটি টাকা) বা তার বেশি ব্যবসা করেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ওই তালিকার ১৮টি কোম্পানীর মধ্যে ১৩টি ছিল ভারতীয়। অবশ্য ইনফোসিস বা সত্যম্ কমপিউটারের মত কোম্পানীগুলোকে এ তালিকায় রাখা হয়নি।

তাই প্রশ্ন হল—ভারত এই জায়গায় পৌঁছালো কি করে। বিশেষজ্ঞদের মত হল, আর্থিক উদারীকরণ এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মরণপণ চেষ্টাই ভারতীয় শিল্পকে আজ বিশ্ব বাজারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর সঙ্গে অন্যান্য যে সব কারণগুলো কাজ করেছে তা হল, ব্যাংকের সুদের হার হ্রাস করা, লাইসেন্স-রাজ এর অবসান ঘটানো, আমদানীশুল্ক হ্রাস করা, সংস্থার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ দূর করা এবং কর্মী সঙ্কোচন করা। গত ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশেষজ্ঞরা বলতেন যে, আর্থিক উদারীকরণের ফলে ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মার খাবে। কিন্তু শুধুমাত্র কর্মী সঙ্কোচ করে সেই ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকে গেল। ওই সময় টাটা কোম্পানী তার লৌহ-ইস্পাৎ শিল্পের ৩০,০০০ কর্মী সঙ্কোচ করে (ভি আর এস-এর মাধ্যমে)। ফলে টাটা হয়ে ওঠে বিশ্বে সর্বাপেক্ষা কম খরচে ইস্পাৎ তৈরি করার সংস্থা। অন্য সব শিল্পের ক্ষেত্রেও এই কর্মী সঙ্কোচ চলতে থাকে।

ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতির একজন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ হলেন শ্রী সি কে প্রহ্লাদ। ব্যবসায়ী মহলে তাঁর 'ম্যানেজমেন্ট গুরু' বলে খ্যাতি আছে। এই সব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''নিজের দেশে সাফল্য ও সারা বিশ্বে সাফল্যের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তাই কোন কোম্পানী যদি নিজের দেশে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে, তবে সে বিশ্ব-বাজারেও টিকে থাকতে পারবে।' তিনি আরও বলেন, ''মূল কথা হল পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা, তাকে বিশ্ব-মানের উপযোগী করে তোলা। তা হলেই ভারতীয় শিল্প অসাধ্য সাধন করবে।''

কার্যক্ষেত্রে ঘটছেও তাই। টি ডি এস কোম্পানীর চেয়ারম্যান বেনু শ্রীনিবাসন তার ভিক্টর মোটরবাইকের গুণমান এতটাই উন্নত করে ফেলেছেন যে, জাপানের সুজুকি কোম্পানীর সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রীনিবাসনের জাপানী গুরু প্রোঃ ওয়াসিভ তাঁকে বলেছিলেন, ''যদি রপ্তানী বাড়াতে চাও তবে পণ্যের গুণমান বাড়াতে টাকা লাগাও। তাঁর কথামত কাজ করার ফলে টি ভি এস-এর মোটরবাইর, জাপানের মাটিতে জাপানের মোটর-বাইককে পরাস্ত করে জাপানের জাতীয় ''উৎকর্ষতা পদক'' (বা Quality Modal) নিয়ে নিয়েছে। এটা কম কথা নয়। টি ভি এস হল অ-জাপানী দ্বিতীয় কোম্পানী। যে এই সম্মান পেতে সমর্থ হল। প্রায় তিন বছর আগে শ্রীনিবাসন তাঁর সুন্দরম ক্লেটন ও টি ডি এস মোটরস নিয়ে বিশ্ব-বাজারে অবতীর্ণ হন। এই তিন বছরের মধ্যে সুদরম ক্লেটনের রপ্তানী ২.৫ কোটি টাকা থেকে বেড় ৫০ কোটি টাকা হয়েছে। এবং টি ভি এস মোটরের রপ্তানী ৩০ কোটি টাকা থেকে বেড় ১০০ কোটি টাকা হয়েছে।

এই উন্নতির পিছনে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও শ্রমিকদের বুদ্ধি ও দক্ষতা ভীষণভাবে কাজ করেছে। যখন ফোর্ড, হাইউন্ডাই, বেন্‌জ ও টয়োটার মত বিদেশী কোম্পানীগুলো ভারতীয় কারিগরদের দিয়ে তৈরি গাড়ী ভারত থেকে রপ্তানী শুরু করল, তখন ভারতে তৈরী ও অন্য দেশে তৈরি গাড়ীর মধ্যেকার পার্থক্য হল চোখে পড়ার মত। তাই যে কোম্পানীরই গাড়ী হোক না কেন, সেটা ভারতে তৈরি কি না, তা একটা বিশেষ মাত্রা তৈরি করল। ফলে আরও অনেক কোম্পানী তাদের গাড়ী ভারতে তৈরি করার জন্য, আর তা না হলে শুধু ভারত থেকে রপ্তানী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলে আজ দিল্লী, চেন্নাই, মাইশোর প্রভৃতি শহরে প্রায় ৫০টা বিদেশী গাড়ী কোম্পানী তাদের অফিস খুলে বসেছে। উদ্দেশ্য হল ভারত থেকে তাদের গাড়ী রপ্তানী করা। ভারতে তৈরি পণ্যের গুণমানের সুখ্যাতিই আজ এই বিশেষ সম্মান এনে দিয়েছে।

এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বর্তমান কেন্দ্রীয় এনডিএ সরকার দ্বারা গৃহীত আর্থিক নীতি। এই নতুন আর্থিক নীতির ফলে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে দ্রব্যমূল্য তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ফলে শিল্পের কাচা মালের দাম বাড়েনি। উপরন্তু ব্যাংকের সুদের হার কমাবার ফলে শিল্প সংস্থাগুলোর পক্ষে সস্তায় মূলধন যোগাড় করা সম্ভব হয়েছে। আগে যেখানে এই ব্যয় ছিল ১২ থেকে ১৪ শতাংশ, বর্তমানে তা কমে ৬ শতাংশ হয়েছে। এছাড়া রয়েছে রেল, স্বাস্থ্য ও জাতীয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ।

এই বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে শিল্পপণ্যের চাহিদা। আর সবার ওপড়ে রয়েছে বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার, যা বর্তমানে ১০,৩০০ কোটি ডলার বা ৪,৬৩,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই মুদ্রা ভাণ্ডার বাড়িয়েছে আত্মবিশ্বাস ও মনোবল।

এই সব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীকুমারমঙ্গলম বিড়লা বলেন, "বৌদ্ধিক সম্পদ ও উৎপাদন-ক্ষমতার মেলবন্ধনই ভারতকে বিশ্বের মানচিত্রে সম্মানজনক এক স্থান করে দিয়েছে। তাই ভারত যদি তার দক্ষ কারিগরদের না তৈরি করত তবে এই উন্নতি সম্ভব হত না।" প্রকৃতপক্ষে, ভারত প্রতি বছর ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ইঞ্জিনিয়ার, ২ লক্ষ ৫০ হাজার ডাক্তার, ৩৯ লক্ষ কলা বিভাগের স্নাতক, ১৭ লক্ষ বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার আইনের স্নাতক তৈরি করে চলেছে।

নতুন প্রজন্মের এই সব যুবক যুবতীদের মেধা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এঁরা যে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ, তা প্রায় সকলেরই জানা আছে। তার পরেই যেই ক্ষেত্রে এঁরা মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন তা হল ওষুধ নির্মাণ ক্ষেত্র। ভারতের এই সব নবীন বিজ্ঞানীরা যত তাড়াতড়ি কোন বিদেশী ওষুধের ফর্মুলা ধরে ফেলতে এবং অবিকল সেই রকম একটি বিকল্প বা generic ওষুধ তৈরি করতে পারে, তা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এর ফলে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানীগুলো বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নামকরা ওষুধের বিকল্প তৈরি করে সস্তায় (প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ দামে) বিক্রী করতে পারছে। এই ভাবে ভারতীয় সংস্থা র‍্যানব্যাক্সি, ওকহার্ট ও ডাঃ রেড্ডিজ ল্যাবরেটরি বিদেশী ফাইজার, মার্ক বা এলি লিলি-র মত বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীদের মেধার কথা বলতে গিয়ে 'ভারতফোর্জ' নামক সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রী বাবা কল্যাণী বলেন, "ধরা যাক নতুন কোন যন্ত্রাংশ তৈরির কথা। দেখা গেল কাজটা আমেরিকায় করতে গেলে কম করে ৫ জন ইঞ্জিনিয়ারের ৩ মাসের শ্রম দরকার এবং খরচ পড়বে ৫০ লক্ষ ডলার (বা ২২,৫০,০০০ টাকা)। অথচ সেই কাজটাই ভারতের কারিগরদের দিয়ে করিয়ে নিতে খরচ পড়বে জোর ১৫ লক্ষ টাকা।"

আজ সব রকম কাজের জন্যই ভারতীয় কারিগর রয়েছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা কারখানার নক্সা তৈরি করছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররাই নক্সা মাফিক সেই কারখানা গড়ে তুলছে, ভারতীয় কারিগররাই সেখানে উৎপাদন করছে, ভারতীয় বাণিজ্য স্নাতকরাই সব কিছুর হিসাব রাখছে, আর মামলা-মোকদ্দমা হলে ভারতীয় আইন-স্নাতকরাই তা সামলাচ্ছে। কাজেই কোন ক্ষেত্রে পরনির্ভরতার কোন সুযোগ নেই। আর এইসব নিজস্ব ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মীরাই ভারতীয় পণ্যকে বিশ্ব মানে উন্নীত করে তুলছে। সব শেষে বলা যায় যে, কেন্দ্রে যদি বর্তমান এন ডি এ সরকার আরও ৫ বছর ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পায় তবে ভারতবর্ষ বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান আর্থিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে।

ভারতীয় ওষুধ-নির্মাণ শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতের ওষুধ-নির্মাণ শিল্প বিদেশের বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর তুলনায় আজও অত্যন্ত দুর্বল। যতখানি বিনিয়োগ দরকার ততটা বিনিয়োগ এই শিল্পে হচ্ছে না। এবং এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কারণেই ভারতীয় কোম্পানীগুলোর পক্ষে মূল ওষুধ উদ্ভাবনের মত আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই আর্থিক দিক দিয়ে সবল না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প বা জেনেরিক ওষুধ তৈরি করে যাওয়াটাই হবে তাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। এ কাজে সাফল্য আসবেই, কারণ বিকল্প ওষুধের বিপুল চাহিদা রয়েছে। বিদ্যমান রয়েছে বিশ্বজোড়া এক বিশাল বাজার।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, 'সেপসিস্' (Sepsis) বা আঘাতজনিত কারণে ক্ষত এবং সেই ক্ষতের পচনক্রিয়ার ফলে আমেরিকায় প্রতি বছর ৩ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং আরও কয়েক লক্ষ মানুষের হাত-পা কেটে বাদ দিতে হয়। এর প্রতিকারের জন্য আমেরিকার বাজারে রয়েছে 'এলি লিলি'-র তৈরী একটি মাত্র ওষুধ। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ভারতের কোন কোম্পানী যদি এই রোগের একটা বিকল্প ওষুধ আমেরিকার বাজারে ছাড়তে পারে, তা হলে তা কত বড় সাফল্য পাবে। পৃথিবীর অনেক কোম্পানী আজ 'সেপসিস্'-এর একটা বিকল্প ওষুধ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতয়ী কোম্পানী 'ওক হার্ট'-এর বিজ্ঞানীরাও আওরঙ্গবাদের পরীক্ষাগারে দিন রাত ওই একই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' WHO-র মতে গত ২০০০ সালে পৃথিবীতে 'ডায়াবেটিস' বা বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ্য। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৩০ থেকে ৩২ কোটি হবে। বর্তমানে শহরবাসীদের মধ্যে আরও একটা উপসর্গ ব্যাপকভাবে বাড়ছে, তা হল অস্বাভাবিক মেদ বৃদ্ধি বা 'ওবেসিটি' (obesity)। অনেকের মত হল, ভারতীয়দের 'জিন' (gene)-এর গঠন পেটে মেদ বৃদ্ধিকে সাহায্য করে। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে, এই অস্বাভাবিক মেদ বৃদ্ধি বহুমূত্র রোগ হতে সাহায্য করে। কাজেই ভারতের কোন কোম্পানী যদি এমন কোন অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ আবিষ্কার করতে পারে, যা মেদ বৃদ্ধি ও বহুমূত্র দুটোকেই নিয়ন্ত্রণ করবে, তবে সেই ওষুধ যে অচিরেই বিশ্বব্যাপী এক বিশাল বাজার পাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যের ফাইজার, মার্ক, গ্ল্যাক্সো, এলি লিলি এবং স্মিথ-ক্লাইন-এর মত বহুজাতিক কোম্পানীগুলো এ রকম এক

অত্যাশ্চর্য ওষুধ উদ্ভাবন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। পাঠক হয়তো জেনে খুশী হবেন যে, মুম্বাইয়ের কোম্পানী 'গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস্' এই লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

দিল্লীর একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা তার সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলছে যে, বর্তমানে ভারতের প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগে আক্রান্ত। শহরবাসীদের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব বেশি, কারণ তারা শারীরিক পরিশ্রম করে খুব কম। বর্তমানে ৩০-এর নীচের যুবকরাও এর শিকার হচ্ছেন। এখন পর্যন্ত এই রোগের একমাত্র ওষুধ হল 'ইনসুলিন' (Insulin) যা রোজ ইঞ্জেকশন হিসাবে নিতে হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে বহু কোম্পানী চেষ্টা করছে যাতে ইনসুলিনের ট্যাবলেট তৈরি যায় এবং রোগীকে রোজ ইঞ্জেকশন নেবার কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া যায়। অনেকে আবার চেষ্টা করছে এমন এক অত্যাশ্চর্য ওষুধ বানাতে, যা খেতেও হবে না, শুধু নাকে গন্ধ নিলেই রোগের উপশম হবে।

'ফাইজার' কোম্পানীর বিজ্ঞানীরা ম্যাসাচুসেটস্-এর পরীক্ষাগারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই অত্যাশ্চর্য ওষুধ উদ্ভাবন করতে। সেই রকম 'গ্লেনমার্ক' কোম্পানীর নিউ মুম্বাইয়ের পরীক্ষাগারে সুদক্ষ ভারতীয় রসায়ন ও জৈব রসায়নবিদরাও ওই একই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর বড় বড় নামী কোম্পানীগুলোর মত কিছু কিছু ভারতীয় কোম্পানীও 'এইডস্' নামক মারণ রোগের প্রতিরোধক তৈরি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য অনেক কোম্পানী আবার আর এক মারণ রোগ 'হেপাটাইটিস C' (Hepatitis-C)-এর প্রতিষেধক তৈরি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু কিছু ভারতীয় কোম্পানী বিকল্প বা জেনেরিক ওষুধ তৈরি করার সাথে সাথে মূল ওষুধ উদ্ভাবনের কাজও করে যাচ্ছে। এই সব কোম্পানীগুলোকে বলা হয় 'নিউ কেমিক্যাল এন্টিটিস্' বা 'এন সি ই'। সেই বিচারে 'গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস্' একটি 'এন সি ই'। এই কোম্পানী মেদবৃদ্ধি ও বহুমূত্রের সঙ্গে সঙ্গে হাপানীরও একটি প্রতিষেধক উদ্ভাবনের চেষ্টা করে চলেছে। এবং এই কাজে গবেষণার পিছনে বছরে ২০ লক্ষ ডলার বা ৯ থেকে ১০ কোটি টাকা খরচ করে চলেছে। সেই রকম 'ডাঃ রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ'-ও একটি 'এন সি ই' এবং এই কোম্পানী বহুমূত্র, ক্যান্সার, জীবাণুর দ্বারা সংক্রমণ ইত্যাদির প্রতিষেধক তৈরি করার চেষ্টা করছে। এবং এই কাজে সে মোট ওষুধ বিক্রীর ৮ শতাংশ ব্যয় করে চলেছে। ইতিমধ্যে এই সংস্থা এমন কিছু যৌগ তৈরি করেছে যা মানুষের ওপর প্রয়োগ করার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।

'ওকহার্ট-এ একটি 'এন সি ই' এবং এই কোম্পানী প্রধানত ক্যান্সারের প্রতিষেধক তৈরি করতে বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করছে। ভারতের আর এক অন্যতম 'এন সি ই' হল র‍্যানব্যাক্সি। বিশেষ করে মূত্রাশয় ও কিডনি জনিত রোগের উপশমের জন্য ওষুধ উদ্ভাবন করার জন্য এই সংস্থা বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকা খরচ করে চলেছে।

নতুন ওষুধ উদ্ভাবন করার কাজটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একটা নতুন ওষুধ আবিষ্কার করতে প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর লাগে। আর খরচ পড়ে ৫০ থেকে ৬০ কোটি ডলার বা ২,২৫০ থেকে

২,৭০০ কোটি টাকা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন হয় যে, অনেকটা এগিয়েও শেষ পর্যন্ত সাফল পাওয়া যায় না। তখন এক বিশাল অঙ্কের টাকা ও পরিশ্রম, সবই বিফলে যায়। তেমনি আবা: সাফল্য লাভ করলে তা হয় সোনার ডিম দেওয়া হাঁস এবং তা এনে দিতে পারে বহু কোটি টাকা: মুনাফা। তবে যতই দিন যাচ্ছে, মূল ওষুধ উদ্ভাবনের খরচও ততই বাড়ছে। এ ব্যাপারে মন্তব করতে গিয়ে 'ফাইজার'-এর এক কার্যকর্তা শ্রী এস রামকৃষ্ণ বলেন, "খুব শীঘ্রই নতুন ওষু উদ্ভাবনের খরচ ১০০ কোটি ডলার (বা ৪,৫০০ কোটি টাকা) অতিক্রম করে যাবে।"

নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের প্রথম পর্যায়কে বলা চলে 'রোগ ও তার সম্ভাব্য ওষুধের শনাক্তকরণ এই ধারাটি সম্পূর্ণভাবে তাত্ত্বিক। সম্ভাব্য ওষুধটি কিভাবে কাজ করবে, কি ভাবে রোগের উপশ: ঘটাব, তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এই সব বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য রাসায়নিক যৌগে: একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এই তালিকায় লিপিবদ্ধ যৌগের সংখ্যা ১০,০০০-ও হবে পারে। এই ১০ হাজার যৌগের মধ্যে মাত্র একটি যৌগ শেষ পর্যন্ত ওষুধ হিসাবে বিবেচিত হবে পারে। তাই সাফল্যের সম্ভাবনা ১ঃ১০,০০০। এর পরবর্তী পর্যায়ে ওই ১০,০০০ যৌগে: গুণাগুণ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০০ বা ৩০০ যৌগ রেখে বাকি সবগুলোকে বা দেওয়া হয়। যে যৌগগুলোকে রাখা হল, তাদের বলা হয় 'হিটস্' (Hits)।

এর পর শুরু হয় ২০০/৩০০ হিটস্গুলোকে নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই সব কাজ সারতে লেগে যায় ১০ থেকে ১২ বছর এবং খরচ হয়ে যায় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা। এই হিটসগুলোর মধ্যে যেটাকে সব থেকে সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়, তাকে নিয়ে শুরু হয় প্রথমে কিছু জন্তু জানোয়ার এবং সব শেষে মানুষের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মানুষের ওপর পরীক্ষ চালানোকে ক্লিনিক্যাল স্তর বলে এবং এর জন্য সরকারের অনুমোদন লাগে।

ক্লিনিকাল পরীক্ষা ৩ টি স্তরে বা পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে (Phase-I) ওষুধটিকে ২০ থেকে ১০০ জন সুস্থ মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয় এবং দেখা হয় ওষুধটির কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া আছে কিনা। পরবর্তী পর্যায়ে (Phase-II) ওষুধটিকে ১০০ থেকে ৩০০ রোগীর ওপর প্রয়োগ করে ওষুধটির রোগ প্রশমনের ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এই পর্যায় পা: হয়ে গেলে ওষুধটিকে শেষ বা তৃতীয় পর্যায়ে (Phase-III) ১০০০ থেকে ৫০০০ রোগী: ওপর প্রয়োগ করা হয়। এর পর সরকার এই তিন পর্যায়ে পরীক্ষার ফলাফল বিচার বিবেচন করে ওষুধটিকে বাণিজ্যিক উৎপাদন এবং বাজারে বিক্রী করার ছাড়পত্র দেয়।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, বর্তমানে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানীগুলো বিদেশে: বাজারে যে সাফল্য পাচ্ছে তা খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ আগামী ২০০৫ সালে ভারতে 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন' বা WTO-র নিয়ম কানুন লাগু হবে। ফলে ভারতের বাজারে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোকে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দিতে হবে। উপরন্তু WTO-র পেটেন্ট আইন লাগু হবার ফলে ভারতীয় কোম্পানীগুলোর পক্ষে বহুজাতিক সংস্থা দ্বার আবিষ্কৃত মূল ওষুধগুলোর আর নকল করা সম্ভব হবে না। এইভাবে ভারতীয় কোম্পানীগুলে

নিজের দেশের বাজার থেকে উৎখাৎ হবে এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলো সেই বাজার দখল করে নেবে। এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া কারবারে তখন আর কোন বাধা থাকবে না। আমাদের তখন নিরুপায় হয়ে অত্যন্ত চড়া দামে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ওষুধ কিনতে হবে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রী অসিত কোঠারি বলেন, "নিজের দেশের বাজার হাতছাড়া হবার ভয়েই আজ ভারতয়ী ওষুধ কোম্পানীগুলো বিদেশের বাজার ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।"

অনেকে আরও মনে করেন যে, আমেরিকার বাজার ধরাও ভারতীয় কোম্পানীগুলোর পক্ষে ক্রমেই আরও কঠিন হয়ে পড়বে, কারণ আমেরিকার আদালতে তাদের বিস্তর মামলা লড়তে হবে। এবং এই মামলার খরচ জোগাতে তাদের লাভের পয়সা খরচ হয়ে যাবে। তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী অসিত কোঠারি বলেন; এই সময় মামলার পয়সা খরচ হবার ফলে ভারতীয় কোম্পানীগুলোর লাভের মাত্রা ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করে দিয়েছে।"

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অত্যন্ত চড়া দামে ওষুধ বিক্রী করে মুনাফা কামাতে এবং বিশ্বের দরিদ্র মানুষদের রক্ত শোষণ করতে পাশ্চাত্যের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো WTO কে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। তাই এ ব্যাপারে মূল প্রশ্ন হল WTO-র কি কোন ভবিষ্যৎ আছে? এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে এক বৃটিশ বিশেষজ্ঞ বলেন, "সম্প্রতি কানকুন-সম্মেলন ব্যর্থ হবার ফলে পুরা ব্যাপারটাই যেন মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে। এর আগে, ১৯৯৯ সালে সিয়াটেল-সম্মেলনও ব্যর্থ হয়েছিল। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে দু-দুটো সম্মেলনের ব্যর্থতা WTO-র অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।" প্রকৃতপক্ষে, কানকুন-সম্মেলন ব্যর্থ হবার ফলে WTO -র ১৪৮টি সদস্য দেশের সামনে যা খোলা থাকল, তা হল, WTO কে বাদ দিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করা। আরও স্পষ্ট করতে বলতে গেলে, ৭১টি দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের কাছে সেটাই এক মাত্র পথ," বলেন আর এক বিশেষজ্ঞ। "WTO-র উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সমস্ত দেশগুলোর জন্য একটি মাত্র বাণিজ্যিক আইন চালু করা, কিন্তু WTO-র সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই অতি শীঘ্রই WTO বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে, বলেন একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, WTO-র মরণ আসন্ন হয়েছে। আর WTO যদি না থাকে তবে ভারতীয় ওষুধ শিল্পেরও ভয়ের কোন কারণ নেই।

অপর দিকে WTO-র কানকুন সম্মেলন যে ভাবে ভেস্তে গিয়েছে সেটাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। প্রকৃতপক্ষে গ্যাট চুক্তি বা WTO-র সৃষ্টি করেছে পাশ্চাত্যে ধনীদেশগুলো তাদের সুবিধার জন্য, গরিব দেশগুলোকে ঠকিয়ে নিজেদের পেট মোটা করার জন্য। তাই ধনী দেশগুলো কৃষিতে ভর্তুকি দিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু গরিব দেশগুলো তা করলে WTO তাকে মহাপাপ বলে নিন্দা করে। কিন্তু কানকুন সম্মেলনের বিশেষত্ব হল, গরিবদেশগুলো ধনী দেশগুলোর এই দুমুখো নীতিকে একযোগে আক্রমণ করেছে। বিশেষ করে জি-২১ ভুক্ত

২১টি উন্নয়নশীল দেশের নেতৃত্বে যে রকম দলবদ্ধভাবে তারা ধনী দেশগুলোর এক তরফা নীতির নিন্দা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সম্মেলন বানচাল করে দিয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সব থেকে বড় কথা হল, এই ঘটনা WTO-র মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে এশিয়ার 'অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস্' বা আশিয়ান (ASEAN)-এর উত্থান ও শক্তি বৃদ্ধি যে WTO-র মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে তা বলাই বাহুল্য।

এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। WTO-র স্রষ্টা আমেরিকা নিজেই দু-দুবার WTO-মূল নীতিকে লঙ্ঘন করেছে বা পদদলিত করেছে। এটা আমেরিকা করেছিল প্রায় ৫ বছর আগে আমেরিকায় আমদানী করা জাপানী বিলাসবহুল গাড়ী ও তার যন্ত্রাংশের ওপর উচ্চ হারে আমদানী শুল্ক বসিয়ে। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, WTO-র কোন শক্তিশালী সদস্য ইচ্ছা হলে WTO-র বিধি-নিষেধকে স্বচ্ছন্দে অবজ্ঞা করতে পারে। তাই ভবিষ্যতে যদি শক্তিশালী ভারত WTO-র আইনকে কলা দেখায় তবে কারও কিছু বলার থাকবে না।

যাই হোক, যে দিন সত্যি সত্যি WTO-র পতন ঘটবে, সেই দিন থেকেই বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর চরম বিপদ শুরু হবে। সমগ্র বিশ্ব-বাজারে ভারতীয় ওষুধ কোম্পানীগুলোর সাথে তাদের সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য তাদের ওষুধের দাম কমাতে হবে। এক সময়, ১৯৭০ ও ১৯৮০-দর দশকে ইঞ্জিনিয়ীরিং শিল্পে এই সমস্যা দেখা গিয়েছিল। তখন পাশ্চাত্যের কোম্পানীগুলো তাদের কাজকর্ম ব্যাপকভাবে এশিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে স্থানান্তরিত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমানো। বর্তমানে কমপিউটার সফটওয়্যাল ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই তারা দলে দলে ভারতে আসতে শুরু করেছে। কারণ ভারতের একজন দক্ষ কর্মীকে যে পয়সা দিয়ে যে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, নিজের দেশের কর্মী দিয়ে সেই কাজ করাতে গেলে কমপক্ষে তাকে ৪ গুণ পয়সা দিতে হবে।

কাজেই অনুমান করা চলে যে, তাদের ওষুধ শিল্পেও একদিন ওই একই সমস্যা দেখা দেবে। এবং পাশ্চাত্যের বড় বড় বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলোকেও সেদিন এশিয়ায় আসতে হবে। একবার এই স্থানান্তর শুরু হলে ভারত যে তাদের গন্তব্যস্থল হবে সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ তারা যা চায়, শিক্ষিত সুদক্ষ সস্তা কর্মী, বিশ্বমানের পরীক্ষাগার ও অন্যান্য পরিকাঠামো সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা, এক মাত্র ভারতেই তারা সব পেতে পারে। তাদের বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে দেখেছে যে নতুন ওষুধ আবিষ্কারের কাজটা যদি ভারতে ভারতীয় বিজ্ঞানী দিয়ে করানো যায় তবে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ খরচ কমানো যাবে। তাই আজ যে কারণে মাইক্রোসফট, আই বি এম বা ওরাকল্-এর মত কোম্পানীগুলো ভারতে আসার জন্য লাইন লাগিয়েছে। সেই রকম একদিন ফাইজার, মার্ক বা এলি লিলি-র মত কোম্পানীগুলোও ভারতে আসার জন্য লাইন লাগাবে। বাঁচার তাগিদেই তাদের ভারতে আসতে হবে। তাই তা অবশ্যম্ভাবী। সেই দিনই ভারতীয় ওষুধ শিল্পের বিশ্ববিজয় শুরু হবে।

মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র

মার্কসবাদ একটি ঘৃণার তত্ত্ব

সামান্য চক্ষুলজ্জাটুকুও বিসর্জন দিয়ে চরম সন্ত্রাস ছড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম নেতারা পঞ্চায়েত নির্বাচন জিতে বেরিয়ে এলেন। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দখল না পেলে চলে না। বর্তমানে উন্নয়নের সমস্ত সরকারি টাকাপয়সা তো এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই খরচ হয়। তাই পঞ্চায়েতে মধু রয়েছে। তা হাতছাড়া হওয়ার অর্থ, পার্টি-ফান্ড মরুভূমি হয়ে যাওয়া। সুতরাং পঞ্চায়েত হাতে না রাখতে পারলে হোলটাইমার ক্যাডারদের টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। পার্টি-সংগঠনটাই মুখ থুবড়ে পড়বে। যেমন করেই হোক, পঞ্চায়েত দখলে রাখতেই হবে। এটা বাঁচা-মরার সমস্যা। দরকার হলে sword, fire and rape—তরোয়াল, আগুন ও ধর্ষণের মধ্য দিয়েও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিততে হবে। হলও তা-ই। সি পি এম নেতৃত্ব খুশি। তাঁদের জেতার কৌশল সফল হয়েছে। তাঁরা এই যুদ্ধে জিতেছেন। রেকর্ডসংখ্যক গ্রাম পঞ্চায়েত তাঁদের হাতে এসে গিয়েছে। পাশাপাশি, আরেকটি রেকর্ডও তাঁরা গড়েছেন। পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নজিরবিহীন খুনোখুনির ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়া, প্রাণের ভয় দেখিয়ে গ্রামছাড়া করা, তাতেও কাজ না হলে প্রার্থী বা তার আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করা, ঘরে আগুন লাগানো, তাদের মা-স্ত্রী-বোনেদের ওপর শারীরিক-যৌন নির্যাতন চালানো, আরও কত কীই না ভোটের আগে চলল! রোজই কাগজে এই খবর ছাপা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, নির্লজ্জ সি পি নেতাদের বয়ানও দেখা গিয়েছে ছাপার অক্ষরে ঃ 'জিততে পারবে না বলেই বিরোধীরা মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছে না', বা 'জমা দিলেও তা তুলে নিচ্ছে'। নিরুপায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সি পি এমের সন্ত্রাসের এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নিয়ে গত মাসের মাঝামাঝি দিল্লি যান। দিল্লির কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে আসেন।

প্রশ্ন হল, এই রাজ্যের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখের কথা জানাতে, তাদের হয়ে অভিযোগ জানাতে মমতাকে দিল্লি ছুটতে হল কেন? কারণটা খুবই সোজা। গত ২৫-২৬ বছরের কমিউনিস্ট শাসন এ রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিয়েছে। তাই এখানে মানুষের অভিযোগ জানানোর আর জায়গা নেই।

কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ধরনই এই। চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রথমত, সরকারি প্রশাসনের মধ্যে যত সম্ভব পার্টির লোক ঢুকিয়ে তাকে পার্টি প্রশাসনে

পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, সমান্তরাল একটা পার্টি-প্রশাসন খাড়া করে ক্রমে সরকারি প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। বিগত ২৫-২৬ বছরের মধ্যে এই দুটো কাজই এই রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে পার্টিরই একটি অঙ্গে পরিণত করা হয়েছে। উঁচুতলা থেকে নিচুতলা পর্যন্ত পুলিশের সকল কর্মী-অফিসার আজ পার্টির একান্ত অনুগত। তাই নির্যাতিত মানুষ থানায় গিয়ে নালিশ জানালে প্রতমত তা গ্রাহ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, পুলিশ তার ইচ্ছেমতো এমন এক রিপোর্টে তৈরি করে, যাকে ভিত্তি করে আদালতে কোনও মামলা করা যায় না। এটা সকলেরই জানা আছে যে, একটা ফৌজদারি মামলায় পুলিশ রিপোর্টের গুরুত্ব কতখানি এবং সেই রিপোর্ট যদি পার্টির নেতাদের পরামর্শমতো তৈরি করা হয় তবে কী ঘটতে পারে। তাই বানতলা থেকে ধানতলা, কোনও মামলারই সুরাহা এ রাজ্যে হয় না, হবে না।

যেখানে দলের লোক ঢুকিয়ে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব নয়, সেখানেই প্রয়োজন হয় সরকারি প্রশাসনের সমান্তরাল পার্টি প্রশাসন খাড়া করা। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই দুই পন্থাকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি প্রশাসনকে জেলাস্তর থেকে থানাস্তর পর্যন্ত পঙ্গু করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে অন্যান্য সরকারি আমলা পার্টির নেতাদের মনের মতো করে তাঁদের রিপোর্ট তৈরি করছেন। দিনকে রাত, রাতকে দিন করছেন। পার্টির ক্যাডারদের হাতে নির্যাতিত মানুষের নালিশ জানানোর জায়গা এই রাজ্যে নেই।

এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। এরকম একটা শক্তিশালী পার্টি প্রশাসন খাড়া করা এবং তাকে চালু রাখা খুবই খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। এর জন্য বিশাল এক পূর্ণকালীন ক্যাডার-বাহিনীকে মাসিক বেতন দিয়ে পুষতে হয়। আজ পশ্চিমবঙ্গে যে অর্থিক দৈন্যদশা চলছে, তার মূলে রয়েছে এই খরচ। শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, কৃষি সব ক'টি ক্ষেত্র থেকে অন্যায়ভাবে টাকা সরিয়ে এই পার্টি প্রশাসনকে জিইয়ে রাখতে হচ্ছে। উন্নয়ন হবে কোথা থেকে? নতুন স্কুল-কলেজ চালু করার, শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশন দেওয়ার টাকা আসবে কোথা থেকে? হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার টাকাই বা জুটবে কী করে?

তবু, আজ দিল্লিতে একটি অকমিউনিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে। তাই, তৃণমূল নেত্রীর পক্ষে সেখানে নালিশ জানিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি তা না থাকত? বুঝতে অসুবিদর কথা নয় যে, সেক্ষেত্রে এই পশ্চিমবঙ্গ হয়ে যেত এককালের সোভিয়েত দেশ বা পূর্ব ইউরোপ। অথবা আজকের চীন বা উত্তর কোরিয়া। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থক ও নেতাদের ঝাড়েবংশে উৎখাত করে রক্তগঙ্গা বইতে দিতে সি পি এমের আর তখন কোনও অসুবিধা থাকত না। তখন এই ব্যাপক হত্যালীলা ও রক্তপাতের নাম হত 'জনগণতান্ত্রিক' বা 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব'। এবং সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সি পি এম যে নিরঙ্কুশ শাসন

চালাত, তাকে বলা হত 'শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র' বা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'। মানুষের বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও যাবতীয় ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করে, গোটা দেশকে একটা জেলকানায় পর্যবসিত করে সি পি এমের প্রচার-যন্ত্র তখন প্রচার চালাত, পশ্চিমবঙ্গের খেটেখাওয়া মানুষ মহান বিপ্লব সম্পন্ন করে পশ্চিমবঙ্গকে স্বর্গে পরিত করেছে। রাজ্যের গ্রাম-নগরে তখন বিরাজ করত শ্মশানের শান্তি।

সুখের কথা হল, কমিউনিস্টরা আজ পর্যন্ত যে সব দেশে সমাজতন্ত্র নামক জেলখানার প্রবর্তন করেছিল, তার প্রায় সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের ফলে তা ধসে পড়েছে। সোভিয়েত দেশ, পূর্ব জার্মানি, রোমানিয়া, পোল্যান্ড, যুগোসআভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি সব দেশেই নিপীড়নকারী কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হয়েছে। চীনে তা নামেমাত্র টিকে আছে। আর টিকে আছে উত্তর কোরিয়ার।

সাধারণ মানুষ এই সব দানবীয় শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেলে কী করে, তা সম্প্রতি বাগদাদের নাগরিকরা দেখিয়ে দিয়েছে। সাদ্দামের মূর্তি তারা টেনে নামিয়েছে। তাতে থুতু দিয়েছে। সাদ্দামের মূর্তি ও ছবিতে পায়ের জুতো খুলে মেরেছে। সোভিয়েত দেশের পতনের পর মস্কো, স্তালিনগ্রাদ ইত্যাদি শহরের মানুষও এই একইরকম আচরণ করেছিল। মহান মুক্তিদাতা বলে খ্যাত কমরেড লেনিনের মূর্তিও তারা গাঁইতি মেরে ভেঙেছিল। বাঘা বাঘা কমিউনিস্ট নেতার মূর্তিতে থুতু ছিটিয়েছিল, মল-মূত্র ত্যাগ করেছিল। কাজেই অনুমান করা চলে যে, চীনে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হলে বেজিংয়ের মুক্ত মানুষ মাও, দেং প্রমুখ মহান নেতাদের মূর্তির একই দশা করবে এবং উত্তর কোরিয়ার মানুষ কমিউনিস্টদের নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেলে মহান নেতা কিম ইল সুঙ ও তাঁর ছেলে কিম জঙ ইলের মূর্তি ও ছবিতেও জুতো মারবে। আর, এটাও অবধারিত সত্য যে, এই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হলে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু বা অনিল বিশ্বাসের ইমেজকেও এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একইভাবে আপ্যায়ন করবে। এই সব ঘটনা থেকে যে মূল প্রশ্ন বেরিয়ে আসে তা হল, যে কমিউনিস্টরা খেটে খাওয়া মানুষের স্বর্গ গড়ার প্রতিশ্রুতি দেয়, ক্ষমতা পেলে তারাই আবার গরিব মানুষের প্রতি চরম অত্যাচারী এবং নিপীড়ক হয়ে ওঠে কেন? এর জবাব, তথাকথিত সুমধুর কমিউনিস্ট বোলচালের আবরণে ঢাকা মার্কসবাদী তত্ত্ব হল চরম এক ঘৃণার তত্ত্ব। কমিউনিস্ট পার্টি গরিবের পার্টি, গরিবের স্বার্থরক্ষার পার্টি, এই সব কথাবার্তা নিছক ছেলে-ভোলানো বুলি মাত্র। এইসব লম্বাচওড়া কথা দিয়ে কমিউনিস্টরা তাদের ঘৃণারতত্ত্বকে সযত্নে আড়াল করে রাখে।

খ্রিস্টমত পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করে। যারা যীশুর শরণ নিয়েছে, তারা হল বিশ্বাসী 'ইলেক্ট' (elect), বা গডের প্রিয়পাত্র। আর যারা তা করেনি,তারা হল অবিশ্বাসী 'হিদেন'। ইসলামও সমস্ত মানব সমাজকে দু'ভাগে ভাগ করে। যারা আল্লার কোরান ও

আল্লার রসুল মহম্মদে বিশ্বাস করে তারা হল, বিশ্বাসী ইমানদার মুসলমান বা 'মোমেন'। আর যারা তা করে না, তারা অবিশ্বাসী ঘৃণিত 'কাফের'।

সেই রকম মার্কসবাদও বিশ্বের মানব সমাজকে সরাসরি দু'ভাগে ভাগ করে দেখে। যারা মার্কসবাদী তত্ত্বে বিশ্বাসী, তারা 'কমিউনিস্ট'। যারা তা করে না বা অন্য কোনও মতাদর্শে বিশ্বাস করে, তারা হল ঘৃণিত 'শ্রেণীশত্রুখ্য, বিপ্লবের শত্রু ও সমাজতন্ত্রের শত্রু। যুক্তি খুবই সোজা। কমিউনিস্টদের মতে, জার্মানিতে কার্ল মার্কস নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা মাথাতেই কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল। আর সব মানুষ হল মুর্খস্য মূর্খ! সেই মহাপণ্ডিত ও মহাবুদ্ধিমান মার্কস যে তত্ত্বের আমদানি করেছেন, একমাত্র সেই তত্ত্বের মধ্যেই সত্য আছে। এবং শুধু সত্য নয়, তা হল 'বৈজ্ঞানিক' সত্য। এবং মার্কসবাদী গ্রন্থ ছাড়া আর যে সব গ্রন্থ আছে, তা সবই জঞ্জালবিশেষ।

কমিউনিস্টদের দাবি, পৃথিবীর সকল মানুষের উচিত মহাপণ্ডিত সেই মার্কসের সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মাথায় তুলে নেওয়া এবং বাদবাকি সমস্ত তত্ত্বকে জঞ্জালের মতোই পরিত্যাগ করা। কাজেই যে সব লোক মার্কসের সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাথায় তুলে নেয় না, তাদের থেকে বুদ্ধিহীন নিম্নস্তরের মানুষ আর কে হতে পারে? এরা বেঁচে থাকল, কি মরল, তাতে কি আসে যায়! ঘৃণিত শ্রেণীশত্রুদের ঝাড়েবংশে উৎখাত করেবিপ্লব বা সমাজতন্ত্রের পথ পরিষ্কার করাই মার্কসবাদের শিক্ষা। তারা অত্যন্ত গরিব হলেও বধযোগ্য, কারণ তারা যে ঘৃণ্য শ্রেণীশত্রু! যেসব গরিব মার্কসবাদে বিশ্বাসী ও মার্কসবাদের সমর্থক, তারাই প্রকৃত গরিব। মার্কসবাদীদের মাথাব্যথা শুধু এই কমিউনিস্ট গরিবদের জন্য, গরিব শ্রেণীশত্রুদের জন্য নয়।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই ঘৃণার তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়েই মহান কমরেড স্তালিন ১৯৩০-এর দশকে ইউক্রেনের প্রায় ২৫ লক্ষ চাষিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছিলেন। এই ঘৃণার তত্ত্ব অণুসরণ করেই কম্বোডিয়ার পল পত ১০ লক্ষ নিরীহ দেশবাসীকে হত্যা করেছিলেন। এই ঘৃণার তত্ত্ব অনুসরণ করে কমরেড দেঙ জিয়াও পিং শতাধিক তরুণ ছাত্রছাত্রীকে মেশিনগান চালিয়ে, ট্যাংকে পিষে হত্যা করেছিলেন। এই ঘৃণার তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়েই এই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার মরিচঝাঁপিতে নিঃস্ব ও দরিদ্র উদ্বাস্তুদের গুলি করে হত্যা করেছিল, এবং ছোট আঙারিয়া গ্রামে ১৮ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে মৃতদেহ লোপাট করে দিয়েছিল। এই ঘৃণার তত্ত্বের দ্বারা চালিত হয়েই উত্তর কোরিয়ার সরকার সেই দেশের গরিব শ্রেণীশত্রুদের 'আঙুর' আখ্যা দিয়ে ক্রীতদাসের স্তরে নামিয়ে এনেছে এবং তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাই সেই ঘৃণার তত্ত্ব অনুসরণ করে আজ সি পি এমের ক্যাডার বাহিনী যে এই পশ্চিমবাংলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে, শ্রেণীশত্রুদের হত্যা করবে, তাদের ঘরে আগুন দেবে, তাদের মা-বোনকে কলুষিত করবে, প্রাণে ভয় দেখিয়ে একতরফা ভোট আদায় করে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা যে রাজনীতি করেছে বা করছে, তাতে এটাই প্রমাণ হয় যে, তাদের মতো মূর্খ এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। এই পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাক। আজ যদি তারা জোরজুলুম না করে, গণতন্ত্রের রীতিনীতি মেনে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, তা হলে এবার নির্বাচনে হারলেও ভবিষ্যতের নির্বাচনে জেতার আশা থাকত।

কিন্তু সি পি এম সেই রাস্তায় যায়নি, কারণ তাদের তত্ত্ব এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। সেই তত্ত্বের নির্দেশ হল, বিপ্লবের নামে মারদাঙ্গা ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে, তারপর সমস্ত বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে হবে, এবং যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে। কাজেই ভদ্রভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র কমিউনিস্টরা নয়। পৃথিবীর সব দেশেই তারা শেষ পর্যন্ত জনগণের সমর্থন হারিয়ে শুধুমাত্র পেশিশক্তির প্রয়োগ করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সাধারণ মানুষের চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ক্রমে ইউরোপের দেশে দেশে এই ঘৃণা-বিদ্বেষ এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ মানুষ তাদের মেরে তাড়াতে বাধ্য হয়েছে। নিট ফল, তাদের পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা চিরকালের জন্যলোপ পেয়ে গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতারাও যে একই পথে চলেছেন, তা বলাই বাহুল্য। গায়ের জোরে, সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েতে টিকে থাকার যে চেষ্টা তাঁরা চালালেন, তাতে এবারের মতো সফল হয়েই হয়তো তাঁরা খুশি। কিন্তু তাদের ভাণ্ডারে জমা হল সাধারণ মানুষের আরও আরও বেশি ঘৃণা ও বিদ্বেষের হলাহল। এই তিক্ততা জমতে জমতে যেদিন ফেটে পড়বে, জনসাধারণ সেদিন বাধ্য হবে পিটিয়ে, টেনেহিঁচড়ে তাঁদের গদি থেকে নামাতে। এইভাবে সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিত্যাক্ত হওয়ার ফলে ভবিষ্যতে কোনওদিন ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা আর তাঁদের থাকবে না। পশ্চিমবাংলার মাটি থেকে মার্কসবাদী তত্ত্ব ও কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

মার্কসের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ইসলামী জিহাদ ব্যাখ্যা করা যায় না

মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে মানব সমাজের মূল চালিকা শক্তি হল অর্থনীতি। মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি সমস্ত মানবিক দিকগুলোর বিকাশের মূলে রয়েছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক কাঠামোই হল মানব সমাজের মূল কাঠামো। মানুষে মানুষে প্রেম ভালবাসা, হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ, বিগ্রহ, হানাহানি, মারামারি সব কিছুর মূলে রয়েছে অর্থনীতি বা মানুষের অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই আর্থিক বৈষম্যের ফলেই এই মনুষ্য সমাজ আজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে কিছু হল শোষক শ্রেণী এবং বাদবাকীগুলো হল শোষিত শ্রেণী। শোষক শ্রেণীগুলোর উদ্দেশ্য হল শোষিত শ্রেণীগুলোকে আর্থিক দিক দিয়ে শোষণ করে নিজেদের পেট মোটা করা। আর শোষিত শ্রেণীগুলোর চেষ্টা হল, এই শোষণের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

মার্কসবাদীদের মতে মানব সমাজের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অভ্রান্ত, সত্য ও সার্বজনীন। তাদের বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত হানাহানি, মারামারি ও যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে তা হল শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। সেই সুদূর অতীত ক্রীতদাসপ্রথার সমাজব্যবস্থার সময়ে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত, তা আজ পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যকার সংঘাতে পরিণতি লাভ করেছে। এছাড়া রয়েছে শোষক শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার স্বার্থের সংঘাত, যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেদের মধ্যে পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছে।

১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে সর্বহারার সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই তত্ত্বের সঙ্গে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সামাজিক সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। সরাসরি সংঘর্ষ না হলেও, ঠাণ্ডা-লড়াই হিসাবে তা প্রায় ৫০ বছর টিকে থেকেছে। বর্তমানে চীনকে ঘিরে সেই ঠাণ্ডা-লড়াই আবার ফিরে আসার উপক্রম হয়েছে।

যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে যে, মার্কসবাদীদের মতে উপরিউক্ত শ্রেণীসংঘর্ষের তত্ত্ব শুধু অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যই নয়, বিশ্বজনীনও বটে। তাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই পৃথিবীর যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে তাদের ওই শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এর ফল হল এই যে, যেই সমস্ত বিষয় ওই শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্য করা সম্ভব নয়, তাও তারা গায়ের জোরে এবং নানারকমের কুযুক্তি খাড়া করে মার্কসবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রমাণ করার কাজে নেমে পড়ল। এটা তাদের পক্ষে খুবই জরুরী, কারণ তা না হলে মার্কসবাদকে একটি বিশ্বজনীন তত্ত্ব হিসাবে দাবি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তাই দেশ বিভাগের প্রাক্কালে আমাদের মার্কসবাদী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা নানান কুযুক্তি ও অপযুক্তি খাড়া করে মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিকে মার্কসবাদীতত্ত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার কাজে নেমে পড়লেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হল এটা প্রমাণ করা যে, মুসলমানদের ওই দাবির মূল উৎস হল অর্থনীতি। উপরন্তু পাকিস্তানের দাবিকে জোরদার করতে মুসলমানরা তখন যে সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করল, নির্বিচারে হিন্দু নিধন করল, তাকেও আমাদের মার্কসবাদী নেতারা শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ বলে চালাতে চেষ্টা করলেন। এক কথায় তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে, ইসলামী জিহাদেরও উৎস হল অর্থনীতি।

তাঁরা তখন ব্যাখ্যা দিলেন যে, পূর্ববঙ্গের সকল জোতদার জমিদারই হিন্দু এবং গরীব কৃষক এবং সকল কৃষিশ্রমিকই মুসলমান এবং ওই হিন্দু জমিদারদের শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই গরীব ও শোষিত মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবি তুলছে। আর মার্কসবাদীরা যেহেতু শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাই মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন না করে তাঁদের উপায় নেই। তাই আমাদের মার্কসবাদী নেতারা তখন আওয়াজ তুললেন 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে, দিতে হবে।' আমাদের মহান মার্কসবাদী নেতা জ্যোতি বসু মহাশয় কলকাতার ময়দানে মুসলিম লিগ-এর সঙ্গে এক মঞ্চে সভা করলেন এবং আওয়াজ তুললেন 'পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।'

কিন্তু যে কেউ ইসলামী শাস্ত্র সম্বন্ধে সামান্যতম খোঁজ খবর নিলেই দেখতে পাবেন যে, মুসলমানদের পাকিস্তানের দাবির মূল কারণ নিহিত ছিল অন্য কোথাও। মার্কসবাদীদের অর্থনৈতিক তত্ত্ব বা শোষক শোষিতের তত্ত্বের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক ছিল না।

কোরান, হাদিস ইত্যাদি ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত কথা লেখা আছে তা থেকে বেরিয়ে আসে ইসলামের তিনটি মূল সিদ্ধান্ত। এগুলো হল, '(১) মিল্লাৎ ও কুফর, (২) দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হার্ব এবং (৩) জিহাদ। প্রথম সিদ্ধান্ত 'মিল্লাৎ ও কুফর'-এর মিল্লাৎ অর্থ সৌভ্রাতৃত্ব এবং কুফরের অর্থ বিরুদ্ধতা করা। মিল্লাৎ বলছে যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই বা 'কুল্ল মুসলেমিন ইখুয়াতুন'। আর যারা মুসলমান নয়, যারা কোরান এবং মহম্মদের নবীত্বে বিশ্বাস করে না তারা হল কুফরকারী কাফের। কোরান বলছে যে, এইকাফেররা হল ঈশ্বরহীন পশু। আল্লা এদের অতিশয় ঘৃণা করেন এবং এদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। মৃত্যুর পর আল্লা তাদের সবাইকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন এবং সেখানে তারা অনন্তকাল শাস্তিভোগ করবে।

দার-উল-ইসলাম বলতে বোঝায় যে সমস্ত দেশ, যেখানে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দার-উল-হার্ব-এর আক্ষরিক অর্থ হল 'Land of Violence' বা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের দেশ। বিশেষ অর্থে, এগুলো হল সেই সমস্ত দেশ যেগুলো এখনও মুসলমানদের অধিকারে আসেনি। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে কাফেরদের সংঘর্ষ চলছে। আল্লা বলছেন, 'এই পৃথিবীর সমুদায় সম্পত্তির মালিক হলেন আল্লা ও তাঁর রসুল।' তাই ইসলামের উদ্দেশ্য হল সমগ্র

পৃথিবীকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। কিন্তু কোন পদ্ধতির সাহায্যে তা করতে হবে? এখানেই ইসলামের তৃতীয় সিদ্ধান্ত জিহাদ-এর আবির্ভাব। জিহাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ইসলামের সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে। অনেকে বলেন যে, জিহাদ হল ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু তা ঠিক নয়। ধর্মযুদ্ধ বলতে বোঝায় ধর্মেও সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ বা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের যুদ্ধ। হিন্দুর কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল ধর্মযুদ্ধের এক আদর্শ উদাহরণ। সেই ধর্মযুদ্ধে অসামরিক ব্যক্তি ছিল অবধ্য। নারী ও শিশু হত্যার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু জিহাদ বলতে বোঝায় মুসলমানদের সঙ্গে অমুসলমান কাফেরদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নির্বিশেষে যে কোন কাফেরই মুসলমানদের কাছে বধযোগ্য। কাফেরদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে বা জিহাদে মুসলমানদের পক্ষে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা কোরান দ্বারা বৈধ।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, উপরিউক্ত ইসলামী জিহাদের মধ্যে মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রাম, বা শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের অবধারণার লেশমাত্রও অনুপস্থিত। ইসলামী জিহাদকে মার্কসবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তখনই বলা যেত, যদি ইসলামী শাস্ত্র গরীব শোষিত মুসলমানদের শোষক শ্রেণীভুক্ত ধনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলত। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই দেখা গেল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু জোতদার জমিদারদের সাথে খেটে খাওয়া গরীব, শ্রমজীবী হিন্দুও সমান ভাবে আক্রান্ত হল এবং দেশ থেকে বিতারিত হল। পক্ষান্তরে শোষক শ্রেণীভুক্ত একজন জোতদার, জমিদার বা পুঁজিপতি মুসলমানও আক্রান্ত হল না। কিন্তু আমাদের মার্কসবাদীরা ইসলামী জিহাদের যে মার্কসবাদী ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছিলেন, তা সত্য হলে একজন শ্রমজীবী হিন্দুরও আক্রান্ত হবার কথা ছিল না এবং হিন্দু জোতদার জমিদারদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জোতদার জমিদারদেরও সমানভাবে আক্রান্ত হওয়া উচিত ছিল।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান থেকে ব্যাপক আকারে হিন্দু বিতাড়নের মধ্য দিয়ে ইসলামী জিহাদের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা চরমভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হবার পরও আমাদের মার্কসবাদীরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন যে, বর্তমান ব্যাপক ইসলামী সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অর্থনীতি। তাঁদের মতে মুসলমান যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব ও হতাশা তাদের সন্ত্রাসবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অনুমান সত্য বলে ধরে নিলে এর সঙ্গে জড়িত আর একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেসব মুসলমান এই সব সন্ত্রাসবাদীদের টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছে তারা বেকার নয় বা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল নয়। তা হলে তারা সন্ত্রাসবাদীদের জিহাদ করতে সাহায্য করছে কেন? এর ব্যাখ্যা মার্কসবাদীদের কাছে নেই।

উপরিউক্ত [illegible]লোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তই আসতে হয় যে, সব মুসলমান যুবকরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হলেও ইসলামী জিহাদ বা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে না। যতদিন এই পৃথিবীর বুকে একটিও দার-উল-হার্ব থাকবে, ততদিন ইসলামী সন্ত্রাসবাদও থাকবে। কারণ ইসলামী

সন্ত্রাসের উৎস আর্থিক বৈষম্য নয়। এর উৎস পৃথিবীব্যাপী ইসলামী বা আরব্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ইসলামী নির্দেশ।

মার্কসবাদীদের কাছে এটা সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে যে, ইসলামী জিহাদের মূলেও রয়েছে অর্থনীতি। তাহল কাফেরদের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে ধনবান হবার এক সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা। কিন্তু মার্কসবাদীদের কাছে যে কোন রকমের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টাই অমানবিক এবং নিন্দনীয়। সেই কারণেই তাঁরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে গালি না দিয়ে জলগ্রহণ করেন না। সুতরাং সেই দিক দিয়ে বিচার করলে, মার্কসবাসীদের উচিত ইসলামী সাম্রাজ্যবাদকেও সমানভাবে নিন্দা করা।

এ ব্যাপারে আরও একটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। মার্কসবাদীরা ক্রীতদাস প্রথার ভীষণ বিরোধী, কিন্তু ইসলাম সেই ক্রীতদাসপ্রথার পৃষ্ঠপোষক। সমাজের কোন্ ব্যক্তি কত ধনশালী, প্রাক-ইসলামী আরবে তার মাপকাঠি ছিল কার কত উট আছে। কিন্তু ইসলামের আগমনের পরে কার কত ক্রীতদাস আছে সেটাই আর্থিক স্বচ্ছলতার মাপকাঠিতে পরিণত হয়। নবীর চাচাত ভাই যুবায়ের ১০০০ ক্রীতদাসের মালিক হবার সুবাদে আরবের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ৭১২ সালে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধুদেশ জয় করার পর লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারী ও শিশুকে বাগদাদ ও দামাস্কাকে পাঠায় এবং সেখানের হাটে তাদের বিক্রী করা হয়। সেই সময় খলিফা মুয়াইয়ার প্রধান সহকারী এবং ইরাকের শাসক আল হাজাজ মারা যাবার পর তার জেলখানাগুলোতে দেখা যায় প্রায় ৫০ হাজার হিন্দু ক্রীতদাসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। অনেকে ভাবতে পারেন যে, এইসব বিগত দিনের কথা। আজকের ইসলাম ক্রীতদাস প্রথাকে সমর্থন করে না। সে ব্যাপারে বলতে হয় যে, সৌদি আরবে আজও ক্রীতদাস প্রথা চালু আছে। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশ থেকে গরীব ঘরের মুসলমান শিশুদের চোরাইপথে সৌদি আরবে আনা হয় এবং আরবের শেখরা তাদের পয়সা দিয়ে কিনে ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহার করে।

শেষ কথা হিসাবে বলা যায় যে, মার্কসবাদ এই মানব সমাজকে শ্রমিক, কৃষক, বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, সামন্ত প্রভু, ভূমিদাস ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে ভাগ করে এবং এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হল আর্থিক বৈষম্য। কিন্তু ইসলাম এই মানব সমাজকে ভাগ করে মাত্র দুটি শ্রেণীতে, মুসলমান শ্রেণী ও কাফের শ্রেণী। মার্কসবাদের উদ্দেশ্য হল শোষণহীন সমাজ তৈরি করা। পক্ষান্তরে ইসলামের উদ্দেশ্য হল, কাফের শ্রেণীকে নির্মূল করে সারা পৃথিবীকে ইসলামী সাম্রাজ্যে বা আরব্য সংস্কৃতির সাম্রাজ্যে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তারা পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসাত্মক কাজ বা জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

সব থেকে বড় কথা হল, ইসলাম মানব সমাজকে যে দুই শ্রেণী, মুসলমান শ্রেণী ও কাফের শ্রেণীতে বিভক্ত করে, তার ভিত্তি অর্থনীতি বা আর্থিক বৈষম্য নয়। আর এই মূল তফাতের জন্যই মার্কসবাদের সাহায্যে ইসলামী জিহাদকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

চীনের মার্কসবাদ বর্জন

আজ থেকে ৮১ বছর আগে, ১৯২১ সালে, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অতি গোপনে, সাংহাই-এর ইয়াং সিকিয়াং নদীবক্ষে একটি নৌকার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিনিধি সেদিন সেই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। এবার মহা ধুমধাম ও জাঁকজমকের মধ্য দিয়ে, বেজিং-এর 'গ্রেট হল অব দি পিপল'-এ অনুষ্ঠত হল পার্টির ১৬শ কংগ্রেস। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ২১১৪ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গত ৮ নভেম্বর (২০০২) তা শুরু হল এবং ১৪ নভেম্বর শেষ হল।

এই কংগ্রেসেই চীনা রাজনীতির ক্ষমতার রদবদল হয়ে থাকে। কিন্তু তা আমাদের দেশের মতো নয়। আমাদের দেশে ক্ষমতার পালাবদল হয় ভোটের মাধ্যমে। সাঁরা দেশ জুড়ে সেই ভোট নামক গণতন্ত্রের মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বেশ কয়েক হাজার প্রার্থী এবং প্রায় ৬০ কোটি ভোটদাতা তাতে অংশগ্রহণ করেন। যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁরাই দেশ চালাবার ক্ষমতা পান।

কিন্তু চীনে যে ক্ষমতার পালাবদল হয়, তাতে সাধারণ মানুষের কোনও ভূমিকা থাকে না। তাই এ নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথাও থাকে না। শুধু একখানা লাল শালু কিনে বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। নেতারাই তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে নতুন নেতা নির্বাচিত করেন। যেমন করে কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের 'বোর্ড অব ডিরেক্টরস' নতুন চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর নির্বাচিত করে। অথবা বিদায়ী নেতা কাউকে নতুন নেতা মনোনীত করে যান। এবার যিনি সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন, সেই হু জিন টাও-কে প্রায় দশ বছর আগে বিদায়ী নেতা দেঙ জিয়াও পিং মনোনীত করে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, আশা করা গিয়েছিল যে এবারের কংগ্রেসে জিয়াং জেমিন তাঁর রাষ্ট্রপতির পদ, পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদ এবং সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পদ, এই তিনটি পদই ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তিনি শুধু পার্টির সাধারণ সম্পাদকের পদটিই হু জিনটাও-কে ছেড়ে দিলেন এবং বাকি দুটি পদ আঁকড়ে ধরে থাকলেন। তবে, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, রাষ্ট্রপতির পদটি তাঁকে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ছেড়ে দিতেই হবে। কারণ তখন তাঁর ওই পদে থাকার ১০ বছরের পূর্ণ মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তবে সামরিক বাহিনীর প্রধানের পদটি তিনি যতদিন ইচ্ছা, আমৃত্যু ধরে রাখতে পারবেন।

তবে সুখের কথা হল, মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই এবারকার পালাবদল সম্পূর্ণ হয়েছে। এর আগের সব পালাবদলের সময়েই পেশী শক্তির বহুল প্রয়োগ হয়েছে। কোন কোন নেতাকে বহিষ্কার এবং কোন কোন নেতাকে মাঝরাতে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়েই অগের সমস্ত পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু আশঙ্কার কথা হল, পর্যবেক্ষকের মতে, এবারের পালাবদল আপাতত শান্তিপূর্ণ থাকলেও ভবিষ্যতে তা ভয়ঙ্কর রূপ নেবে। হয়তো ভবিষ্যতের সেই ক্ষমতার লড়াই পূর্বের সমস্ত দৃষ্টান্তকেও অতিক্রম করে যাবে।

এই অনুমানের ভিত্তি হল, ক্ষমতা ছেড়ে দিতে জিয়াং-এর প্রবল অনিচ্ছা। শুধু তাই নয়, তাঁর উদ্দেশ্য হল, নতুন নেতা হু জিনটাওকে নিষ্ক্রিয় রেখে নিজের ঘনিষ্ঠ লোকজনের সাহায্যে বাইরে থেকে নিজের ইচ্ছামতো পার্টি ও সরকারের কাজকর্ম চালনা করা।

এ জন্য জিয়াং যে চাল চেলেছেন তাকে অভিনব না বলে উপায় নেই। বিগত ১৩ বছর একনাগাড়ে ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালীন তিনি তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে নিজের বিশ্বাসী লোকজনকে অনেক উচ্চপদ পাইয়ে দিয়েছেন। আর এইসব লোকজনের সাহায্যে জিয়াং এবারের কংগ্রেসে যা ইচ্ছা করেছেন তাই করতে পেরেছেন। খুবই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অন্তিমে চরম সাফল্য দেখিয়েছেন।

জিয়াং-এর প্রথম সাফল্য হল, তিনি তাঁর ইচ্ছামতো পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটি'র বিস্তার করেছেন। আগে এটা ৭ সদস্যের কমিটি ছিল। জিয়াং তাকে ৯ সদস্যের এই কমিটিতে তিনি ৬ জন নিজের লোককে ঢোকাতে পেরেছেন। বর্তমান কমিটির ৯ জন সদস্য হলেন, হু জিনটাও (৫৯), উ বাঙগুয়ো (৬১), জেন্ কিঙহঙ (৬২), হুয়াং জু (৬৪), লি চ্যাঙচু (৫৪), জিয়া কিঙলিঙ (৬২), উ গুয়ান ঝেঙ (৬৪), ওয়েন জিয়াবাও (৬০) এবং লুও গন (৬৭)। এঁদের মধ্যে, নিজে বাদে, ওয়েন জিয়াবাও এবং লুও গন, এই দু'জনই হলেন হু জিনটাও-এর লোক, আরবাদবাকি সবাই হলেন জিয়াং-এর কৃপাধন্য।

এছাড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যেও প্রভাবশালী বেশির ভাগ সদস্য জিয়াং-এর লোক। সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ৩ জন জিয়াং-বিশ্বাসী হলেন, তাঙ জিয়াজুয়ান, ১৯৯৮ সাল থেকে যিনি বিদেশ-মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জেঙ পেরিয়ান, অর্থিক পরিকল্পনার ব্যাপারে যাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন দাই জিয়াঙ লং, যিনি চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করছেন।

নতুন নেতা হু জিনটাও হলেন কম কথার মানুষ। দেশের লোকেরাই তাঁকে ভাল করে চেনে না। অনেকে তাঁর নামই শোনেনি। যে কারণে চীনের মানুষ তাঁকে কিছুটা চেনে তা হল, ১৯৮০-র দশকে অত্যধিক দমন-পীড়নের মধ্য দিয়ে তিনি তিব্বতকে ঠাণ্ডা করেছিলেন। চীনা রাজনীতিতে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল অঙ্গ (body) হল, 'পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটি' এবং পরবর্তী ক্ষমতাশীল অঙ্গ হল, 'কেন্দ্রিয় কমিটি'। কাজেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার এই দুই কেন্দ্রে

জিয়াং-এর লোক বেশি থাকার ফলে নতুন নেতা হু যে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি যে জিয়াং-এর মতানুসারে চলতে বাধ্য হবেন, তা বলাই বাহুল্য।

অপরদিকে হু জিনটাও নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন নন। তাই জিয়াং ধরে নিয়েছেন যে, তাঁকে পুতুলের মতো চালনা করার কাজটাও অনেক সহজ হবে। অনেকে মনে করেন যে, এই কারণেই জিয়াং হু-র মনোনয়ন বিনা প্রতিবাদে সমর্থন করেছেন। কারণ হু-র নীরবতাকে জিয়াং তাঁর দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছেন।

হু এবং জিয়াং-এর মধ্যে আরও একটা তফাত রয়েছে। প্রায় ১৩ বছর আগে জিয়াং যখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেন, তখন আড়াল থেকে দেঙ জিয়াও পিঙ তাঁকে মদত দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে হু-র পিছনে সেরকম কোনও মদতদাতা অনুপস্থিত।

কাজেই আজকের চীনা রাজনীতিতে সব থেকে বড় প্রশ্ন হল, হু কি জিয়াং-এর তোতাপাখি হয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন, না তিনি জিয়াং-এর সমস্ত চাল ভেদ কের নিজেকে সর্বময় কর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য চীনা রাজনীতিতে এরকম ক্ষমতার দ্বন্দ ও পেশীর লড়াই কোনও নতুন ব্যাপার নয়। গত ১৯৭৮ সালে ক্ষমতা পাওয়ার পর দেঙ জিয়াও পিঙ মাও-এর ঘনিষ্ঠ হুয়া গুয়োফেঙকে তাড়িয়ে নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তেমনই ক্ষমতা পাওয়ার পর জিয়াং জেমিন ১৯৮৯ সালে দেঙ-এর ঘনিষ্ঠ ঝাও জিয়াং-কে ক্ষমতাচ্যুত করেন। পরে ১৯৯৫ সালে আর এক দেঙ ঘনিষ্ঠ চেন্ জিটঙ-কে দুর্নীতির অপবাদে জেলে পাঠান।

তাই প্রশ্ন হল, হু কি তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অদূর ভবিষ্যতে কিছু কিছু জিয়াং ঘনিষ্ঠকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে পাঠাবেন? বেশির ভাগ পর্যবেক্ষকের মত হল, এই পথ অবলম্বন করা ছাড়া হু-র কোনও গত্যন্তর থাকবে না। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে হংকং-এর চাইনিজ ইউনিভারসিটির অধ্যাপক উ গুয়োগুয়াঙ বলেন, "জিয়াং-শিবিরের কিছু কিছু লোককে সরাবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হু-কে নিতেই হবে। এভাবে শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই হু-কে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" আমেরিকার হ্যামিলটন কলেজের অধ্যাপক চেন লি বলেন, "হু-কে দুর্বল ভেবে জিয়াং মারাত্মক ভুল করেছেন। উপরন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করেও জিয়াং ভুল করছেন। এর ফল হিসাবে অচিরেই চীনে দেখা দেবে প্রবল এক ক্ষমতার লড়াই।" আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চীন বিশেষজ্ঞ আর্থার ওয়ালড্রন-এর মত হল, "জিয়াং-এর যাওয়ার ইচ্ছা নেই, তাই তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন। কিন্তু এর ফল হবে মারাত্মক এক ক্ষমতার দ্বন্দ।"

তাই আজ পৃথিবীর সমস্ত চীন-বিশেষজ্ঞও তাকিয়ে আছেন বেইজিং-এর দিকে। কীভাবে সেই ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় তা দেখার জন্য। অনেকে আবার এই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, সেই ক্ষমতার লড়াইয়ের ফলে মার খাবে উন্নয়ন। তাই গু গুয়োগুয়াঙ বলেন, "জিয়াং

যে ক্ষমতার লড়াই ডেকে আনছেন, তার ফলে মার খাবে আর্থিক প্রগতি, মার খাবে রাজনৈতিক সংস্কারের প্রচেষ্টা।" অনেকে মনে করেন যে, প্রবল সেই ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে চীনা নেতারা ব্যাপক বেকারত্ব ও দুর্নীতির মতো জ্বলন্ত সমস্যার দিকে নজর দিতে ব্যর্থ হবেন, ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে।

উপরিউক্ত ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে জিয়াং কীভাবে তার মোকাবিলা করবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ থেকে তা কিছুটা আঁচ করা যায়। গত ৮ নভেম্বর কংগ্রেসের প্রারম্ভিক অধিবেশনে তিনি ৬৮ পৃষ্ঠার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। এই ভাষণে তিনটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। প্রথমত, দেঙ যে আর্থিক সংস্কার শুরু করে গিয়েছেন, তা চলতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একনায়কতান্ত্রিক শাসন চলতে থাকবে। এবং তৃতীয়ত, সামরিক বাহিনীকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে শক্তিশালী ও আধুনিক করে তুলতে হবে।

তাঁর এই বক্তৃতা থেকে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হল, বর্তমানে যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলছে, তা চলতে থাকবে। পুঁজিপতিরা শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করার কিছুটা সুযোগ পাবেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কঠিন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেই সে সুযোগ তাদের কাজে লাগাতে হবে। তাই জিয়াং পার্টির ক্যাডারদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "সময়ের সঙ্গে সবাই তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করুন এবং পুঁজিপতিদের জন্য লাল কার্পেট পেতে দিন।" সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের বলেছেন, "চীনের উন্নয়ন বিষয়ক যে কোনও ব্যাপারে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে পার্টি। আমাদের কর্তব্য হবে পার্টির কঠিন নিয়ন্ত্রণে দেঙ-এর পথে চলা।"

তা হলে জিয়াং-এর নিজস্ব 'তিন প্রতিনিধিত্ব' (Three Represents) তত্ত্বের কী ভূমিকা হবে? এ ব্যাপারে ওই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আমরা 'তিন প্রতিনিধিত্ব' তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করব বটে, তবে তা কখনই পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ হবে না।" তাঁর উক্তির তাৎপর্য হল, 'তিন প্রতিনিধিত্ব' তত্ত্বকে ব্যবহার করে পুঁজিপতিদের পার্টিতে আসার সুযোগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু পুঁজিপতিরা যদি নতুন কোনও দল তৈরি করে পাশ্চাত্যের ঢঙে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে তবে তা প্রতিহত করা হবে।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঘৃণ্য পুঁজিপতিদের এতদিন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু 'তিন প্রতিনিধিত্ব' তত্ত্ব কংগ্রেস দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার ফলে এখন পার্টি সংবিধান সংশোধন করা সম্ভব হবে। কাজেই পার্টির সদস্য হতে পুঁজিপতিদের আর বাধা থাকবে না। এমনকি, কিছু কিছু প্রভাবশালী পুঁজিপতিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য করা চলতে পারে। (এবারের কংগ্রেস চীনের সর্বাপেক্ষা বড় রেফ্রিজারেটর কোম্পানির মালিককে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করেছে।)

কিন্তু পুঁজিপতিরা যদি কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্ব অমান্য করে? বিদ্রোহ করে, বা অন্য দল তৈরি করে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে? এখানে আসছে জিয়াং-এর তৃতীয় মন্তব্য। পিপলস্ লিবারেশন আর্মি বা সেনাবাহিনী থাকবে পার্টির নিয়ন্ত্রণে। এ ব্যাপারে জিয়াং বলেছেন, "সেনাবাহিনী (পি এল এ) যে সব সময় পার্টির মূল নীতির প্রতি আনুগত্য দেখাবে এবং পার্টির নিয়ন্ত্রণে চলবে, এ ব্যাপারে কোনও দোদুল্যমানতা (Wavering) চলবে না।" কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পার্টির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এলে পার্টি তার সেনাবাহিনী দিয়েই তা বানচাল করার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে আছে ১৯৮৯ সালে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারের গণহত্যা।

কিন্তু কথা হল, নতুন নেতা হু জিনটাও কতদিন জিয়াং-এর পুতুল হিসাবে কাজ করতে রাজি হবেন? তাঁর চেয়েও বড় প্রশ্ন হল, পুঁজিপতিরা কতদিন পার্টির নেতাদের দাদাগিরি সহ্য করবেন? পুঁজিপতিরা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবেন, কিন্তু ক্ষমতা থাকবে পার্টি-নেতাদের হাতে, এরকম একটা অবস্থা কি বেশিদিন চলতে পারে? সাধারণভাবে একটা পরিবারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যেই ব্যক্তি টাকা রোজগার করেন, শেষ কথা বলার অধিকারও তাঁর হাতেই চলে যায়।

মার্কসবাদী তত্ত্বও ওই একই কথা বলে। ওই তত্ত্ব বলে যে, কোনও দেশে বা সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোটাই হল মূল কাঠামো এবং এই মূল কাঠামো অনুসারেই সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিকাঠামোগুলো গড়ে ওঠে। কাজেই চীনের ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য।

অর্থাৎ চীনে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলতে থাকলে সেখানকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা সবই সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি অনুসারে গড়ে উঠবে। মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী এটা অবশ্যম্ভাবী এবং একে কেউ রুখতে পারবে না। অর্থাৎ পুঁজিপতিরা তাদের আর্থিক ক্ষমতার প্রভাবেই তাঁদের মনোমতো রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলবেন।

সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা বহুদলীয় গণতন্ত্র ছাড়া আর কী হতে পারে? আজকের এই বহুদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা আকাশ থেকে পড়েনি। পুঁজিবাদই এই ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে এবং পুঁজিবাদই এই ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রেখেছে। কাজেই চীনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে তা দুরাশা মাত্র। কাজেই প্রশ্ন থাকছে, চীনে সেই বহুদলীয় গণতন্ত্র কেমন করে আসবে?

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, জিয়াং যেভাবে হু জিনটাও-কে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার ব্যবস্থা করেছেন, তা থেকে মুক্তি পেতে হু-র প্রয়োজন হবে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক লবির সমর্থন। এবং উদীয়মান পুঁজিপতিদের লবি-র কাছ থেকেই হু সেই সাহায্য পেতে পারেন। কাজেই ভবিষ্যত চীনা রাজনীতিতে হু হয়ে উঠবেন পুঁজিপতি শক্তির প্রতিভূ। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা আরও মনে করেন যে, আগামী মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে হু কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেবেন না।

কাজেই রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর হু কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদি তিনি পুঁজিপতি শক্তির সঙ্গে হাত মেলান, তবে তাঁর প্রথম কাজই হবে চীনের মানুষকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া। চীনা গণতান্ত্রিক দল (Chinese Democratic Party) ও ফালুন গঙ শরীরচর্চার উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞর ধারণা যে, হু এই সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তিনি অভূতপূর্ব জনসমর্থন পাবেন। কারণ চীনের সাধারণ মানুস আজ কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ব্যাপক বেকারত্ব তাদের অসহিষ্ণুতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাজেই আশা করা যায় যে, আগামী মার্চ মাসে হু জিনটাও রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করার পর থেকেই চীনে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তবে সেই পট-পরিবর্তন রাশিয়ার 'পেরেস্ত্রোইকা'র মতো শান্তিপূর্ণভাবে হবে না রক্তক্ষয়ী হবে, তা নির্ভর করছে জিয়াং জেমিন ও সেনাবাহিনী কতটা বিরোধিতা করবে তার ওপর।

মার্কসবাদের শবদেহটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কবরস্থ করেছেন চীনের কমিউনিস্ট নেতারা

অবশেষে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করল যে, আগামী নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে (২০০২) পার্টির ১৬শ কংগ্রেস বেইজিং-এ শুরু হবে। পাঁচ বছর পর পর, সাধারণত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে থাকে। তাই এবারের কংগ্রেস বসছে প্রায় দুমাস দেরিতে। কমিউনিস্ট পার্টি তথা চীন সরকারের সর্বোচ্চ পদগুলো কোন্ কোন্ নেতা অলঙ্কৃত করবেন, এই পার্টি কংগ্রেসেই তা নির্ধারিত হয়। তা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন নতুন সিদ্ধান্তও এই কংগ্রেসেই গৃহীত হয়।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী ১৯৯৭ সালের কংগ্রেসেই রাষ্ট্রপতি জিয়াং দ্বারা আনীত বিশেষ প্রস্তাব 'জিয়াংপ্ল্যান' অনুমোদিত হয়। যার মধ্যে দিয়ে চীনের সমস্ত রাষ্ট্রয়ত্ত্ব শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে পাইকারি দরে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই কংগ্রেস শ্রী জিয়াং জেমিন-এর আরও ৫ বছর রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকাও অনুমোদন করে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের অনুমান যে, উপর-মহলের নেতাদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই এবারের কংগ্রেস দেরিতে শুরু হচ্ছে। তবে উৎকণ্ঠার এখনও অবসান হয়নি। কোন্ নেতা থাকছেন, আর কোন্ নেতা যাচ্ছেন, তা এখনও অনিশ্চিত।

অনেকে মনে করেন যে, কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই শ্রী জিয়াং রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেবেন এবং তাঁরই মনোনীত শ্রী হু জিন্‌টাও নতুন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবেন। শ্রী হু-র বয়স ৫৯ বছর এবং বর্তমানে শ্রী হু জিন্‌টাও উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছেন। তা ছাড়া 'পলিটব্যুরো স্ট্যান্ডিং কমিটির'র তিনি একজন মাননীয় সদস্য। তাই রাষ্ট্রপতি পদের তিনিই উপযুক্ত দাবিদার। অপরদিকে শ্রী জিয়াং ৭৬ বছর পার করেছেন এবং বিগত ১৩ বছর ধরে চীনের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হিসাবে কাজ করছেন। তাই অবসর গ্রহণ কারই তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

শ্রী জিয়াং জেমিন বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছেন। প্রথমত তিনি চীনের রাষ্ট্রপতি। দ্বিতীয়ত, তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কর্ণধার এবং তৃতীয়ত, তিনিই হলেন চীনা সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক বা কমান্ডার-ইন্-চিফ।

চীনা সংবিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি দশ বছরের বেশি রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারেন না। আগামী বছরের গোড়ার দিকে শ্রী জিয়াং-এর সেই মেয়াদ পূর্ণ হবে। কাজেই, ইচ্ছায় হোক

আর অনিচ্ছায় হোক, রাষ্ট্রপতির পদ তখন তাঁকে ছাড়তেই হবে। তবে সামরিক পদটি তিনি নাও ছাড়তে পারেন। তাঁর পূর্ববর্তী নেতা দেঙ জিয়াওপিঙ সব পদ ছেড়ে দেবার পরও দু বছর সামরিক পদটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তবে শ্রীহু এবং অন্যান্য নেতাদের মনোগত ইচ্ছা হল, শ্রী জিয়াং তিনটি পদ থেকেই ইস্তফা দিন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, জিয়াং যদি তাঁর পদ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন? এই দুশ্চিন্তার কারণ হল, শ্রীজিয়াং সরকারি আমলাদের মধ্যে 'জিয়াংকে রাখতে হবে' এরকম একটা হাওয়া তৈরি করার জন্য তলে তলে প্রচার চালাচ্ছেন। তা ছাড়া সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে তিনি প্রচার চালাচ্ছেন যে—জিয়াং এক অপরিহার্য্য ব্যক্তিত্ব এবং তিনি চলে গেলে ব্যাপক সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেবে।

যাই হোক, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা হল, রাষ্ট্রপতি জিয়াং-এর 'তিন প্রতিনিধিত্ব তত্ত্ব' (Three Represents Concept) কে পার্টি-সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা। বহু বিতর্কিত এই 'তিন প্রতিনিধিত্ব তত্ত্ব'কে মার্কসবাদের নবতম সংশোধন হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে বটে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল, সংশোধনের ভাঁওতার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের সার্বিক বর্জন।

মাও সে তুঙ চেয়েছিলেন শ্রেণীহীন, শোষণহীন এবং ব্যক্তিমালিকানাহীন এক আদর্শ সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, দেশ তত দিন সেই দিকেই চলছিল। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরী দেঙ জিয়াওপিঙ বুঝতে পারলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প-সংস্থার উপর নির্ভর করে কোন অর্থনীতি টিকে থাকতে পারে না। তিনি আরও বুঝতে পারলেন যে, রাষ্ট্রয়ত্ত্ব উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব এক অলীক কল্পনা মাত্র।

তাই প্রায় দু-দশক আগে, চীনের অর্থনীতিকে পতনের হাত থেরে রুক্ষা করতে তিনি সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কাঠামোর কোন পরিবর্তন শ্রীদেঙ করলেন না। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে চীন আজ সারা বিশ্বের মধ্যে এক চমৎকারী দেশে পরিণত হয়েছে—যেখানে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিচালিত হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি একনায়কতন্ত্রী সরকারের দ্বারা।

এই চরম অসঙ্গতিকে আড়াল করার জন্য চীনা নেতারা প্রচার করতে শুরু করলেন যে, এটা হল 'সমাজতন্ত্রের চীনা সংস্করণ'। আমাদের দেশের মহান মার্কসবাদী নেতারাও সমস্বরে ওই একই মিথ্যা প্রচার করতে থাকলেন। উদ্দেশ্য, প্রথমত চীনে মার্কসবাদের চরম ব্যর্থতাকে গোপন করা এবং দ্বিতীয়ত, এ দেশের জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া।

কিন্তু সত্যকে বেশিদিন গোপন করা চলে না। ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর চীনে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে, গজিয়ে উঠল সম্পূর্ণ নতুন এক পুঁজিপতি শ্রেণী। এবং বর্তমানে এই শ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশীল শ্রেণী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। বেইজিং-এ

অবস্থিত 'চাইনীজ অ্যাকাডেমি অফ সোস্যাল সাইন্সেস'-এর তথ্য বলছ যে, এই নব্য পুঁজিপতিদের মধ্যে ১০,০০০ পুঁজিপতির প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ডলার (প্রায় ৫০ কোটি টাকা)-এর বেশি। ওই সংস্থার আর একটি তথ্য বলছে যে, চীনের এই পুঁজিপতিরা সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে ধনবান হচ্ছে। গত ১৯৯৮-৯৯ সালে এই সংস্থার ১০০ জন সর্বাপেক্ষা ধনী পুঁজিপতির এক তালিকা তৈরি করেছিল। সেই তালিকায় যিনি ৫০ তম স্থান দখল করেছিলেন, তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ডলার বা ৩০ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমান বছরে যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ৫০ তম স্থানাধিকারীর সম্পত্তির পরিমাণ ১১ কোটি ডলার বা ৫৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ৩ বছরে চীনা পুঁজিপতিদের গড় সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় ২০ গুণ।

এঁদের আর্থিক ক্ষমতা তুলে ধরতে আরও একটা উদাহরণ দেওয়া চলতে পারে। ঝে-লিয়াং প্রদেশের হুয়াং কিয়াওলিঙ এই নব্য পুঁজিপতিদের একজন। পর্যটন ও প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যবসা করে আজ তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ১০০ কোটি ডলার (বা ৫,০০০ কোটি টাকা) অতিক্রম করে গিয়েছে। সম্প্রতি শ্রীহুয়াং তাঁর আপন শহর হ্যাঙঝাউ-এ একটা বড়ী তেরি করেছেন, যা মার্কিন রাষ্ট্রপতির বাসস্থান 'হোয়াইট হাউস'-এর এক অবিকল প্রতিরূপ। অফিস, বৈঠকখানা থেকে সুরু করে ডাইনিং হল, রান্নাঘর, শোবার ঘর, সবই 'হোয়াইট হাউস'-এর অবিকল নকল। শ্রী হুয়াং সবাইকে গর্বের সাথে বলেন, "যা দেখছেন সবই অবিকল ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের মত। তফাৎ শুধু এই যে, আমিই এসব কিছুর মালিক।"

বাড়িটি তৈরি করতে হুয়াং খরচ করেছেন প্রায় ১ কোটি ডলার (৫০ কোট টাকা)। চীনের কমিউনিস্ট সরকার তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে চিঠি লিখেছিল, "কেন আপনি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জঘন্য সাম্রাজ্যবাদীর বাড়িকে নকল করেছেন?" জবাবে শ্রীহুয়াং লিখেছেন, "আমার টাকা খরচ করে আমি যা খুশি তৈরি করতে পারি।"

কিন্তু চীনা সরকারের কাছে সমস্যা হল, কেমন করে আর্থিক দিক দিয়ে বলবান এই নতুন শ্রেণীকে রাজনীতি, তথা দেশের শাসন ক্ষমতায় নিয়ে আসা যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা যে, আসন্ন পার্টি-কংগ্রেসে এটাই হবে সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত বিষয়।

নেতাদের অনুমান কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দাবি তুলবে যে, নব্য এই পুঁজিপতিদের পার্টিতে সামিল করা হোক। তাঁরা আরও ভীত এই কারণে যে, অনেকে হয়তো দাবি তুলবে বিশিষ্ট কিছু পুঁজিপতিকে পার্টির 'কেন্দ্রীয় কমিটি'-র সদস্য করা হোক। তার চেয়েও আশঙ্কার কথা হল, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে, তারা দাবি তুলবে—এ কাজের জন্য প্রয়োজন হলে কমিউনিস্ট পার্টির নাম বদল করতে হবে, বা প্রয়োজনে 'কমিউনিস্ট' শব্দটা বাদ দিতে হবে।

এ সব চিন্তা মাথায় রেখেই রাষ্ট্রপতি জিয়াং বছর দুই আগে 'তিন প্রতিনিধিত্ব তত্ত্ব' নামক এক উদ্ভট তত্ত্ব খাড়া করেছেন। এই তিন প্রতিনিধিরা হল, (১) অগ্রবর্তী উৎপাদক শক্তি

(Advanced Production Forces), যা বকলমে নব্য পুঁজিপতি শ্রেণীকে বোঝায়; (২) অগ্রবর্তী সংস্কৃতি (Advance Culture), যা পরিবর্তিক রাজনৈতিক কাঠামোকে বোঝায়; এবং (৩) জনগণের বৃহৎস্বার্থ (Broad Interest of the Public), যা শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ বোঝায়।

মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে পুঁজিপতিরা হল সমাজের শত্রু, শ্রমিক-কৃষকের শোষক। এদের ঝাড়ে-বংশে নিশ্চিহ্ন করাই কমিউনিস্টদের একমাত্র কর্তব্য। এ হেন শ্রেণীশত্রুদের 'অগ্রবর্তী উৎপাদক শক্তি'-র নাম করে কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢোকালে তা যে আর কমিউনিস্ট পার্টি থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই কট্টরপন্থী নেতারা জিয়াং-এর তত্ত্বকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখছেন।

শ্রীবাও টং এই কট্টরপন্থী নেতাদের মধ্যে একজন। শ্রীবাও লিখেছেন, "চীনা নেতারা আজ নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছেন। অথচ ১৯৪৯ সালে ক্ষমতায় আসার সময় নেতারা তাদের হাতে চাঁদ পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই সব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে, বেইজিং-এর 'রিসার্চ সেন্টার ফর কন্টেম্পোরারী চাইনিজ পলিটিক্সের'-এর অধ্যাপক শ্রী লিন্ হঙ বলেন, "চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় চীনা রাজনীতিরও পরিবর্তন আবশ্যক। আজকের চীনা রাজনীতিতে একাধিক প্রতিনিধিত্বকারী (pluraistic) রাজনীতির প্রবেশ যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে ব্যাপক এক সামাজিক অস্থিতরা (social instability) অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।" অর্থাৎ শ্রী লিন্ যা বলতে চাইছেন তা হল, বর্তমান চীনের প্রয়োজন হল একটি বহু-দলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি। কিন্তু চীনা নেতারা যদি কমিউনিস্ট পার্টির এক-দলীয় শাসন চালিয়ে যাবেন বলে গোঁ ধরে থাকেন, তবে তার পরিণাম হবে ব্যাপক এক সামাজিক অস্থিরতা। এখানে 'সামাজিক অস্থিরতা'র নামান্তরে শ্রী লিন্ যে একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব' বোঝাতে চাইছেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, আজকের চীন শুদু নামেই কমিউনিস্ট। সেখানে আজ ব্যক্তিমালিকানা ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত। সাংহাই হয়ে উঠছে এশিয়ার ব্যস্ততম শেয়ার-বাজার। চীনের ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা আজ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। দেশের শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে ওই সব ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বিশাল এই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে আজও নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্রী সরকার। এই চূড়ান্ত অসঙ্গতিকে চীনা নেতারা এত দিন 'সমাজতন্ত্রের চীনা সংস্করণ" বলে চালিয়ে আসতে পেরেছেন। কিন্তু সেই ভাঁওতা আজ আর চালানা সম্ভব হচ্ছে না। নিজেদের বাঁচার তাগিদেই নব্য পুঁজিপতিদের, যেমন করেই

হোক না কেন, শাসন ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অন্যথায়, আজকের নেতাদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে নব্য পুঁজিপতিরা অদূর ভবিষ্যতে শাসন ক্ষমতা দখল করে নেবে। এই কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য তৈরি হয়ে আছে চীনা-গণতান্ত্রিক দল (Chinese Democratic Party) এবং নিপীড়িত 'ফালুঙ-গঙ' সদস্যরা।

তাই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস যে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আসন্ন ১৬শ কংগ্রেস নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে। জিয়াং জেমিন তাঁর পদ ছেড়ে দেবেন। শ্রী হু জিনটাও হবেন চীনের নতুন রাষ্ট্রপতি। জিয়াং-এর 'তিন প্রতিনিধিত্ব তত্ত্ব'-ও প্রায় বিনা বাধায় গৃহীত হবে। এবং এভাবেই চীনে মার্কসবাদের শ্মশানযাত্রা সম্পূর্ণ হবে।

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে, প্রায় এক দশক আগে সোভিয়েট রাশিয়ার পতন এবং চীনেরর বর্তমান ঘটনাবলীর এটাই প্রমাণ করছে যে, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব মার্কসের এক অলীক কল্পনার ফসল মাত্র, যার বাস্তব রূপায়ন অসম্ভব। নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই এই তত্ত্ব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হবে। কিন্তু, কি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব?।

মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের মূল কথাই হল, ব্যক্তিমালিকানার অবসান ঘটিয়ে কল-কারখানা, চাষবাস, অর্থাৎ সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকেই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কোন উৎপাদন ব্যবস্থাই লাভজনকভাবে চলতে সক্ষম নয়। এই মূল অন্তর্দ্বন্দ্বই মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের তত্ত্বকে এক অলীক তত্ত্বে পরিণত করেছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ওপর চীনা কমিউনিস্ট সরকারের আসুরিক দমন পীড়ন

চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা 'জিনহুয়া'-র খবর অনুসারে গত ২৩ জানুয়ারি (২০০১ খ্রীঃ) বেজিং শহরের তিয়া নান্ মেন্ স্কোয়ারে ফালুন-গঙ মতাদর্শে বিশ্বাসী পাঁচজন সদস্য গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতির চেষ্টা করে। ওই দিন বেলা প্রায় ২টা ৪০ মিনিটে চারজন মহিলা ও একজন পুরুষ সদস্য গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন দেয়। একজন মহিলার ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং ব্যকিদের পুলিশ উদ্ধার করে। বিগত প্রায় দেড় বছর ধরে চীন সরকার তাদের ওপর যে দমন পীড়ন চালিয়ে আসছে তার প্রতি ধিক্কার জানাতে এবং বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের সহানুভূতি আদায় করতেই যে তারা আত্মোৎসর্গের এই করুণ পথ বেছে নিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য।

এর ঠিক দশ দিন আগে, গত ১৩ জানুয়ারি, প্রায় ২০ হাজার ফালুন-গঙ সদস্য হংকং-এর ভিক্টোরিয়া পার্কে সমবেত হয়ে সরকারে বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। এর পর তারা হংকং-এর সিটি হলে এক সভা করে। সেই সভায় তারা ফালুন-গঙের ওপর থেকে সমস্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার দাবী জানায় এবং তাদের প্রতি অন্যায় জুলুম বন্ধ করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ফালুন-গঙ শরীরচর্চা চীনের মূল ভূখণ্ডে নিষিদ্ধ হলেও হংকং-এ তা এখনও নিষিদ্ধ নয়।

তবে গত ১৩ জানুয়ারির ঘটনা চীনা নেতাদের যে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। তাই হংকং-এর অনুগত আমলা গোষ্ঠীর কাছে ইতিমধ্যে এক গোপন নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, সেখানে ফালুন-গঙের কার্যকলাপ যেন যে কোনভাবে বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। এই নির্দেশের ফলেই হংকং-এর সর্বোচ্চ আমলা, চীফ এক্সিজিউটিভ টুং চি হোয়া সম্প্রতি ঘোষণা করেন যে, ফালুন-গঙ হল এক রকমের ডাকিনীবিদ্যা। অপর দিকে প্রকাশ্যে ফালুন-গঙের নিন্দা করতে অসম্মত হবার ফলে আরেক উচ্চপদস্থ আমলা আন-সন চান-কে পদচ্যুত করা হয়। এই সমস্ত ঘটনা থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে, খুব শীঘ্রই ফালুন-গঙ শরীরচর্চা হংকংয়েও নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে।

প্রকৃতপক্ষে ফালুন-গঙ হল শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে বিশেষভাবে হাত পা চালিয়ে এক প্রকার শরীরচর্চা। এর ফলে শরীর-স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি, মনোবৃত্তি ও

আধ্যাত্মিক চেতনারও উন্নতি হয়। এই শরীরচর্চার উদ্ভাবকের নাম লি হোংঝি। ১৯৯৪ থেকে তিনি আমেরিকার নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। এই বিষয়ের ওপর লি অনেক পুস্তকও রচনা করেছেন। লি-র মতে এই শরীরচর্চা যে নিষ্ঠা সহকারে করবে, তার মনে এক দিব্য প্রশান্তি আসবে এবং সে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য হবে। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের মতে এটা এক রকমের হাতুড়ে ডাইনী বিদ্যা মাত্র এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বাস্তবিক পক্ষে মার্ক্সবাদ হল সম্পূর্ণ বস্তুবাদী এবং কঠোরভাবে নিরীশ্বরবাদী এক আসুরিক তত্ত্ব। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ অনুসারে এ হল এক 'শিশ্নোদর' (শিশ্নো + উদর) তত্ত্ব। অর্থাৎ সেই তত্ত্ব আহার ও মৈথুনকেই একমাত্র বিবেচ্য জ্ঞান করে এবং যার সমস্ত আলোচনাই আহার ও মৈথুনে সীমাবদ্ধ। তাই আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরবিশ্বাসের লেশমাত্র স্থানও মার্কসবাদে নেই। মহা পণ্ডিত মার্ক্স বলে গিয়েছেন যে, ধর্মবিশ্বাস হল আফিম। কাজেই দুনিয়ার সমস্ত মার্ক্সবাদীর প্রাথমিক কর্তব্য হল, ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদিকে আফিমের মতই বর্জন করা।

তাই ১৯৩০-এর দশকে কৃষির রাষ্ট্রীয়করণের সময় রাশিয়ার মহান কমিউনিস্ট নেতা যোসেফ স্টালিন ডাক দিলেন যে, ভেজা কাপড় থেকে লোকে যেমন করে জল নিংড়ে ফেলে, চাষীদের মন থেকেও ঠিক সেইভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার মোহ ও ধর্মবিশ্বাসকে নিংড়ে ফেলতে হবে। এই মহান নির্দেশকে কার্যে পরিণত করার জন্য মস্কোর ও লেনিনগ্রাদের কলকারখানাগুলো থেকে বেছে নেওয়া হল অত্যন্ত অনুগত ২০,০০০ শ্রমিক এবং 'টুয়েন্টি থাউসেন্ডার' নামে পরিচিত এই শ্রমিকদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হল সমবায় কৃষি খামার গড়ে তুলে চাষীদের সাহায্য করার জন্য।

এই 'টুয়েন্টি থাউসেন্টার'-এর কি করে চাষীদের জমিজায়গা, গরু-বলদ, হাঁস-মুরগী, সব গায়ের জোরে কেড়ে নিয়ে কৃষি-খামার গড়ে তুলল তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক মিখাইল শলোকভ তাঁর 'Virgin Soil upturned' উপন্যাসে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার থেকেও বড় কথা হল, ওই টুয়েন্টি থাউসেন্ডার'-রা কি করে গায়ের জোরে, অত্যাচার উৎপীড়নের দ্বারা চাষীদের গীর্জায় যাওয়া বন্ধ করেছিল এবং গীর্জার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল, তাও মিখাইল শলোকভ সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

যে সব চাষীরা এই সব দানবীয় কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ করল, ওই 'টুয়েন্টি থাউসেন্ডার'-এর দল তাদের চিহ্নিত করল শ্রেণীশত্রু বা বিপ্লবের শত্রু, বা শ্বেত-সন্ত্রাসবাদী হিসাবে। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের চালান করে দেওয়া হল 'গুলাগ' নামে পরিচিত সাইবেরিয়ার শ্রম শিবিরগুলোতে। নামে শ্রমশিবির হলেও সেগুলো ছিল কসাইখানা। লক্ষ লক্ষ চাষীকে সেখানে হত্যা করা হয় এবং মৃতদেহ গায়েব করে ফেলা হয়। এটাই কমিউনিস্টদের কাজের ধরণ। গোলমাল সৃষ্টিকারী বিরোধী মত পোষণকারীদের এই দুনিয়া থেকে চিরকালের মত উধাও করে দাও।

স্ট্যালিনের সময় গুলি করে কিংবা গ্যাসচেম্বারে মেরে গণকবর দেওয়া কিংবা সাইবেরিয়ার বনে ছেড়ে দিয়ে আসাটাই ছিল স্বীকৃত মার্কসীয় পদ্ধতি। কিন্তু বিশাল বিশাল জেট প্লেনের আবিষ্কার আজ এই সব দানবীয় কাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ৪০০/৫০০ লোককে প্লেনে করে নিয়ে গিয়ে হাত, বা বাঁধা অবস্থায় মাঝ সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেওয়াই হয়েছে আজকের উন্নত ও বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় পদ্ধতি। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আজকের চীনে এই সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই বেশ কয়েক হাজার ফালুন-গঙ কর্মকর্তাকে উধাও করা হয়েছে।

তবে মনীষা মুখার্জী, ভিখারী পাশোয়ান এবং সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার ছোট আঙ্গাড়িয়া গ্রামের ১৮ জন গ্রামবাসীর মৃতদেহ উধাও করতে আমাদের মার্কসবাদীরা কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা এখনও জানা যায়নি। সব থেকে মজার কথা হল, এই সব নৃশংস, বর্বর, শীতল খুনীদের নেতা, আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রায়শই 'বর্বর' বলে গালি দিয়ে থাকেন। অথচ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, গীতার ১৬ অধ্যায়ে অসুর প্রকৃতির লোকের মধ্যে যত রকমের সম্ভাব্য বর্বরতা ও বদগুণের কথা বলা আছে, তার সবগুলোই ওই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

তবে ভাগ্যের কথা হল এই যে, আমাদের দেশে একটা কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সংবিধানের অস্তিত্ব রয়েছে। তা না হলে বিগত ২৪ বছরের রাজত্বকালে আমাদের মার্ক্সবাদীরা কত যে লক্ষ লক্ষ মনীষা ও লক্ষ লক্ষ ভিখারী পাশোয়ানকে চিরকালের জন্য বেমালুম উধাও করে ফেলতো তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই। 'গণশক্তি' ছাড়া আর সব খবরের কাগজ নিষিদ্ধ হত এবং এসব কোন খরবই 'গণশক্তি'তে প্রকাশিত হত না।

যাই হোক, স্ট্যালিন তাঁর দমন-পীড়নের দ্বারা রাশিয়ার মানুষের গীর্জায় যাওয়া বন্ধ করলেন বটে, কিন্তু তাদের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস নিংড়ে বার করতে পারলেন না। সোভিয়েত সংঘের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা দলে দলে গীর্জায় যেতে শুরু করল। বহুদিন অব্যবহারের ফলে গীর্জাগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তারা মেরামত করে আবার সেগুলোকে সুন্দর করে তুলল।

রাশিয়ায় বহু কৃষ্ণভক্ত আছেন। আজ মস্কো সহ রাশিয়ার বড় বড় শহরগুলিতে শ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এত দিন তাদের গোপনে কৃষ্ণ নাম করতে হত এবং কমিউনিস্ট সরকার জানতে পারলে জেলে ঢুকিয়ে দিত। কিন্তু আজ আর সে ভয় নেই। কৃষ্ণ ভক্তরা এখন প্রকাশ্যেই ধর্মাচরণ করতে পারছেন।

এসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, ভিজে কাপড় থেকে জল নিংড়ে ফেলার মত গায়ের জোরে মানুষের মন থেকে ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাকে নিংড়ে ফেলা যায় না। 'আমি কে?' কেনই বা এই জগতে এসেছি? কোথা থেকে এসেছি এবং মৃত্যুর পর আবার কোথায় যাব?" এই সব চিরন্তন প্রশ্ন মানুষ করবেই এবং গায়ের জোরে তা বন্ধ করা সম্ভব নয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, ইতর প্রাণীরা এইসব প্রশ্ন করে কাউকে বিব্রত করে না। কাজেই বলা চলে যে, মার্কসবাদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ইতর পশুতে পরিণত করা এবং মনুষ্য সমাজকে এক পশুর সমাজে পরিণত করা। মানুষ খাবে দাবে, মৈথুন করবে আর সুখে নিদ্রা যাবে। পার্টি তাদের যেমনভাবে চলতে বলবে, তারা সেইভাবেই চলবে। পার্টি তাদের যেভাবে ভাবতে বলবে, তারা শুধু সেভাবেই ভাববে। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। মনুষ্য সমাজ হবে শৃঙ্খলিত এক পশুর সমাজ। শৃঙ্খল থাকবে পার্টির হাতে। যে এই কঠোর নিয়মের বিন্দুমাত্র উল্লঙ্ঘন করবে, সে-ই ঘৃণিত শ্রেণীশত্রু। বিপ্লবের শত্রু এবং বধযোগ্য।

প্রকৃত সত্য হল, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাক্স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার না করলে মার্কসবাদী তত্ত্বই লুপ্ত হবে। কমিউনিস্ট সরকার বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়বে। এই কারণেই চীনের মার্কসবাদী সরকার তিব্বতের বৌদ্ধদের নানাভাবে উৎপীড়ন করে চলেছে। সেখানকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের হত্যা করছে। এই কারণেই চীনের মার্কসবাদী সরকার ১৯৮৯ সালের ৪ জুন, তিয়া-নান মেন চত্বরে হাজার হাজার গণতন্ত্রকামী ছাত্রকে মেশনিগান দিয়ে গুলি করে এবং ট্যাংক দিয়ে পিষে এক পৈশাচিত নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। এবং এই কারণেই গত ১৯৯৯ সালের ২২ জুলাই চীনের কমিউনিস্ট সরকার ফালুন-গঙ আধ্যাত্মিক শরীরচর্চাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তার অনুসরণকারীদের ওপর বর্বর দমন পীড়ন শুরু করেছে।

চীনা ফালুন-গঙ শব্দ দুটোর আক্ষরিক অর্থ হল, 'শ্বসন-চক্রকে উদ্দীপিত করার নিয়ম।" অনেক কাল আগে থেকেই চীনে কী-গঙ নামে এক প্রকার শরীরচর্চার প্রচলন ছিল এবং আজকের ফালুন-গঙ হল সেই কী-গঙেরই এক নতুন সংস্করণ। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রায় ৫০ বছর বয়সী লি হোংজি নামে এক ব্যক্তি এই উন্নত পদ্ধতির উদ্ভাবক। পৃথিবীর সমস্ত ফালুন-গঙ সদস্যই লি-কে গুরু বলে মান্য করে। ফালুন-গঙের মূলতত্ত্ব বলছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই তলপেটে রয়েছে এক শক্তি-চক্র, যা সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বিশেষ ধরণের কিছু শরীরচর্চা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি-চক্রকে উদ্দীপিত করা সম্ভব। এই চক্র তখন ঘুরতে থাকে এবং সেই ব্যক্তির মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পায়। তখন সে হয় সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং লাভ করে পরম এক মানসিক শান্তি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, উপরিউক্ত তত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় কুন্ডলিনী তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এই ভারতীয় রাজযোগের তত্ত্বও আসন, প্রাণায়ম, ধ্যান বা এক কথায় নানাবিধ যোগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার কথা বলে। তাই বর্তমান লেখকের অনু[illegible]ন যে, কী-গঙ নামে পরিচিত সাবেক চীনা শরীরচর্চা ভারত থেকেই চীনে গিয়েছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা কুংফু ও কারাটে নামে পরিচিত ভারতীয় 'নিযুদ্ধ'র মত প্রাণায়ামের মধ্য দিয়ে কুণ্ডলিনী জাগরণের তত্ত্বও চীনে নিয়ে যান।

এই অনুমান আরও প্রবল হয় যখন লি হোংঝি লেখেন যে, তাঁর ফাগুন-গঙ তত্ত্বের মূল ভিত্তি হল ভগবান বুদ্ধের কর্মবাদ এবং অন্তিম লক্ষ্য হল বোধি (বা ব্রহ্মানন্দ) লাভ করা।

যাই হোক, এই তত্ত্ব চীনা নাগরিকদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করল। ১৯৯৪ সালে সমগ্র চীনে এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ লক্ষ, কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, ১৯৯৯ সালে তা ১০ কোটি ছাড়িয়ে গেল। এই বিশাল সংখ্যক সদস্যরা প্রতিদিন পার্কে পার্কে জমা হয়ে শরীরচর্চা করতে লাগল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা হল, আইন করে ধর্মাচরণ বন্ধ করে দেবার ফলে সাধারণ মানুষেব মধ্যে জমা হয়েছিল দারুণ এক আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এবং এই ক্ষুধা মেটাতেই দলে দলে মানুষ ফালুন-গঙের লাল-হলুদ পতাকাতলে এসে জড়ো হয়েছে।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বেজিং-এর এক শিক্ষাবিদ্ শিন্ মিঙ বলেন, "চীনের বর্তমান আর্থিক অগ্রগতির পিছনে লুকিয়ে আছে নানাভাবে বিধ্বস্ত, বিষন্ন ও লক্ষ্যহীন এক চীনা সমাজ। বস্তুবাদী মার্কসবাদ চীনের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী এক অচেনা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা চীনের সনাতন সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কার। হারিয়ে গিয়েছে চীনের মূল চরিত্র। এই কারণেই ফালুন-গঙের সত্য, শান্তি ও আধ্যাত্মিকতার আহ্বান চীনা জনগণকে আকৃষ্ট করছে। এর মধ্য দিয়ে তারা আত্মার মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে। খুঁজে পাচ্ছে সনাতন মূল্যবোধকে।" কিন্তু ফালুন-গঙের এই অভাবনীয় উত্থান চীনা কমিউনিস্ট নেতাদের অসম্ভব ভীত করে তুলল। সর্বাপেক্ষা ভয়ের কারণ হল তাদের ১০ কোটি সদস্য সংখ্যা যা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৩ কোটি সদস্য সংখ্যার তিন গুণেরও বেশি। তারা ভাবল, এই ১০ কোটি সদস্য একত্র হয়ে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। তাই নেতারা ও সরকারি খবরের কাগজগুলো প্রচার করতে শুরু করল যে, ফালুন-গঙ হল কমিউনিস্ট বিরোধী এক চক্রান্ত।

ইতিমধ্যে সরকার একটা তদন্ত কমিটি গঠন করল এবং এই তদন্ত কমিশনের লোকেরা ফালুন-গঙের সদস্য হয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল এবং গোপনে তাদের কথাবার্তা টেপ করতে শুরু করল। সরকারের এই কাজের প্রতিবাদ জানাতে ১৯৯৯ সালের ২৫ এপ্রিল প্রায় ২০,০০০ ফালুন-গঙের সদস্য বেজিং-এর সরকারি সদর দপ্তর জং নান্ হাই-এর সামনে বিশাল এক জনসমাবেশ করল। রাষ্ট্রপত জিয়াং জেমিন একটা গাড়ি থেকে গোপনে সেই সমাবেশ প্রত্যক্ষ করলেন এবং বললেন, "ফালুন-গঙ সত্যিই এক ভয়ঙ্কর আন্দোলন এবং সরকার এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে না।"

এর ফলশ্রুতি হিসাবেই জুলাই মাসের ২২ তারিখে ফালুন-গঙকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সরকারের তরফ থেকে কারণ দেখানো হল যে, ফালুন-গঙ আসলে এক ডাকিনী বিদ্যা এবং বৃহত্তর সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সরকার সেই সঙ্গে সাবেক কী-গঙকেও নিসিদ্ধ ঘোষণা করল এবং শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ধরপাকড় ও দমন পীড়ন।

প্রত্যেক শহরে ফালুন-গঙ কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করা হল। তাদের বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হল। গুরু লি হোংজিকে অপরাধী ঘোষণা করা হল এবং আমেরিকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইন্টারপেল-এর সাহায্য চাওয়া হল। বেজিং-এর বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হল ২০ লক্ষ বই ও টেপ করা ক্যাসেট। সেগুলোকে সব একত্র করে পুড়িয়ে ফেলা হল। বেজিং সহ সমস্ত শহরের ফালুন-গঙ সদস্যদের ধরে এনে খোলা আকাশের নীচে স্টেডিয়াম গুলোতে দিনের পর দিন আটক করা রাখা হল। ভবিষ্যতে কোনদিন ফালুন-গঙ শরীরচর্চ করবে না বলে যারা মুচলেকা দিল, একমাত্র তারাই মুক্তি পেল। বাকিদের বেদম মারা হল এবং উত্তর চীনের জেলগুলোতে চালান করে দেওয়া হল। প্রায় ১২০০ প্রধান কর্মকর্তাকে বেদমপ্রহার করার পর কোন এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বেজিং ও অন্যান্য শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় সাধারণ মানুষকে পুলিশ খানাতল্লাশি করে হয়রান করতে থাকল। এ পর্যন্ত ১২০ জন সদস্যকে পুলিশ হাজতে হত্যা করা হয়েছে। বেশ কয়েক হাজার কর্মকর্তা নিখোঁজ এবং বেশ কয়েক লক্ষ সদস্য জেল খাটছে বলে ফালুন-গঙের তরফ থেকে দাবি করা হয়।

এইসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কোন জিনিস কোন কমিউনিস্ট দেশেই নেই। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বেজিং এর শিক্ষাবিদ শিন পিঙ বলেন, "প্রকৃত পক্ষে এই সব দমন পীড়ন হল এক আহাম্মকের নীতি। এর ফলে সরকারের কোটি কোটি শত্রু জন্মাচ্ছে। যারা আগে মিত্র ছিল, তারাও আজ শত্রুতে রূপান্তরিত হচ্ছে।"

কিন্তু এই বর্বর দমন পীড়ন চালিয়েও সরকারের পক্ষে আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ সংগ্রহ সম্ভব হয়নি যে, ফালুন-গঙ একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং এর অন্তিম লক্ষ্য হল সরকারকে উৎখাত করা। অথচ, তা সত্ত্বেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা বা শিথিল করা হচ্ছে না এবং দমন পীড়নও বন্ধ করা হচ্ছে না। তবে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে বর্বর এই পশুশক্তির বিরুদ্ধে অন্তিমে মানবতার একদিন বিজয় ঘোষিত হবে। যেমন হয়েছে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলোতে।

পৃথিবীর একমাত্র কমিউনিস্ট দেশ উত্তর কোরিয়ার হালচাল

অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, এই পৃথিবীতে বিচিত্র একটি দেশ আছে, সেই দেশের সরকার সেই দেশের মানুষদের সরকারিভাবে তিনটি পৃথক দলে ভাগ করে দিয়েছে। এই তিন দলের মানুষদের চিহ্নিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে বিচিত্র তিনটি নামও দেওয়া হয়েছে। প্রথম দলের মানুষের নাম টম্যাটো, দ্বিতীয় দলের মানুষের নাম আপেল এবং তৃতীয় দলের মানুষের নাম আঙুর। সেখানে আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার চলছে। গত ১৯৯৪ সালে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তা সত্ত্বেও সেই মৃত ব্যক্তি আজও সরকারি কাগজপত্রে প্রেসিডেন্টের পদে বহাল রয়েছেন।

বিচিত্র সেই দেশটির নাম উত্তর কোরিয়া, যেখানে আজও বিশুদ্ধ মার্কসবাদী সরকারের শাসনে বিশুদ্ধ মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বিরাজ করছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হয়েছে তা প্রায় এক দশক হল। সম্প্রতি চীনের নেতারাও মার্কসবাদকে বর্জন করে সেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু উত্তর কোরিয়া আজও তার সতীত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। ঘৃণ্য পুঁজিবাদ তাকে আজও স্পর্শ করতে পারেনি। নিশ্ছিদ্র একনায়কতন্ত্র, বা মার্কসবাদের ভাষায় শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র, আজও সেখানে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।

এহেন বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক সরকার, যার নাকি ঘোষিত উদ্দেশ্য হল মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়ে আদর্শ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বিগত ছয়ের দশকে 'সঙবুন' (Songbun) বা 'বংশ-পরম্পরা' নামে সে এক আইন জারি করল। এবং সেই আইন অনুসারে দেশের জনসাধারণকে তিন ভাগে ভাগ করা হল।

কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি যাদের আনুগত্য সন্দেহাতীত, সেই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ চিহ্নিত হল টম্যাটো নামে। কারণ, টম্যাটোর মতো তাদের বাইরেটাও লাল, ভিতরটাও লাল। পরবর্তী এক-তৃতীয়াংশ মানুষ, কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি যাদের আনুগত্য অছে, কিন্তু তা তেমন গভীর নয়, তারা হল আপেল। কারণ, আপেলের মতো তাদের শুধু বাইরের খোসাটাই লাল, কিন্তু ভিতরটা সবুজ।

বাদবাকী মানুষ হল আঙুর। কারণ তাদের মধ্যে লালের ছিটেফোঁটাও নেই। বাইরে এবং ভিতরে সবটাই সবুজ।

এই আঙুররা হল উত্তর কোরিয়ার সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত জনসমষ্টি। এদের সামাজিক মর্যাদা ক্রীতদাসের সমতুল। যত কায়িক পরিশ্রমের কাজ, যেমন কৃষিকাজ, কল কারখানায় নিম্ন শ্রমিকের কাজ,রাস্তা তৈরি ও মেরামতের কাজ, মুটে-মজুরের কাজ, সবই করে এই আঙুলের দল। পক্ষান্তরে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদ, সবই সংরক্ষিত আছে টম্যাটোর জন্য। তা ছাড়া উচ্চশিক্ষার সমস্ত সুযোগ সুবিধাও তাদের জন্যই সুরক্ষিত। অর্থাৎ কম কায়িক পরিশ্রম করে বেশি রোজগারের সমস্ত সুযোগ শুধু টম্যাটোরাই পাচ্ছে। আর আপেলরা রয়েছে এই দুই দলের মাঝখানে।

কিছু দিন আগে উত্তর কোরিয়ার এক জন ডাক্তার পালিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে চলে আসেন। তিনি বলেন যে, উত্তর কোরিয়ায় কোনও শিশু জন্মালে তার পঞ্জীকরণ বা রেজিস্ট্রেশনের সময় সেই শিশুর বাবার নাম, ঠাকুরদার নাম এবং প্রপিপতামহের নাম অর্থাৎ তিননপুরুষের নাম নথিভুক্ত করা হয়। এবং পিতৃপুরুষরা কোন দলের লোক ছিলেন তা বিচার বিবেচনা করে শিশুটি টম্যাটো, না আপেল, না আঙুর তা নির্ধারণ করা হয়। এই পরিচয় অনুযায়ী শিশুটিকে লাল, কিংবা লাল-সবুজ, কিংবা সবুজ রঙের একটি পিন দেওয়া হয়। এই পিনটি শিশুটির সারা জীবনের সম্পদ। বড় হয়ে বাইরে বেরনোর সময় ওই পিন জামায় লাগিয়ে তাকে বাইরে যেতে হবে।

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে নরবার্ট ভলারৎসেন (Norbert Volertsen) নামে এক জার্মান ডাক্তার উত্তর কোরিয়ায় যান। রাজধানী পিয়ং ইয়ংয়ে পৌঁছেই তিনি লক্ষ্য করেন যে সেখানে সব মানুষেরই জামায় বুকের ওপর বিশেষ রঙের একটি পিন আটকানো রয়েছে। যখন তাকে ব্যাপারটা বোঝানো হল, তখন তিনি অতিশয় বিস্মিত হলেন। যে মার্কসবাদী সরকারের উদ্দেশ্য শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ তৈরি করা, সেই মার্কসবাদী সরকার পাশ্চাত্যের বর্ণভেদ (apartheid)-এর মতো মানুষে মানুষে তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করছে দেখে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত হবে যে, গত ২৫ বছরের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট শাসন এই পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরও টম্যাটো, আপেল ও আঙুরে বিভক্ত করে ফেলেছে। তবে তা অলিখিতভাবে।

আমাদরে মার্কসবাদীদের অসুবিধা, এখানে এখনও একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান এবং দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যমান রয়েছে। তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে তাদের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। তা না হলে এত দিনে আমাদেরও বুক-পকেটে রঙবেরঙের পিন লাগিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে হত।

যাই হোক, সকলেই স্বীকার করবেন যে, আজ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি চাকরি অথবা সব রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা, সবই টম্যাটোদের জন্য সংরক্ষিত। চাকরিতে প্রমোশন, ভাল ভাল জায়গায় বদলি, সস্তায় সরকারি আবাসনে বসবাস, সব কিছুরই দাবিদার হলেন তাঁরা, যাঁরা টম্যাটোর মতোই ভিতরে ও বাইরে লাল। কোনও ব্যাপারে থানা বা কোনও সরকারি দপ্তরে নালিশ জানাতে গেলেও প্রথমে দেখা হয় সেই ব্যক্তি টম্যাটো, না আপেল, না আঙুর। একমাত্র টম্যাটো হলেই তার নালিশ গ্রাহ্য হয়।

কোনও সরকারি পদের জন্য দরখাস্ত জমা পড়লে প্রথমে দেখা হয় যে, তাদের মধ্যে কত জন টম্যাটো আছে। আবেদনকারীর স্থানীয় লোকাল কমিটির গোপন রিপোর্ট বলে দেয় সে ব্যক্তি লোক দলের। লোকাল কমিটি যাদের টম্যাটো বলেসার্টিফিকেট দেবে, একমাত্র তাদেরই চাকরি হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত নিম্নমানের হলেও কিছু যায় আসে না। তাদের নেওয়ার পর কোনও পদ খালি থাকলে আপেলদের কথা বিবেচনা করা চলতে পারে। আর যারা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক, তারাই হল ঘৃণিত আঙুর। শিক্ষাগত যোগ্যতায় সকলের ওপরে থাকলেও, যে কোনও ধরণের সরকারি চাকরি বা সুযোগ-সুবিধার দরজা তাদের জন্য বন্ধ।

যাই হোক, উত্তর কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট কিম্ ইল্ সুঙ হলেন উত্তর কোরিয়ার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি। বিগত ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া দখল করে নিয়েছিল। সেই পরাধীনতার সময় কিম্ ইল্ সুঙ দখলদার জাপানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অতঃপর ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যে কোরিয় ভূখণ্ড থেকে, ৩৮ ডিগ্রি অক্ষাংশ বরাবর উত্তর কোরিয়াকে পৃথক করে সেখানে একনায়কতন্ত্রী কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১৯৯৪ সালে কিম্ ইল্ সুঙ গত হলে ছেলে কিম্ জঙ ইল্ দেশের হর্তাকর্তা হলেন বটে, কিন্তু সরকারি কাগজপত্রে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাবার নামটা রেখে দিলেন। অনেকে ভাবতে পারেন যে, ভরত যেমন শ্রীরামের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে অযোধ্যা শাসন করেছিলেন, এটা তেমনই এক মহৎ ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে মহত্ত্বের কোনও স্থান নেই। নিতান্ত বৈষয়িক কারণেই ছেলে কিম্ মৃত বাবার ছায়াটা ধরে রয়েছেন। তাঁর ধারণা হল, খ্যাতিমান বাবার নাম প্রেসিডেন্ট হিসাবে টিকিয়ে রাখলে দেশে সেনা অভ্যুত্থানের আশঙ্কা কিছু কম থাকবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকের বিশ্বাস যে, তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে। তবে তা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

পৃথিবীর যেখানেই কমিউনিস্টরা আজ পর্যন্ত সরকার গড়েছে, সব জায়গাতেই তারা দূষিত বুর্জোয়া পরিমণ্ডলের থেকে কমিউনিস্ট-কৌলীন্যকে রক্ষা করার জন্য দেশকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করেছে। দেশের চতুর্দিকে, যাকে বলে লৌহ-আবরণ বা iron-curtain তৈরি করেছে।

এককালে রাশিয়া, পূর্ব জার্মানি, চীন ইত্যাদি সমস্ত দেশই এই লৌহ আবরণ দিয়ে আবৃত ছিল। সেখানকার অভ্যন্তরীণ কোনও খবর বিশ্ববাসীর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কতিপয় লোকজন, যারা ওই সব দেশ থেকে পালিয়ে আসত বা ওই সব দেশে ভ্রমণ করার সুযোগ পেত, তাদের কাছ থেকেই শুধু কিছু খবরাখবর পাওয়া যেত।

দেশকে এভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার রাখার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দেশের মানুষকে বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ করে রাখা। কারণ মানুষকে অজ্ঞ করে না রাখলে কমিউনিস্টদের পক্ষে মিথ্যা প্রচার চালাতে অসুবিধা হয়। এত দিন উত্তর কোরিয়ার মানুষও বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারে দিন যাপন করছিল। সেই সুযোগে সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম-খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি—সবৈব মিথ্যা প্রচার চালিয়ে আসছিল। প্রচার করা হচ্ছিল যে, দক্ষিণ কোরিয়ার লোকেরা হল ভিখারি। তারা একদিকে নিজের দেশের বুর্জোয়াদের এবং অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের পায়ের তলায় নির্মমভাবে পিষ্ট হচ্ছে। সেই তুলনায় উত্তর কোরিয়ার মানুষ মহাসুখে রয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে স্যাটেলাইট যোগাযোগ সম্প্রচারের দৌলতে উত্তর কোরিয়ার মানুষ সত্য-মিথ্যা বুঝতে শিখছে। তারা বুঝতে পারছে যে, সরকারি প্রচার মাধ্যম মিথ্যা প্রচারের দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করছে। দেশের প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষের কাছে সারা পৃথিবীর খবর পৌঁছে যাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের লোকরা ধনবান এবং তারাই গরিব ভিখারি।

এ সব কারণে উত্তর কোরিয়ার মানুষের মনে ক্ষোভ ও হতাশা ক্রমশ বাড়ছে। ক্ষোভের আরও অনেক কারণ আছে। গত ১৯৯৬ সাল থেকে সেখানে চলছে লাগাতার দুর্ভিক্ষ। সরকারি বন্টন ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি যে, শুধু টম্যাটোরাই দু'বেলা পেটভরে খেতে পাচ্ছে। আপেলরা, কম হলেও, খাবার পাচ্ছে।

পক্ষান্তরে আঙুরের দল খেটে মরছে, কিন্তু খিদের সময় খাবার পাচ্ছে না। অনাহারে এবং ওষুধের অভাবে তারা মারা যাচ্ছে। শুধু দু'বেলা পেট ভরে খাবার আশায় প্রাণের মায়া ত্যাগ করে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই দুরবস্থার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ আইনত নিষিদ্ধ। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কাজকর্মের বিন্দুমাত্র সমালোচনা করার শাস্তি কঠোর।

প্রিয় নেতা কিম্ জঙ ইল্ বা তাঁর নীতির বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করার ফল হল মৃত্যু অথবা জেল। এই সব অপরাধীদের নিয়ে যাওয়া হয় পূর্ব উপকূলে অবস্থিত 'য়োডক'-এর জেলগুলোতে। সেখানে চালানো হয় অমানুষিক নির্যাতন এবং বরাদ্দ করা হয় দিনে মাত্র ১৩০ গ্রাম খাদ্য। ফলে সকলেই অনাহারে ধীরে ধীরে মারা যায়। একটা মানবাধিকার সংস্থার সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে যে, এই জেলগুলোতে বর্তমানে প্রায় দু'লক্ষ নিরপরাধ মানুষ বন্দি রয়েছে।

স্বভাবতই সেখানে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে সিওলের 'কোরিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল রিউনিফিকেশন'-এর অধিকর্তা চোই জিন্ উক্ বলেন—"বর্তমানে উত্তর কোরিয়ায় সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বাড়ছে। কিম্ জঙ ইল্-এর পক্ষে তাঁর একান্ত অনুগত লোকদেরও (অর্থাৎ টম্যাটোদেরও) খুশি রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সেখানকার একনায়কতন্ত্রী শাসন আজ গভীর সংকটের মুখে। সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শাসনের সমাপ্তির সম্ভাবনা খুবই বেশি।"

উত্তর কোরিয়া সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই মনে করেন যে, কিম্ জঙ ইল্-এর দিন ঘনিয়ে এসেছে। এর মূল কারণ হল, সরকারি মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থা ও সরকার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি আজ সেখানে ভেঙে পড়ার মুখে।

পতনোন্মুখ সেই অর্থনীতিকে বাঁচাতে চীনের মতো সেখানেও অবিলম্বে প্রয়োজন ব্যক্তিগত মালিকানা ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। এর প্রতিফলন হিসাবেই উত্তর কোরিয়ার সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে। এরই প্রথম ধাপ হিসাবে তুলেধরা হচ্ছে দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 'সিনুইজু' (Sinuiju) শহরে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, ওই সিনুইজু শহর হল সীমান্তের ওপারে চীনা শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ডাংডংয়ের লাগোয়া। চীনা শিল্পপতিদের সিনুইজুতে বিনিয়োগ প্রলোভিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু চীনা বিনিয়োগকারীদের মন্তব্য হল, উত্তর কোরিয়া এক পাগলের দেশ। তাই প্রবল রাজনৈতিক ঝুঁকি (political risk) মাথায় নিয়ে একমাত্র পাগলেরাই সেখানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ বোধ করবে।

যাই হোক, পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, উপরিউক্ত অর্থনৈতিক সংস্কারের ঘোষণা ও প্রচেষ্টা প্রমাণ করছে যে, উত্তর কোরিয়ার অর্থনীতি আজ সত্যিই পতনের মুখে। তাই সেখানকার কট্টরপন্থী সরকারও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশকে উন্মুক্ত করে দিতে চাইছে। বেশিরভাগ পর্যবেক্ষকের মত হল—'উত্তর কোরিয়ায় অর্থনীতি যে মরতে বসেছে, এ

সব হল তারই লক্ষণ। উত্তর কোরিয়ার বর্তমান অবস্থা মনে করিয়ে দেয় বার্লিন প্রাচীন ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের পূর্ব বার্লিনের কথা।' তাই চোই জিন্ উক্ বলেন—"প্রায় কুড়ি বছর আগে চীনা নেতা দেঙ জিয়াও পিঙ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, আজ উত্তর কোরিয়ার পক্ষেও সেই পথ অনুসরণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।"

প্রায় এক দশক আগে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, অধুনা চীনের মার্কসবাদ বর্জন এবং উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে আমাদের দেশের মার্কসবাদীরা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করছেন বলে মনে হয় না। তাই তাঁরা আজও পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় মার্কসবাদী স্কুল খুলছেন ক্যাডার বাহিনীকে পরিত্যক্ত মার্কসবাদী তত্ত্বশিক্ষা দেওয়ার জন্য। কমরেডরা আজও দেওয়ালে লিখে চলেছেন—"মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা সত্য", অথবা "মার্কসবাদ মানবমুক্তির একমাত্র পথ।" আরও অবাক হতে হয় যখন অতিবিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমরেডরা "এক হি রাস্তা নকশালবাড়ি" লিখে কলকাতার রাস্তাঘাট ভরে ফেলেন তখন। এসব দেখলে মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে আসে—"ভগবান, এদের মানুষ কর।"

বিশদ জানতে পাঠক এই লেখকের "মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা" দেখতে পারেন।

খ্রীস্ট ধর্ম

আজকের খৃস্টধর্ম যিশু প্রচারিত ধর্ম নয়

যিশুর জন্মের সঙ্গে দুটো ঘটনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথমতঃ ঐ সময় আকাশে একটা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ পূর্বের দেশ থেকে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি শিশু যিশুকে দেখতে এসেছিলেন। প্রখ্যাত জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারের মতে, ওই সময় শনি ও বৃহস্পতি গ্রহ আকাশের মীন রাশিতে মিলিত (conjunction) হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার নিরক্ষর মেষপালকরা গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভেদ জানতো না বলে ওই ঘটনাকে একটা নতুন নক্ষত্রের আবির্ভাব বলে মনে করেছিল। কেপলারের মতে, খৃষ্টপূর্ব ৭ সালে ওই ঘটনা ঘটেছিল এবং প্রতি ৭৯৪ বছর অন্তর ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। দ্বিতীয় ঘটনাটি সত্যিই রহস্যময় এবং একমাত্র নিম্নোক্ত উপায়েই এর একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

নেপাল, তিব্বত, ভুটান, লাদাখ ইত্যাদি অঞ্চলের বৌদ্ধ মঠগুলিতে একটা প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোনও মঠের প্রধান লামা মারা যাবার আগে পরের জন্মে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন তার কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যান। সেই অনুসারে তাঁর মৃত্যুর পর অন্যান্য লামাগণ নিদর্শন অনুযায়ী জন্মান্তর প্রাপ্ত সেই শিশুটিকে খুঁজে বার করেন এবং মঠে নিয়ে এসে তাঁকে পরবর্তী প্রধান লামা বলে ঘোষণা করেন। সাধারণতঃ, পুনর্জন্ম গ্রহণের স্থানটি কাছাকাছি, ২০০ বা ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু তা বলে হাজার হাজার মাইল দূরের কোন স্থানে পুনর্জন্ম গ্রহণের ঘটনা বিরল হলেও একেবারে অনুপস্থিত নয়।

গত ১৯৮৪ সালে তিব্বতের এক লামা থুবটেন ইয়েশা ইঙ্গিত করলেন যে তিনি সুদূর স্পেন দেশে পুনর্জন্মগ্রহণ করবেন। সেই অনুসারে লামা জোপা-র নেতৃত্বে এক দল লামা সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁরা দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডা শহরের উপকণ্ঠে ওসেল (Osel) নামে ৬ বছর বয়সের একটি বালককে জন্মান্তর প্রাপ্ত লামা থুবটেন ইয়েশা বলে সনাক্ত করলেন। ওসেলকে লামা থুবটেন-এর ব্যবহৃত অনেক জিনিসপত্র দেখানো হয় এবং ওসেল তা খুব সহজেই সনাক্ত করতে সমর্থ হয়। ১৯৮৭ সালে ওসেলকে স্পেন থেকে প্রথমে নেপালে এবং সেখান থেকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা চলতে পারে। তিব্বতের দশম পাঞ্চেন লামা গত ১৯৮৯ সালে দেহ রাখেন। বর্তমান দালাই লামার তরফ থেকে ৬ বছর অনুসন্ধান চালাবার পর, লাসা থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরের একটা গ্রামে গেধুন চোয়েকি নাইকা নামে একটি বালককে জন্মান্তরে প্রাপ্ত পাঞ্চেন লামা বলে সনাক্ত করা হয়। কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট সরকার লামা নির্বাচনের এই পদ্ধতিকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য গেধুন চোয়েকি ও তার বাবা-মাকে এক গোপন স্থানে গুম করে ফেলে। এরকম পরিস্থিতিতে নিয়ম হল, লামারা যখন মঠে বিশেষ পুজাপাঠ করতে থাকবেন, তখন যেই বালক সেখানে উপস্থিত হবে তাকেই লামা বলে স্বীকার করে নিতে হবে। চীন সরকার ওই বিশেষ পূজাপাঠের সময় গাইয়াকেন নোরবু নামে একটি বালককে বিশেষ সাজে সজ্জিত করে সেখানে উপস্থিত করে। কাজেই ওই গাইয়াকেন নোরবুকেই সকলে লামা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। (তিব্বতে চীনা কমিউনিস্ট সরকারের দমন-পীড়নের নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হল।)

কাজেই অনুমান করা চলে যে, নেপাল, তিব্বত বা লাদাখের কোনও লামা মৃত্যুর আগে ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি প্যালেস্টাইনে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন এবং তাঁর অনুসন্ধানেই লামারা প্যালেস্টাইনে যান এবং শিশু যিশুকে ওই লামার জন্মান্তর বলে সনাক্ত করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে লামারা এই শিশুকে মঠে নিয়ে আসেন। কিন্তু শিশু যিশুর ক্ষেত্রে এত দূরে ভারতবর্ষের কোনও মঠে নিয়ে আসার পথশ্রম সহ্য হবে না বলে লামারা যিশু ও মা মেরীকে আলেকজান্দ্রিয়ার মঠে স্থানান্তরিক করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। এ ব্যাপারে বলা উচিত হবে যে, যাঁরাই যিশুর জীবন নিয়ে গবেষণা করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সকলেই এই মন্তব্য করেছেন যে, যিশুর জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যের বড়ই অভাব। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট-এর অন্তর্গত প্রথম চারটি গসপেল (ম্যাথু, মার্ক, লুক ও জন) থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাই সম্বল। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক H G Wells বলেন; "We are in a profoundest ignorance of his manner of life before his preaching begin."।

যিশু খৃষ্ট

যিশুর শিশু বয়সের কিছু বিবরণ বাইবেলে আছে। এর পর বাইবেল বলছে যে, রোম সম্রাট হেরড-এর ভয়ে মা মেরী শিশু যিশুকে নিয়ে মিশরের অলেকজান্দ্রিয়ায় পালিয়ে যান। এর পরেই দেখা যা যে, প্রায় ৩০ বছরের যুবক যিশু প্যালেস্টাইনের পথে ঘাটে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম প্রচার করছেন। মাঝে শুধু একবার মাত্র দেখা যায় যে, প্রায় ১২ বছরের কিশোর যিশু জেরুজালেমের মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করছেন এবং পুরোহিতরা তাঁর অসম্ভব ধী-শক্তি ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হচ্ছেন (লুক-২।৪২)। এর পর ম্যাথু

বলছে যে, মা মেরী যিশুকে নিয়ে প্যালেস্টাইনে আসার আজ্ঞা পান। কিন্তু যখন শুনলেন যে সেখানে হেরডের পুত্র আরকেলাস রাজত্ব করছে, তখন ভয় পেয়ে উত্তরে গ্যালিল অঞ্চলের নাজারেথ শহরের চলে যান। বর্তমানে গ্যালিলি ইস্রাইলের সব থেকে উত্তরের প্রদেশ এবং নাজারেথ সেখানকার একটা ছোট শহর।

বাইবেলে আরও আছে যে, পূর্ব দেশের সেই পণ্ডিতরা দামী দামী উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন হতে পারে যে, ওই সব উপহারের মধ্যে পূর্ববর্তী লামার নিদর্শনাদিও ছিল। অনেকের মতে যিশু তখন ওই সমস্ত নিদর্শন সনাক্ত করার মত বড় হয়ে গিয়েছিলেন। আর তা না হলে কোনও অলৌকিক উপায়ে যিশু ওগুলো সনাক্ত করেন। ইসলামী শাস্ত্রেও যিশুর উল্লেখ আছে এবং তাতে বলা হচ্ছে যে, যিশুর বয়স যখন ৪০ দিন, তখন তিনি দোলনায় শুয়ে পরিণত মানুষের মত কথা বলেছিলেন। ইসলামী শাস্ত্রে আরও আছে যে, ক্রুশবিদ্ধ করার আগের দিন রাত্রে যিশুকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয় এবং সেখান থেকে তিনি অলৌকিকভাবে অন্তর্ধান করেন। পরে যিশুর মত দেখতে এক ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়।

সম্রাট অশোক ও পরবর্তীকালে কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের প্রেরণায় এককালে বৌদ্ধধর্ম পূর্বে কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে আলেকজান্দ্রিয়া শহর বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বৌদ্ধধর্ম যেমন চীনে লাওৎসে ও কনফুসিয়াসের ধর্ম এবং জাপানে শিন্টো ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একটা নতুন রূপ পায়, তেমনি মিশর ও প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ধর্মের সঙ্গে মিশে একটা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে। যিশুর জন্মের প্রায় ২০০ বছর আগে থেকেই এক শ্রেণীর ইহুদিদের মধ্যে বুদ্ধের ত্যাগ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন, অহিংসা ও সর্বোপরি বৌদ্ধদের অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে নির্বাণ লাভের তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করে।

মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী এই সব ইহুদি বৌদ্ধদের থেরাপিউট (Therapeut) বলা হত, যা থেরপুত্র শব্দের অপভ্রংশ। ওই সময়কার ঐতিহাসিকদের মতানুসারে তখন মিশরে প্রায় ২০ লক্ষ এবং আলেকজান্দ্রিয়া শহরে প্রায় ৪০০ থেরাপিউট বসবাস করতেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় থেরাপিউটদের যে মঠ ছিল, সেখানেই যিশু ও মা মেরীকে স্থানান্তরিক করা হয়। পণ্ডিতদের মতে এই থেরাপিউট থেকেই ইংরাজী থেরাপি (Therapy) শব্দ এসেছে। অনেকের মতে, এই থেরাপিউটরা বিশেষ কোন পদ্ধতি, যেমন যোগ ও আয়ুর্বেদ ইত্যাদির সাহায্যে নানা রকম রোগের উপশম করতে পারতেন বলেই তাঁদের নাম চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

যাই হোক, প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী ইহুদি বৌদ্ধদের এসেন (Essen) বা নাজারিন (Nazarene) বলা হত। এঁরা গোঁড়া ইহুদি পুরোহিতদের পশুবলি প্রথার বিরোধী ছিলেন। এই কারণে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা বিদ্যমান ছিল। রোমান ঐতিহাসিক ফ্ল্যাবিয়াস

জোসেফাস-এর মতে যাঁরা এসেন, তাঁরাই নাজারিন। এরা মাংসাহার ও মদ্যপান করতেন না এবং সংযমী জীবনযাপন করতেন ও ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। ঐতিহাসিক প্লীনি (জুনিয়ার) ও জোসেফাস-এর মতে বর্তমান মরুসাগরের কাছে কুরাটানিয়া পর্বতের এক গুহা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নাজারিন সন্ন্যাসীদের একটা মঠ ছিল, যা পরে মুসলমানরা জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেয়।

বেশিরভাগ নাজারিনই জর্ডন নদীর পূর্বপারে বসবাস করতেন। যিশুর দীক্ষাগুরু জনও নাজারিন সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তিনি ওই কুরাটানিয়ার মঠেই বসবাস করতেন। সাধু জন নাজারিন ছিলেন বলেই পরবর্তীকালে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। বৃটিশ দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেলের মতে নাজারিন বা এসেনদের অনুসৃত ধর্ম থেকেই খৃষ্টধর্ম অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং তাঁদের মঠের অনুকরণেই বর্তমান ক্যাথলিক মঠ ও মঠজীবনের সূত্রপাত হয়। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, পন্ডিতদের মতে সংস্কৃত "জ্ঞান" শব্দ থেকেই ইংরাজী "জন" (John) শব্দের উৎপত্তি।

যাই হোক, ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়ার মঠে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর যিশু সম্ভবত ভারতে যাবার আজ্ঞা পান এবং ভারতের যাবার পথে জেরুজালেমে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ই তিনি জেরুজালেরে মন্দিরের পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করেন, যা লুক বর্ণিত গসপেলে স্থান পেয়েছে। এর পর মেরী যিশুকে সঙ্গে করে সম্ভবত কুরাটানিয়ায় যান এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য নাজারেথে যাবার গল্প রটনা করেন। বেশিরভাগ পণ্ডিতের মত হল, কুরাটানিয়া থেকে যিশু ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

যিশুর ভারতে আসার বৃত্তান্ত সভ্য জগতের কাছে অজানাই থেকে যেত, যদি না রাশিয়ার সাংবাদিক আলেকজান্ডার নটোভিচ ১৮৮৭ সালে ভারতে আসতেন এবং লাদাখের অন্তর্গত হিমিস শহরের মঠে রক্ষিত বৌদ্ধ গ্রন্থাদির মধ্যে যিশুর উল্লেখ অবিষ্কার করতেন। নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ নটোভিচ ওই বছর ১৪ অক্টোবর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত লাদাখ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। হিমিস মঠে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন যে সেখানে রক্ষিত পুরানো গ্রন্থাদির মধ্যে ঈশা বা যিশুর উল্লেখ আছে। সেই সব পুঁথি থেকেই নটোভিচ জানতে পারেন যে, যিশু ভারতে এসে নেপালের এক মঠে বৌদ্ধ শাস্ত্র এবং কাশী ও পুরীতে হিন্দু গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। হিমিস মঠের পুঁথিতে যে যিশুর উল্লেখ আছে তা পরবর্তী অনেক গবেষক ও স্বামী অভেদানন্দ দ্বারা স্বীকৃত সত্য। ইয়োরোপে ফিরে গিয়ে নটোভিচ তাঁর এই আবিষ্কারের কথা চার্চের কর্তাব্যক্তিদের জানালে তারা ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়েন এবং নটোভিচকে তাঁর এই আবিষ্কার গোপন রাখতে বলেন। এই কাজের জন্য ভাটিকান-এর পোপের তরফ থেকে অর্থের প্রলোভনও দেওয়া হয়ে থাকে। তবে যাই হোক, ১৮৯৪ সালে নটোভিচ তাঁর আবিষ্কার পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন এবং ওই বছরেই বিখ্যাত জার্মান পন্ডিত

ম্যাক্সমূলর লন্ডনের Nineteenth Century পত্রিকায় একখানা প্রবন্ধের মাধ্যমে নটোভিচকে জালিয়াত প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। ১৯১০ সালে নটোভিচ তাঁর আবিষ্কারের কথা রুশ ভাষায় প্রকাশ করে প্রশাসনের বিষনজরে পড়েন। ১৯১৬ সালের পর থেকে নটোভিচ সম্পর্কে আর কোনও খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। সম্ভবত ওই সময়ের মধ্যে তাঁকে গুপ্তহত্যা করা হয়।

বিখ্যাত জার্মান যীশু গবেষক হোলকার কারস্টেন-এর মতে ক্রুশের ওপর যীশুর মৃত্যু হয়নি। তাঁর মতে পন্টিয়াস পাইলেট (Pontius Pilate) নামে যে রোমান শাসনকর্তা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলার হুকুম দেন তাঁর স্ত্রী ছিলেন যীশুভক্ত। যীশু ক্রুশের ওপর কষ্ট পাচ্ছেন শুনে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কি করে তাঁর যন্ত্রণা লাঘব করা যায় সেই ব্যাপারে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তখন সবাই মিলে একটা আরক তৈরি করেন যার উপাদানের মধ্যে আফিম ছিল। একটা লাঠির মাথায় একটা পাত্র বেঁধে তার সাহায্যে যীশুকে ঐ আরক খাইয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে সেখানকার রক্ষীদের ধারণা হয় যে যীশু মারা গিয়েছেন।

বাইবেলে আছে যে, যীশু বেঁচে আছেন কি না তা পরীক্ষা করতে একজন সৈন্য তাঁকে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারে, কিন্তু যীশুর মুখ থেকে কোন শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু বাইবেল বলছে যে, সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়। এই ঘটনা থেকে হোলগার কারস্টেন সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্রুশের ওপর যীশুর মৃত্যু হয়নি, কারণ মৃতদেহ থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় না। যাই হোক, যীশু মারা গিয়েছেন মনে করে রক্ষীরা তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে দেয় এবং তাঁর ভক্তরা তাঁকে একটা গোপন জায়গায় নিয়ে যায়। সেটা ছিল শুক্রবার। দু'দিন সেবা যত্ন করার পর রবিবার তিনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ভক্তদের দেখা দেন। এই ঘটনাকেই খৃস্টানরা যীশুর পুর্নজন্ম বা রেজারেক্সন বলে প্রচার করে চলেছেন।

এর পর যীশু তাঁর মা মেরীকে সঙ্গে করে গোপনে ভারতে চলে আসেন এবং এর প্রায় ১৬ বছর পরে কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু হয়। আজও কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে তাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে। সেটা যে যীশুরই কবর তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, সেই সমাধি মন্দিরে পাথরে খোদাই করা যীশুর চরণ রাখা আছে এবং সেই দুই চরণেই দুটো গভীর গর্ত রয়েছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, ক্রুশবিদ্ধ করার সময় যীশুর পায়ে পেরেক মারা হয়েছিল এটা সেই ক্ষত চিহ্নেরই প্রতীক।

যে কেউ বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অধ্যয়ন করতে গেলেই তার নজরে পড়বে যে, যিশু নিজে কি বলেছিলেন সে সব কথা তাতে বিশেষ কিছুই নেই। তাতে আছে, যিশুই মেশায়া বা পরিত্রাতা, তাই যিশুর শরণ নিলেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। যিশু তাঁর পার্থিব মৃত্যুর পর বেঁচে উঠে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন যে, একমাত্র যিশুতেই জীবন আছে। তাই

একমাত্র যিশুর শরণ নিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাবে। যিশু নিজেই ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র এবং পবিত্র প্রেতাত্মা (Holy Ghost)। তাই যিশু একাই ট্রিনিটি। যিশুর রক্তেই সকলের খৎনা (circumcision) হয়ে গেছে, তাই খৃশ্টানদের আর আলাদা করে খৎনা করার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। যিশুর বাণী বলতে সেখানে আছে কিছু গল্প (parable)। প্রকৃতপক্ষে যিশু কথিত ঐ সমস্ত প্যারাবল্-এর মূল উৎস হল, সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ গ্রন্থ "ললিতবিস্তার"।

সব থেকে বড় কথা হল, খৃষ্টধর্ম বলে আজ যা চলছে তা যিশুর মুখনিঃসৃত বাণীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে বৃটিশ দার্শনিক বোয়েলিঙ ব্রোক এবং পরবর্তীকালে কান্ট, লেসিঙ প্রভৃতি দার্শনিকগণও নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে পরিষ্কার দুধরণের পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। এর মধ্যে একটি ধারা স্বয়ং যশুর মুখনিঃসৃত। অন্যটি সেন্ট পল (Paul) উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের তত্ত্ব।

পল এর আসল নাম ছিল সল (Saul)। তিনি এক অতিশয় রক্ষণশীল, গোঁড়া ও ধনশালী ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সলের বাবা অনেক টাকার বিনিময়ে তাকে রোমান নাগরিকত্ব লাভে সাহায্য করেন। রোমান নাগরিক হবার পর তার নাম হয় পল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর পল ধর্ম শিক্ষা করতে জেরুজালেমে যান এবং সেখান থেকে এক কট্টর ধর্মান্ধ ইহুদি এবং খৃষ্টধর্ম ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একজন চরম শত্রু হয়ে ফিরে আসেন। তখন তার বয়স হবে ১৮ কিংবা ২০ বছর। সেই সময় খৃষ্টানদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাবার অনুমতি চাইতে তিনি আবার জেরুজালেমে রওনা হন। বাইবেলের গল্প অনুসারে পথে দামাস্কাসে তিনি হঠাৎ যিশুর জ্যোতি দেখতে পান এবং তার মনের পরিবর্তন হয়। অনেকের মতে, ঐ সময় যীশু গোপনে ভারতে যাবার পথে দামাস্কাসে অবস্থান করছিলেন এবং পলের সঙ্গে তার দেখা হয়।

সেন্ট পল

বিশিষ্ট জার্মান যিশু বিশেষজ্ঞ এবং Jessus Lived in India গ্রন্থের প্রণেতা Holger Kersten এর মতে ওই দামাস্কাসে যাবার পথে হঠাৎ তার উর্বর মস্তিষ্কে এই চিন্তার উদয় হয় যে, খৃষ্টধর্মের সামনে সত্যিই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং এই সময়ে এর মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলে কালে বিশাল এক ধর্ম-আন্দোলনের নেতা হওয়া যাবে। এই ভেবে তিনি খৃস্টান হলেন বটে, কিন্তু যিশু কি বলে গেছেন সে সবের কোন তোয়াক্কা না করে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করলেন এবং তাকে খৃষ্টতত্ত্ব বলে চালাতে শুরু করলেন। তাই শ্রী হোলগার কারস্টেন লিখছেন, "একে খৃস্টধর্ম না বলে পলধর্ম বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ যে কয়টি মূল স্তম্ভের উপর আজকের খৃস্টধর্ম দাঁড়িয়ে আছে তার

কোনটাই যিশুর মুখনিঃসৃত বাণী নয়, এ হল সেন্ট পল দ্বারা উদ্ভাবিত সম্পূর্ণ এক নতুন ধরণের তত্ত্ব।" (Holgar Karsten, Jesus Lived in India, Element, 1986)। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক H G Wells লিখছেন, "আজকের খৃষ্ট মতবাদের স্রষ্টাদের মধ্যে (যিশু নন) সেন্ট পলই হলেন অন্যতম প্রধান ব্যক্তি।"

কাজেই এটা বিশেষভাবে চিন্তা করার বিষয় যে, যিশু নিজে কি বলেছিলেন। বাইবেলের যেখানে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অহিংসা, ক্ষমা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে যিশুর মুখনিঃসৃত বাণী বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত। যিশু কথিত গল্পগুলোতেই এই সব ভাব বেশি আছে এবং আগেই বলা হয়েছে যে, এ গুলো বৌদ্ধগ্রন্থ "ললিতবিস্তার" থেকে নেওয়া। যিশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে ধর্ম প্রচারে পাঠাবার আগে উপদেশ দিয়ে বলছেন, "পথের জন্য (তোমরা) কিছুই লইও না, যষ্ঠিও না, ঝুলিও না, খাদ্যও না টাকাও না, দুইটা আঙরাখাও লইও না" (লুক-৯।৩)। এ যেন বুদ্ধবে তাঁর শিষ্য আনন্দকে ধর্মপ্রচারে পাঠাবার আগে যে উপদেশ দিয়েছিলেন অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে দার্শনিক বারট্রান্ট রাসেল লিখছেন, "যিশুই হলেন বুদ্ধের একমাত্র ও উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, কারণ বুদ্ধের মতো একমাত্র যিশুই বলেছেন যে, শত্রুকেও ভালবাসতে হবে, ক্ষমা করতে হবে।"

গীতাশাস্ত্রী শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাইবেল ও গীতার মধ্যে অনেক জায়গায় সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। গীতার জার্মান অনুবাদক ডঃ লরিনসর সাহেবও শতাধিক স্থানে এরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ তাঁর "শ্রীগীতা" গ্রন্থে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন, যেমন—"তোমরা যাহা আহার কর, যাহা পান কর বা যাহা কিছু কর, সব ঈশ্বরের গৌরবার্থেই কর" (১ করিন্থীয়-১০।৩১)। যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ তৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। (গীতা—৯।২৭)। যিশু যেভাবে পরমেশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করেছেন, তাতে গীতার "পিতাহমস্য জগতো"-এর ভাবই ফুটে ওঠে। তাছাড়া যিশু যে ভাবে সকলকে পরমেশ্বর বা স্বর্গস্থ পিতার কাছে নিজেকে সমর্পণের কথা বলেছেন, তার মধ্যে গীতার সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ-ই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই দৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যিশু ভারতে থাকাকালীন গীতা সহ সনাতন ধর্মের অন্যান্য গ্রন্থাদিও অধ্যয়ন করেছিলেন। বিশেষ করে হিমিস মঠে রক্ষিত পুঁথি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। কাজেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, যিশুর মতো ব্যক্তির পক্ষে মানুষে মানুষের বিভেদ সৃষ্টিকারী কোনও ঘৃণার তত্ত্ব প্রচার করা সম্ভব ছিল না। কারণ হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ, কোনও ভারতীয় ধর্মে কোনও রকম ঘৃণার তত্ত্ব পাওয়া যাবে না। সকল ভারতীয় তত্ত্বের মূল কথাই হল, "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্"। প্রকৃতপক্ষে, যিশুর কথাবার্তার মধ্যে ভগবান বুদ্ধের ভাব এত বেশি থাকত যে, তৎকালীন নাজারিনরা মনে করত যিশুই বুদ্ধ এবং বুদ্ধই যিশু।

আবার ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও প্রেম লক্ষ্য করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি হিন্দুর ভক্তিবাদের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ, বৌদ্ধ মতবাদ ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন। কাজেই, সব দিক বিচার বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসাই সমীচীন যে, মহাপ্রাণ যিশু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের একটা মিলিত তত্ত্বই প্যালেস্টাইনে প্রচার করেছিলেন। এক কথায় তাঁর প্রচারিত ধর্মের সার কথা বলতে গেলে নির্দ্বিধায় এটাই বলতে হয় যে, তা হল "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

কিন্তু যিশু প্রচারিত সেই মানবতাবাদী উদার ধর্মকে পরিত্যাগ করে এবং প্রথাগত সেমিটিক ধর্মের ধারা অনুসরণ করে পল মানুষে মানুষে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর বিভেদের প্রাচীর খাড়া করে নতুন এক ঘৃণার তত্ত্ব খৃষ্টধর্ম বলে প্রচার করলেন। সেই নতুন ধর্ম বলল, "অ-খৃষ্টানদের প্রতি বর্ষিত হবে ঈশ্বরের ক্রোধ" (Hebrews–3/11)। "অবিশ্বাসীরা বন্য পশু" (2Peter–2/12)। "অবিশ্বাসীদের ঘরে ঢুকতে দিও না" (1John–10) "ওদের সাথে বন্ধুত্ব করো না" (2Corinthian–6b14)। "ওদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করো না" (3John–7)। "অবিশ্বাসীরা হল ঈশ্বরহীন পশু" (Jude–4)। "যে খৃষ্টকে অনুসরণ করবে, একমাত্র সেই মুক্তি পাবে।" (2Peter–3/13)। "খৃষ্টকে অনুসরণকারীরা হল ঈশ্বরের (অনুগ্রহের) জন্য নির্বাচিত (elect)" (Colossians–3/12 : 1Peter–1/1, 2/9, 2/18; Thessalonians–1/4; Titus–1/1)।

যিশুর শিক্ষার মধ্যে আরও একটা বিষয় ছিল এই যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করার জন্য কোন মাধ্যম বা অনুশাসন জরুরি নয়। যেটা প্রয়োজন তা হল ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা। কিন্তু যিশু উপদিষ্ট এই কল্যাণকর নির্দেশকে উপেক্ষা করে সেন্ট পল বললেন, "চার্চের অনুশাসনকে অবশ্যই মান্য করে চলতে হবে" (Romans–13/1)। "এই অনুশাসনকে লঙ্ঘন করা চলবে না" (1 Corinthian–4/16) বা "বাইবেলের বাইরে আর কোন গসপেলকে অনুসরণ করা চলবে না" (Galatians–1/16)। মানবতাবাদী যিশু, দাসপ্রথা তো বটেই, মানুষের দ্বারা মানুষের উপর যে কোন রকমের অত্যাচার ও নিপীড়নের নিন্দা করে গিয়েছেন। কিন্তু পল ক্রীতদাস প্রথাকে সমর্থন করে বললেন, "দাস, তোমরা মনিবের অনুগত হও" (Ephesians–5)। তাই স্বামীজী এক জায়গায় দুঃখ করে বলেছেন, "খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, খ্রীষ্টের মতো নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যরা এত নরহত্যা করেছে।" কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, খৃষ্ট প্রচারিত ধর্ম অনুসরণ করলে খৃস্টানদের পক্ষে ওই ব্যাপক নরহত্যা করা সম্ভব হত না। সেন্ট পল দ্বারা বিকৃত ও ভেদভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত ধর্মকে অনুসরণ করার ফলেই তারা ব্যাপক নরহত্যা করতে পেরেছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, নিউ টেস্টামেন্টে ম্যাথু (বা মথি), মার্ক লুক ও জন লিখিত ৪ খানা গসপেলেই শুধু যিশুর কথা আছে। অনেকে মনে করেন যে, খৃষ্টধর্মের শৈশবে আরও অনেক, প্রায় শতাধিক, গসপেল লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেই গসপেলগুলোতে যিশুর নাজারিন

বা এসেন চরিত্র আরও প্রকট ছিল বলে সেন্ট পল ঐ সমস্ত গসপেল নষ্ট করে ফেলেন এবং কেবলমাত্র উপরিউক্ত ৪টি গসপেলকেই বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

পলের পৈতৃক ধর্ম যে জুদাইসম্ ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। এই জুদাইসম্ ছিল ইহুদি জাতির লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এই কারণে তার প্রসার হচ্ছিল না। তাই প্রথম থেকেই পলের উদ্দেশ্য ছিল অ-ইহুদি বা জেন্টাইল (gentile) দের খৃস্টান বানিয়ে দলভারী করা। তাই তিনি নিয়ম করলেন যে, ইহুদিদের মত খৃস্টানদের খৎনা বা পুরুষের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদন (circumcision) করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন যে, তাদের শূয়োরের মাংস খেতেও কোন বাধা নেই, কারণ আমরা মুখ দিয়ে যা প্রবেশ করাই তার উপর পাপ পুণ্য নির্ভর করে না। পাপ পুণ্য নির্ভর করে আমরা মুখ দিয়ে যা বাইরে বের করি তার উপর। শনিবার ছিল ইহুদিদের বিশ্রামের দিন। তিনি রবিবারকে খৃস্টানদের বিশ্রামের দিন বলে ঘোষণা করলেন। ইহুদিদের পশুবলিকে তিনি নিরর্থক বলে প্রচার করলেন এবং খৃস্টানদের জন্য তা অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, "ছাগল গরুর রক্তে পাপ ধুয়ে যায় না" (Hebres–10/4)। "একমাত্র যিশুর রক্তই সব কিছু পবিত্র করতে সক্ষম" (Hebrew–13/11)। "যিশু নিজেকে বলি দিয়ে চিরকালের জন্য বলির কাজ করে গিয়েছেন" (Hebrew–10/10) পলের উপরিউক্ত নিয়ম-কানুনে ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত মোজেস-এর নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী হবার ফলে তিনি এ সবের নাম দিলেন নতুন নিয়ম বা নিউ টেস্টামেন্ট। এইভাবে পল যিশু প্রচারিত উদার ও মানবিক ধর্মকে সংকীর্ণ সেমিটিক জুদাইসমের একটি সামান্য সংযোজন বা সম্প্রসারণে পর্যবসিত করলেন। সব থেকে বড় কথা হল, পল খৃস্টধর্ম নামে একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করলেন, তার উদ্দেশ্য হল ধর্মান্তরের মধ্য দিয়ে দলের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে অন্তিমে সাম্রাজ্য বিস্তার করা।

কাজেই বলা চলে যে, খৃস্টধর্ম বলে আজ যা চলছে তার সঙ্গে যিশু প্রচারিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের একটা মিলিত রূপই যিশু প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেন্ট পল যিশু প্রচারিত সেই ধর্মকে বর্জন করলেন এবং সংকীর্ণ সেমিটিক ধর্ম জুদাইসম্ এর ধারা অনুসরণ করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করলেন। উপরন্তু, সেই তত্ত্বকে জুদাইসমের একটা সম্প্রসারণ হিসাবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তাই একে খৃস্টধর্ম না বলে পলধর্ম বলাই অধিকতর সঙ্গত। অপরদিক থেকে দেখতে গেলে, তিনি ধর্মের আড়ালে একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উদ্দেশ্য হল ধর্ম পরিবর্তনের নামে ওই রাজনৈতিক দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এই ভাবে ধর্মের নামে সাম্রাজ্য বিস্তার করা।

গত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৭ আষাঢ় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানা পত্রে কালিদাস নাগ মহাশয়কে লিখেছেন, "এই পৃথিবীতে দুটি ধর্ম আছে, যাদের সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্মের চির

বৈরিতা বর্তমান। এই ধর্ম দুটি হল ইসলাম ও খৃস্টধর্ম। এরা শুধু নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, পরন্তু অন্য সমস্ত ধর্মকে বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর। তাই এদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের একটাই রাস্তা আছে, আর তা হল তাদের ধর্ম গ্রহণ করা।" সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবীন্দ্রনাথ একটি অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছেন।

এই দুটি ধর্ম কখনও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্ব-মানবতার কথা বলে না। এই দুটি ধর্মে বিশ্ব-প্রেমের কোন কথা নেই এবং এদের ধর্মের মূল ভিত্তিই হল ঘৃণা। এরা প্রথমেই সমগ্র মানব সমাজকে সরাসরি দুটো দলে ভাগ করে। ইসলাম বলে, যারা আল্লার আসমানি কেতাব কোরান ও আল্লার রসুল মহম্মদে বিশ্বাস করে না, তারা হল কাফের। এরা ঘৃণিত এক প্রকার জন্তু বিশেষ। স্বয়ং আল্লা এদের ঘৃণা করেন কারণ এরা হল আল্লা ও আল্লার রসুল মহম্মদের শত্রু। এরা কোনদিনও পরিত্রাণ পাবে না এবং এদের স্থান হবে আল্লার নরকে। এই নরকের আগুনের তারা অনন্তকাল ধরে জ্বলবে। নরকের সেই আগুন হবে পার্থিব আগুনের থেকে ৭০ গুণ বেশি যন্ত্রণাদায়ক। সেই আগুনে আল্লা কাফেরদের ঝলসাবেন। চামড়া একেবারে পুড়ে গেলে তত বেশি যন্ত্রণা হবে না। তাই বুদ্ধিমান আল্লা প্রত্যেকবার ঝলসাবার পর নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবেন, যাতে তারা অনন্তকাল ধরে সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে।

খৃস্টধর্মও সেই একই কথা বলছে। বলছে, যারা যিশুর শরণ নেবে, একমাত্র তারাই পরিত্রাণ পাবে। যারা যিশুর শরণ নেবে না, তারা হল ঘৃণ্য হিদেন। গড এই হিদেনদের ঘৃণা করেন। এই হিদেনরা কোন দিনই স্বর্গে যেতে পারবে না এবং তারা অনন্তকাল ধরে নরকের আগুনে দগ্ধ হবে। আমরা সকলেই টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখি। কোন দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন বলা হচ্ছে—এই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাজন এবং একমাত্র এমাজনেই দাঁত পরিষ্কার হবে। এছাড়া অন্য সমস্ত মাজন শুধু খারাপই নয়, ক্ষতিকরও বটে। কারণ এটা না বললে তার মাজন বিক্রি হবে না। সেই রকম কোন সাবানের বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে—এই হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাবান এবং একমাত্র এ সাবানেই জামা-কাপড় পরিষ্কার হবে। এছাড়া অন্য সমস্ত সাবানই খারাপ ও ক্ষতিকর। কারণ এটা না বললে তার সাবান বিক্রি হবে না।

ঠিক সেই রকমভাবে মুসলমানরা বলে চলেছে—ইসলামই হল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাই হল প্রকৃত ভগবান। এছাড়া আর সব ধর্মই খারাপ এবং আর সমস্ত ভগবানই হল মেকি ভগবান। তাই যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, একমাত্র তারাই পরিত্রাণ পাবে। কারণ একথা না বললে ইসলামের খরিদ্দার পাওয়া যাবে না। ঠিক একই ভাবে খৃস্টান পাদ্রীরা বলে চলেছে, যারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবে একমাত্র তারাই পরিত্রাণ পাবে। একমাত্র বাইবেলের গডই হল সাচ্চা ভগবান এবং এছাড়া আর সব ভগবান হল মেকি ভগবান। কারণ এই কথা না বললে খৃস্টধর্মেরও খরিদ্দার পাওয়া যাবে না। কিন্তু পরিতাপের কথা হল এই যে, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ, যাঁরা হিন্দু কিন্তু হিন্দু ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের মহত্ব সম্বন্ধে যাঁরা অতটা

সচেতন নন, তাঁরা এই সব ভুল প্রচারে বিশ্বাস করে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ওই সব সেমিটিক ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন।

আসল কথা হল, আমরা হিন্দুরা ধর্ম বলতে যা বুঝি, ইসলাম ও খৃস্টধর্ম সে রকমের ধর্ম নয়। হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য হল, ত্যাগ, তিতিক্ষা, ভক্তি ও সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষের চারিত্রিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা এবং এইভাবে মানুষকে প্রথমে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নীত করা। পক্ষান্তরে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নিয়ে ইসলাম ও খৃস্টধমের কোন মাথাব্যথা নেই। তাদের মূল কথা হল, আমাদের দলের খাতায় নাম লেখাও, তা হলেই সব হয়ে যাবে। তাই এদের ধর্ম বলা উচিত নয়। এরা হল রাজনৈতিক দল। এদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ধর্মান্তরিত করে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং এইভাবে ধর্মীয় সাম্রাজ্য বিস্তার কর। আসলে এই সব নির্বোধ ও কূপমন্ডুক ধর্ম-প্রবক্তাদের পক্ষে হিন্দু ধর্মের মহত্ত্ব অনুধাবন করাই সম্ভব নয়। তাই এই নির্বোধের দল বাইবেলের মতো একখানা বর্ণপরিচয় বগলে করে ভারতে আসে হিন্দুদের ধর্ম শেখাতে। তাই স্বামীজী ইয়োরোপে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের পাদ্রির দল ভারতে গিয়ে যে সর্বনাশ করেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত কাদা তুলে তাদের মুখে ছুঁড়লেও তার যোগ্য জবাব হবে না।"

যাই হোক, খৃস্টধর্মের এই ঘৃণার তত্ত্বকে আড়াল করতে খৃস্টান পাদ্রির দল মহাত্মা যিশুকে সামনে তুলে ধরে। কিন্তু আজ খৃস্টধর্ম বলে যা চলছে তার সঙ্গে যিশুর কোনই সম্পর্ক নেই। এই ষড়যন্ত্রকারী পাদ্রির দল যিশুর আসল পরিচয়টাকেই বেমালুম গায়েব করে দিয়েছে। সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যে সব চিত্র আছে তাতে ক্রুশের মাথায় লেখা আছে চারটি অক্ষর INRI। এই চারটি অক্ষরের মাধ্যমে যিশুর পরিচয় লেখা হয়েছে এবং এরা হল চারটি শব্দের আদ্যাক্ষর। শব্দ চারটি হল Iesus, Nazarenus Rex এবং Iudaeorum । এই চারটি শব্দের অর্থ হল Iesus (ইয়েসাস) অর্থ যিশু, Nazarenus (নাজারেনাস) অর্থ নাজারিন বা ইহুদি সন্ন্যাসী, Rex (রেক্স) অর্থ রাজা এবং Iudaeorum (ইউডেরাম) অর্থ ইহুদি। অত এব এই চারটি শব্দর মধ্য দিয়ে যে বাক্যটি লেখা হয়েছে, তার অর্থ হল "ইহুদিদের রাজা নাজারিন যিশু।" কিন্তু এই সব অসৎ পাদ্রির দল বলে যে, বাক্যটি হল "ইহুদিদের রাজা নাযারেথের যিশু"।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নাজারিন শব্দটি এই সব দুষ্ট পাদ্রিদের পছন্দ নয়। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কেন পছন্দ নয়? যে কোন ডিক্সনারি খুললে দেখা যাবে যে, নাজারিন শব্দের অর্থ হল ইহুদি সন্ন্যাসী। কিন্তু ইহুদিদের ধর্ম, যা কে জুডাইসম্ বলে, তা তে সন্ন্যাসের কোন স্থান নেই। তা হলে এই ইহুদি সন্ন্যাসীরা কারা? আসল কথা হল, সেই সময় যে সব ইহুদি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হত, তাদেরই নাজারিন বলা হত। আগেই বলা হয়েছে যে, মিশরে এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বলা হত থেরাপুট, যা হল থেরপুত্ত শব্দের অপভ্রংশ। এই

থেরাপুট থেকেই ইংরাজী Therapy শব্দ এসেছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যিশুর বৌদ্ধ পরিচয়টা লোপাট করার জন্যই নাজারিন শব্দের বদলে নাজারেথ শব্দটির আমদানী করা হয়েছে। এককালে কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার জন্মস্থানটি জুড়ে দেবার একটা প্রথা বিদ্যমান ছিল, যেমন অ্যারস্টারকাস অফ সামোয়া, অ্যাডিলার্ড অফ বাথ, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রেও যিশুর নাম দেওয়া উচিত ছিল যেসাস অফ বেথলেহেম, যেসাস অফ নাযারেথ নয়। কাজেই এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, যিশুর বৌদ্ধ চরিত্রটাকে·বেমালুম গায়েব করার উদ্দেশ্যেই জালিয়াৎ পাদ্রির দল নাজারিন শব্দের বদলে নাযারেথ শব্দ ব্যবহার করে চলেছে। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, যিশুর দীক্ষাগুরু জন-ও নাজারিন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন।

এই দিক থেকে দেখতে গেলে বাইবেল কোন ধর্মগ্রন্থ নয়। এটা খৃস্টধর্ম নামক একটা রাজনৈতিক দলের দলীয় নিয়ম-কানুনের বই মাত্র। ধর্মগ্রন্থ তাকেই বলা যায়, যে গ্রন্থ পাঠ করলে পাঠকের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু কেউ বাইবেল পড়লে অতি দ্রুত তার চারিত্রিক অবনতি ঘটবে। এই গ্রন্থ কেউ পাঠ করতে শুরু করলে তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই দেখতে পাবেন কামোন্মত্ত বর্বর দুই ভাই ভাদ্র মাসের কুকুরের মত তাদের এক বোনের পিছনে দৌড়াচ্ছে। শেষে এক ভাই অন্য ভাইকে হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করছে (Genesis–4/8)। আর একটু অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে, মহান আব্রাহাম-এর ভাই নাহর তার ছোট ভাই হারন-এর মেয়ে মিলকাকে বিয়ে করছে এবং মহান পয়গম্বর লট তার নিজ ঔরসজাত দুই কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করছে (Genesis–11/29; 19/36, 37)। আর একটু এগুলেই দেখা যাবে যে, সুন্দরী মানবীদের সঙ্গে যৌন ক্রিয়াকর্মের জন্য গডের কামোন্মত্ত পুত্ররা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছে এবং গৌরবময় পুত্র উৎপাদন করছে (Genesis–6/4, 22; 9/18, 27)। মহান নোয়া মত্ত অবস্থায় নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে এবং সেই নগ্নতা দেখার জন্য পৌত্র কানানকে ক্রীতদাস হবার অভিশাপ দিচ্ছে (Genesis–9/6)।

যেই বর্বর গ্রন্থ উপদেশ দিচ্ছে যে, বিয়ে করার পর বাবা-মার প্রতি ছেলের কর্তব্য থাকবে না এবং বাবা-মাকে পরিত্যাগ করাই উচিত কাজ হবে এবং এ ব্যাপারে যেই বর্বর গ্রন্থের বর্বর ভগবান বলছে, "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." (Genesis–2/24) সেটা ধর্মগ্রন্থ কি না তা পাঠকের বিচার্য। সর্বোপরি, যেই বর্বর গ্রন্থের বর্বর ভগবান বলছে, "Do not dishonour your father by having sexual relation with your mother" (Leviticus–18/7)। অর্থাৎ তোমার মা-র সঙ্গে যৌন সংসর্গ করো না, কারণ তাতে বাবার অসম্মান হবে। সেই বর্বর ভগবান আরও বলছে, "Do not have sexual relation with your father's wife, that would dishonour your father" (Leviticus–18/8)। অর্থাৎ, তোমার বাবার অন্য কোন স্ত্রীর সঙ্গেও যৌন সংসর্গ করো না, কারণ তাতেও বাবার

অসম্মান হবে। কাজেই জানতে ইচ্ছা করে যে, যার বাবা মারা গিয়েছে যা নিরুদ্দেশ হয়েছে, (অর্থাৎ, যখন বাবার অসম্মানের ব্যাপারটা থাকছে না) তাকে এই বর্বর ভগবান কি উপদেশ দেবে। এই সব কারণেই ইহুদি রাজাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক H G Wells লিখেছেন "These are the tales of barbaric kings ruling barbaric people" (A Short History of the World)। অর্থাৎ, এ সব হল বর্বর রাজাদের দ্বারা বর্বরদের শাসন করার গল্প।

কাজেই বলতে বাধা নেই যে, বাইবেল নামক বর্বর গ্রন্থের বর্বর গডের বাণী দ্বারা পরিচালিত হবার ফলেই খৃস্টান পাদ্রিদের মধ্যে সংযম ও চরিত্র বলে কিছু নেই। ইয়োরোপ ও আমেরিকার হাজার হাজার পাদ্রি আজ শিশুদের উপর যৌনাচারের অপরাধে অপরাধী। তার উপর আছে মেয়ে পাদ্রি বা নানদের সঙ্গে নিয়মিত যৌনাচার। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যের নানরা হল পাদরিদের যৌনদাসী (sex-slave) এবং সেই কারণে সেখানকার মেয়েরা আর নান হচ্ছে না। তাই সেই অভাব পূরণ করতে ভারত (বিশেষ করে কেরল ও উত্তর-পূর্ব ভারত) ও অন্যান্য দেশ থেকে, নানা প্রলোভনের দেখিয়ে, দলে দলে নান নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খৃস্টান গীর্জা ও মঠে পাদ্রি ও নানদের মধ্যে যৌনাচার এত ব্যাপক যে, এক সময় পোপকে আইন করতে হল যে, কোন পাদ্রি যদি কোন নানের স্তন নিয়ে খেলা করে (foundles with the breat) তা হলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। বারট্রান্ড রাসেল তাঁর Marriage and Morals গ্রন্থে এই সব যৌনাচারের বিস্তৃত বিবরণ উপস্থিত করেছেন। সেই সব কাহিনী অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে। যেমন, কোন পাদ্রি তার প্রিয়তমা নানকে পুরুষ সাজিয়ে পোপের আসনে বসিয়ে দিল। ক্রমে সেই পোপ সেই পাদ্রির দ্বারা গর্ভবতী হল। তারপর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সেই পোপ যখন বক্তৃতা করতে উঠল তখন সে বাচ্চা প্রসব করে ফেলল। গত ২০০৭ সালের ১৮ই আগস্ট কেরালার গম্পালগুডেম অঞ্চলের গোসাবেড়ু গ্রাম থেকে কে রমেশ নামে এজন পাদ্রিকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে। অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ জানতে পারে যে, ওই পাদ্রি মেয়েটিকে সঙ্গে করে হায়দ্রাবাদ চলে যায় এবং সেখানে সে মেয়েটিকে কয়েক দিন ধরে ধর্ষণ করে। অতি সম্প্রতি কেরালার এক নান একটি বই লিখে খৃস্টান মঠের যৌনাচারের কথা প্রকাশ করে মহা শোরগোল সৃষ্টি করেছেন।

কাজেই এই বর্বর পাদ্রির দল যখন তাদের বর্বর গ্রন্থ বাইবেলখানা বগলে করে ভারতীয়দের ধর্ম শিক্ষা দিতে আসে তখন যে প্রবাদ বাক্যটি মনে পড়ে তা হল, "দেবদূতেরা যেখানে ভয় পায়, আহাম্মকেরা সেখানে অগ্রসর হয়।" পাশ্চাত্যে আজ খৃস্টধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হবার মুখে। সেখানে গীর্জার প্রার্থনা সভায় লোক হয় না। গীর্জাগুলো পরিত্যক্ত হচ্ছে আর ইস্কন সেই সব পরিত্যাক্ত গীর্জা সস্তায় কিনে তাকে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে রূপান্তরিত করছে। অথবা মুসলমানরা সেইসব গীর্জা কিনে মসজিদে রূপান্তরিত করছে। কয়েকবছর আগে ভাটিকানের পোপ ভারতে

এসে প্রকাশ্যে বলে গিয়েছে যে, তাদের লক্ষ্য হল বর্তমান মিলেনিয়ামে এশিয়াকে খৃস্টান সাম্রাজ্যে পরিণত করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হাজার হাজার পাদ্রি এশিয়ার দেশগুলোতে, বিশেষ করে ভারতে আসছেএবং ভারতীয়দের খৃস্টান করার জন্য প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করছে। কিন্তু শিক্ষিত বর্ণ-হিন্দুদের খৃস্টান করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ বলে তারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র বনবাসী এবং বিভিন্ন জনজাতির মানুষকে নিশানা করেছে। নানা রকম প্রলোভন ও ছল-চাতুরির সাহায্যে তারা ঐ সমস্ত সরল মানুষদের খৃস্টান করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ধর্মের ফাঁদ নামক একটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী অরুন্ধতী দেববর্মা এই বিষয়টিকে গল্পের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এইজন্য তিনি সত্যই প্রশংসনীয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, বর্বর পাদ্রির দল এই ভারতবর্ষে এসে এখানকার মানুষকে, বিশেষ করে হিন্দুদের, খৃস্টান করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ হল এমন দেশ যেখানে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কোন মুসলিম দেশে গিয়ে কোন পাদ্রি কোন মুসলমানকে খৃস্টান করার চেষ্টা করলে সেই পাদ্রির প্রাণদণ্ড হবে। তাই তারা ধর্ম প্রচার করতে মুসলীম দেশগুলোকে সযত্নে এড়িয়ে চলে। নানা রকম ছলনা ও প্রলোভনের মাধ্যমে এরা ভারতের হিন্দুদের, বিশেষ করে অশিক্ষিত বনবাসী ও জনজাতি মানুষদের খৃস্টান করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যেই সব প্রলোভনের দ্বারা তারা হিন্দুদের খৃস্টান বানাচ্ছে তার মধ্যে অর্থই প্রধান। তারপর আছে শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। হিন্দু যুবকদের আকৃষ্ট করার জন্য আছে যৌন প্রলোভন।

এই সব কাজের জন্য পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো থেকে প্রচুর টাকা পয়সা ভারতে আসছে। এই বছরের (২০০৯ খ্রীঃ)। গত ৩০ জানুয়ারি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং তাতে বলা হয় যে, ভারতে যে সব খৃস্টান সংস্থা ধর্মান্তরকরণের কাজে রত হয়েছে, তাদের কাছে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা পয়সা আসছে। বিগত এক বছরে কোন প্রদেশে কত টাকা এসেছে, ওই বিজ্ঞপ্তিতে তার একটা বিবরণ দেওয়া হয়। মোট ২২৪৪ কোটি টাকা পেয়ে এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে তামিলনাড়ু। তারপর রয়েছে যথাক্রমে দিল্লী (২১৮৬ কোটি টাকা) ও অন্ধ্রপ্রদেশ (১২১১ কোটি টাকা)। বড় শহরগুলোর মধ্যে সকলের উপরে রয়েছে চেন্নাই (৯২৮ কোটি টাকা)। তারপর যথাক্রমে মুম্বাই (৮৯১ কোটি টাকা) ও রাঁচী (৬৫৩ কোটি টাকা)। ঝাড়খন্ডের নিরক্ষর ও দরিদ্র জনজাতি লোকদের খৃস্টান করার জন্যই যে রাঁচীর পাদ্রিরা ৬৫৩ কোটি টাকা পেয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। যেই সব দেশ থেকে টাকা এসেছে, তার শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সে দিয়েছে ২৯৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে জার্মানী (১৬৫০ কোটি টাকা) ও বৃটেন (১৪২৫ কোটি টাকা)। আমেরিকার যে সংস্থা সবথেকে বেশি টাকা দান করেছে তার নাম হল "ওয়ার্লড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল" (৪৬৯ কোটি টাকা)। সেই রকম জার্মানীর বড় দাতা হল "মিসেরিয়র পোস্টফ্যাক" (MISEREOR POSTFECH) এবং এই সংস্থা দিয়েছে

১৬৫০ কোটি টাকা। এর পরেই স্থান হল স্পেন-এর "ফান্ডাসিয়ন ভিসেন্টি ফেরার' (FUNDACION VICENTE FERRER) এবং এই সংস্থা দিয়েছে ৩৯৯ কোটি টাকা।

প্রাপকদের মধ্যে সব থেকে উপরে রয়েছে ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচীতে অবস্থিত "রাঁচী জেসুইটস" (RANCHI JESUITS) এবং এই সংস্থা পেয়েছে ৬২১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মুম্বাই-এর কাছে কল্যাণ-এ অবস্থিত "সন্তহোম ট্রাস্ট অফ কল্যাণ" (SONTHOME TRUST OF KALYAN) এবং এই সংস্থা পেয়েছ ৩৩৩ কোটি টাকা। তৃতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লীর "সভরিন অর্ডার অফ মাল্টা" (SOVERGEIN ORDER OF MALTA) এবং এই সংস্থা পেয়েছে ৩০১ কোটি টাকা। সেই সমীক্ষায় আরও বলা হয় যে, ইসলাম প্রচারের জন্য আরবের দেশগুলো থেকে যে টাকা আসে, তা হাওলার মাধ্যমে আসে বলে তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়।

যে টাকা পয়সা মিশনারিরা পায় তার একটা বড় অংশ ব্যয় হয় টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে খৃস্টান বানানোর কাজে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যে টাকা পয়সা ও খাদ্য সামগ্রীর লোভ দেখিয়ে খৃস্টান বানানো হয়, খৃস্টান হয়ে গেলে তারা সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখে না। গত ২০০৭ সালে মুম্বাইয়ের একটি মিশনারি সংস্থার প্রধান ফ্র. এডোয়ার্ড নগদ টাকা, বিদেশে চাকরি, দরিদ্র পরিবারের নাবালক ও শিশুদের ভরণপোষণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহারাষ্ট্রের ভাইন্দার, যোগেশ্বরী ও আন্ধেরি অঞ্চলের ৪০টি হিন্দু পরিবারকে খৃস্টান বানায়। কিন্তু খৃস্টান হবার পর সেই প্রতিশ্রুতির কোনটাই পালন করে না। স্থানীয় বজরং দলের সদস্যরা ব্যাপারটা আদালতে নিয়ে যায় এবং পাদ্রি এডোয়ার্ড ভারতীয় দন্ডবিধির ২৯৫-এ এবং ৫০৮ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত হয়।

আরও নানা ভাবে তারা সেই অর্থ ব্যয় করে, তবে সেই সব মূল উদ্দেশ্য হল হিন্দুদের খৃস্টান করা। স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করার লক্ষ্য হল সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিত করা। এই সব ব্যাপারগুলোও লেখিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেববর্মা তাঁর গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। তবে সেই সব ব্যাপারে হিন্দুদের মূর্খতাও অনেকাংশে দায়ি। যেমন, নাটক কিংবা সিনেমায় হিন্দুরাই এই সব পাদ্রিদের মহান সেবার অবতার রূপে তুলে ধরে। যেই মহিলা সেবার নামে হাজার হিন্দু শিশুকে খৃস্টান বানাল এবং দত্তক নেবার নামে বিদেশে বিক্রী করে কোটি টাকার ব্যবসা করল, মূর্খ হিন্দুরদলই সেই মহিলাকে মাদার মাদার করে আজ দেবীর আসনে বসিয়েছে। কোলকাতার এক ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে তার বিশাল দেওয়াল চিত্র (Mural) তৈরি করেছে। তাই এই মূর্খ হিন্দুদের বোকা বানাতে তারা নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির কাজে লাগাচ্ছে।

পাদ্রিরা ও তাদের সাকরেদরা হিন্দু নাম গ্রহণ করছে, গেরুয়া পোশাক পরছে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরে কপালে তিলক আঁকছে। খোল করতাল নিয়ে যিশুর কীর্তন করছে। সংস্কৃত মন্ত্র তৈরি করে রীতিমত হিন্দু রীতি অনুসারে যিশু ও মেরীর পুজো করছে। আরও কত ছল চাতুরী যে করছে তা বলে শেষ করার উপায় নেই।

অন্য দিকে বনবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বনবাসী হিন্দু যুবক ও যুবতী খৃস্টান বনবাসী মেয়েদের ধর্মীয় শিবির করার নামে গভীর জঙ্গলে ক্যাম্প করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে ৩/৪ দিন ও রাত্রি খুব কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কারণ হিন্দু যুবকদের যে কোন ফাঁদে ফেলে খৃস্টান বানাতে হবে।

তারপর আছে, ৪/৫ ভাই-এর সংসার থেকে কোন এক ভাই কে কোন মতে খৃস্টান করতে পারলে জাল দলিল দস্তাবেজ তৈরি করে সব জমি জায়গা তার নামে করে দেওয়া। তারপর অন্য ভাইদের সামনে প্রস্তাব রাখা যে, যদি তারা খৃস্টান হয় তবেই তারা জমির অংশ পাবে। তখন বাধ্য হয়ে পেটের টানে সবাইকেই খৃস্টান হতে হয়। তবে সুখেও কথা হল, মিথ্যা দিয়ে সত্যকে কখনও চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। যে সমস্ত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাদ্রিরা তাদের খৃস্টান বানায়, পরে যখন তারা দেখে যে সেই প্রতিশ্রুতি তারা রাখছে না, তখনই অনেকের চোখ খুলে যায়। তখন তারা আবার নিজরে ধর্মে ফিরে আসে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, ফ্রেন্ডস অফ দি ট্রাইবাল সোসাইটি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, আর্য সমাজ প্রভৃতি সংস্থা আবার তাদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সব থেকে বড় কথা হল, আজকের খৃস্টধর্ম যদি যিশু প্রচারিত প্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীকে অনুসরণ করে গড়ে উঠত তবে তা পল প্রচারিত সাম্রাজ্যবাদী ধর্ম না হয়ে সমগ্র মানব সমাজের এক কল্যাণকারী ধর্ম হত এবং সেই অবস্থায় ওই ধর্মেও প্রচারকদের মধ্যে ভারতের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে ভারতকে একটি ধর্মীয় উপনিবেশে পরিণত করার কোন প্রবণতাও থাকত না।

খৃষ্টধর্ম ও বিজ্ঞান

(১)

আশি জন সদস্য বিশিষ্ট 'পেন্টিফিকাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স' হল খৃষ্ট ধর্ম তথা পোপের অনুগত বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা, যার কাজ হল, বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারে পোপকে পরামর্শ দেওয়া। গত বছর ২৪ অক্টোবর (১৯৯৬) উক্ত সংস্থা যখন তার ৬০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করছিল, তখন পোপ দ্বিতীয় জন পল সমবেত বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় ঘোষণা করেছিলেন যে, ডারউইন-এর বিবর্তনবাদের সঙ্গে ক্যাথলিক ধর্মমতের কোন বিরোধ নেই। এই ঘোষণার স্বপক্ষে তিনি যুক্তি দেখালেন যে, ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব এখন আর অনুমানের পর্যায়ে নেই এবং বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

পোপের এই ঘোষণা শুধু উপস্থিত বিজ্ঞানীদেরই নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীকেই চমৎকৃত করল। বিগত ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে চার্চের বিবাদ চরম সীমায় পৌঁছায়। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে যখন চার্লস ডারউইন তাঁর 'The origin of Species by Natural Selection" এবং "The Descent of Man" নামক গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করেন, তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রবল ভাবে দেখা দেয়। বাইবেলের 'জেনেসিস' অধ্যায়ে বর্ণিত সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হবার ফলে চার্চ ডারউইন ও তাঁর তত্ত্বের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। আর কয়েকশ বছর আগে হলে কথা ছিল না, হয়তো এই পাপের জন্য ডারউইনকে পুড়ে মরতে হতো। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৫০ সালে পোপ দ্বাদশ পায়াস তাঁর 'হিউম্যানী জেনেসিস' গ্রন্থে এই মত ব্যক্ত করেন যে, ডারউইনের তত্ত্বকে সরাসরি নাকচ না করলেই হয়তো চার্চের পক্ষে ভাল হতো।

বাইবেল অনুসারে গড ছয় দিনের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন এবং ইসলাম ও ইহুদীদের ধর্ম জুদাইসম্‌ও এই মতে বিশ্বাসী। ইসলামী মতে নবী মহম্মদ আদি মানব মানবী আদম ও ঈভের ৯০তম বংশধর। কাজেই দুই প্রজন্মের মধ্যে ৩০ বছর বয়সের তফাৎ ধরলে মেনে নিতে হয় যে, আজ থেকে ৪৩২৭ বছর আগে গড বা আল্লাহ এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ডারউইনের তত্ত্ব বাইবেল বা কোরান বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে এবং পোপ ডারউইনের তত্ত্বকে মান্যতা দিয়ে প্রকারান্তরে বাইবেলের প্রথম অধ্যায় 'জেনেসিস'কে সমূলে উৎখাত করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পোপের

উক্ত ঘোষণা সমস্ত খৃষ্টান জগতকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাইবেলের মতে গড প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করার পর তার মধ্যে আত্মা ফুঁকে দেন এবং তাই শুধু মানুষের মধ্যেই আত্মা আছে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে নেই। কাজেই ডারউইনের মত অনুযায়ী মনুষ্যেতর বানর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের কোন পর্যায়ে গড মানুষের মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছিলেন তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে। সাংবাদিকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে পোপ প্রথমে তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন এবং সাংবাদিকরা চেপে ধরলে বলেন, "যদি মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে মানুষের উদ্ভব হয়ে থাকে তবে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই গড আত্মা সৃষ্টি করেন।" তিনি আরও বলেন যে, "ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানুষের আত্মার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেয় না এবং ইতর প্রাণী থেকে মানুষের সম্ভ্রমকে পৃথক করে দেখার চেষ্টা করে না।"

বিগত ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস-এর ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ Cardinal Cormac Murphy O'Connor এবং ওয়েস্টমিনিস্টারের আর্চবিশপ Cardinal Keith O'Brien-এর তরফ থেকে teaching document নামে একটা শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয় যে, তাদের যে ৫০ লক্ষ অনুসরণকারী খৃস্টান রয়েছে তারা যেন বাইবেলে যা লেখা আছে তাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে না নেয়। Dei Verbum বা দ্বিতীয় ভাটিকান কাউন্সিলের ৪০ বৎসর পূর্তি উৎসব হিসাবে ওই শুদ্ধিপত্র প্রকাশ করা হয়।

বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বা জেনেসিস অধ্যায়ে বলা আছে যে, আদম একদিন যখন ঘুমোচ্ছিল তখন গড তার পাঁজর থেকে এক টুকরো হাড় খুলে নিয়ে সেই হাড় দিয়ে তিনি প্রথম নারী ঈভকে সৃষ্টি করেন। উপরিউক্ত শুদ্ধিপত্রে এই বিষয়টার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, এটা কখনও নারীজাতির উৎপত্তির ব্যাখ্যা হতে পারে না। শুদ্ধিপত্রে আরও বলা হয় যে, বাইবেলের যেখানে যেখানে এরকম অবৈজ্ঞানিক গল্পসল্প আছে তাকেও বিশ্বাস করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই।

যাই হোক সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দু মত কি বলে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা সমীচীন হবে। মাত্র ৪০০০ বছর আগে এই বিশ্ব জগতে সৃষ্টি হয়েছে এমন হাস্যকর কথা হিন্দুশাস্ত্র বলে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

সহস্রযুগপর্যন্ত মহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।।
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে। (৮।১৭-১৮)

অর্থাৎ পার্থিব ১০০০ যুগ ব্রহ্মার ১ দিন এবং ওই ১০০০ যুগে ব্রহ্মার ১ রাত্রি। ব্রহ্মার দিনে দৃশ্যমান জগৎ অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিতে পুনরায় ব্যক্ত অবস্থা থেকে

অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায় বা লয় হয়। কপিলমুনি তাঁর সাংখ্য দর্শনে একই কথা বলেছেন। সৃষ্টির মূল উপাদান 'মূলপ্রকৃতি' হল সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের চরম অহংকারের ফলে এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হলে অব্যাক্ত প্রকৃতি ব্যক্ত হয় এবং আবার যখন প্রকৃতি তার সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে তখন ব্যক্ত প্রকৃতি অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে ফিরে যায়। উপরোক্ত শ্লোক দুটিতে ভগবান সাংখ্য মতই গ্রহণ করেছেন। এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যখন পরবর্তী ৯ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেন,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে।। (৯।১০)

হিন্দুর ভগবান বলেন যে, জীব অজীব সর্বভূতের তিনই বীজ, 'বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্', সুতরাং মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে আত্মা থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি!

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।। (ঐ ৭।৫)

যাই হোক, ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের বিবাদের সূত্রপাত হয় ১৬শ শতাব্দীতে। যখন কোপার্নিকাস তাঁর সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডলীর তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এর প্রায় ১০০ বছর পর জোহানেস কেপলার উক্ত তত্ত্বকে দৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে চার্চের ভূকেন্দ্রিক মতবাদকে ধূলিস্যাৎ করেন। কিন্তু কোপার্নিকাসকে কোনরকম সাজা দেওয়া চার্চের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ, কোপার্নিকাস নিজেই ছিলেন চার্চেও একজন যাজক (ক্যানন)। কাজেই চার্চের পক্ষে প্রথমে এটা বিশ্বাস করাই সম্ভব হয় নি যে, তিনি নিজে চার্চের একজন কর্তাব্যাক্তি হয়ে চার্চের বিরুদ্ধ কোন মতবাদ প্রচার করতে পারেন। যখন চার্চের টনক নড়ল, তখন কোপার্নিকাস ইহধাম ত্যাগ করে চলে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর গ্রন্থ 'রিভলিউশনিবাস' যখন প্রকাশিত হয় তখন তিনি মৃত্যু শয্যায়। পরবর্তীকালে একই মত পোষণ করার ফলে চার্চ ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারে এবং গ্যালিলিওকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। অথচ এর প্রায় হাজার বছর আগে ঠিক একই মতবাদ প্রচার করার জন্য ভারতবর্ষ বিজ্ঞানী আর্যভট্টকে সম্মানিত করে।

মাত্র শ'খানেক বছর আগে পোপ ১৩শ লিও দেখাতে চেষ্টা করেন যে চার্চ বিজ্ঞান বিরোধী নয় এবং এই উদ্দেশ্যে ভাটিকান অবসার্ভেটরির প্রতিষ্ঠা করেন। এসব সত্ত্বেও চার্চের আরও ১০০ বছর লেগে গেল বিজ্ঞানকে মেনে নিতে এবং অতি সম্প্রতি, মাত্র কয়েক বছর আগে ঘোষণা করা হল যে,গ্যালিলিওর প্রতি দুর্ব্যবহার করে চার্চ অন্যায় করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে গত ১৯৮৮ সালে যখন স্যার আইজাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা' গ্রন্থের ৩০০তম প্রকাশনা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হচ্ছিল, তখন পোপ দ্বিতীয় জন পল ঐ গ্রন্থকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ভাটিকান অবসার্ভেটরির উপাধ্যক্ষ ফাদার ম্যাফেও বলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সময় বদলাচ্ছে। আজকের চার্চ অনেক

উদার হয়েছে এবং বিজ্ঞানকে মেনে নিচ্ছে।...বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আগেকার দিনে যা যা পড়ানো বা বোঝানো হতো তার অনেক কিছুই বাতিল করা দরকার। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আদিম মানব মানবী আদম ও ঈভ থেকে বর্তমান মনুষ্য জাতির উদ্ভব হয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করেন না। তবে এটা বিশ্বাস করেন যে মানবের ক্রমবিকাশের কোন এক পর্যায়ে গড মানুষের মধ্যে আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটান।"

এই সকল কথা প্রসঙ্গে ফাদার ম্যাফেও সুযোগ মতো হিন্দু মতবাদকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান যেমন একাধারে খৃষ্ট মতবাদের পরিবর্তন সাধন করছে, তেমনি পৌত্তলিকতার ও "False absolute"-এর তত্ত্বকেও সমানভাবে নাকচ করেছে। পৌত্তলিকতার কথা বলতে তিনি যে সরাসরি হিন্দুদেরই আক্রমণ করছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ হিন্দুরাই একমাত্র পৌত্তলিক। উপরন্তু "False absolute" বলতে তিনি যে অজ, নিত্য ও শাশ্বত ব্রহ্মকে বোঝাতে চেয়েছেন, তা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কথা হল এই যে, ফাদার ম্যাফেও হঠাৎ এবং বিশেষ করে হিন্দু তত্ত্বের পিছনে পড়লেন কেন? কারণ একটাই। আজ জড় বিজ্ঞান যা যা আবিষ্কার করছে, বাইবেলের গল্পস্বল্প দিয়ে তা ব্যাখ্যা করা না গেলেও হিন্দু তত্ত্ব দিয়ে খুব ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ খৃষ্টান ও ইসলামী তত্ত্বকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করছে, কিন্তু হিন্দু তত্ত্বকে মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধ করছে। এই সমস্ত কারণে পাশ্চাত্য মনীষা বাইবেল ছেড়ে ক্রমেই হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু দর্শনের দিকে ঝুঁকছে। কাজেই ফাদার ম্যাফেরও মতো লোকেরা বুঝতে পারছেন যে, গায়ের জোরে যে বাইবেলের তত্ত্ব, যে বাইবেলের গল্প এতদিন মানুষকে গেলানো যাচ্ছিল এবং যার দ্বারা তাদের মতো কুনো ব্যাঙেদের ধরে রাখার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না, তার দ্রুত সমাপ্তি এগিয়ে আসছে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পোপ জন পল যখন ফ্রান্স ভ্রমণে যান তখন এই শুভেচ্ছা ভ্রমণের প্রতিবাদে দলে দলে লোক ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করার ভয় দেখায়। দক্ষিণ ফ্রান্সের হাজার হাজার লোক গীর্জায় গিয়ে দাবি করতে থাকে। ক্যাথলিক খাতা থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হোক এবং খৃষ্ট ধর্ম থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম থেকে বহির্গমনের কোন পন্থা জানা নেই বলে পাদ্রীরা তাদের নামের পাশে এই মন্তব্য নথিভুক্ত করলেন যে, এরা আর খৃষ্ট ধর্মে থাকতে চায় না। এর আগে পোপ যখন জার্মানী ভ্রমনে যান, সেখানেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান হিন্দুর পতাকাকেই উঁচু থেকে আরও উঁচুতে তুলে ধরছে। আর এটাই ফাদার ম্যাফেওর গাত্রদাহের কারণ। কিন্তু যতই গাত্রদাহ হোক না কেন, সত্য টিকে থাকবে এবং মিথ্যা ধূলিস্যাৎ হবে। এটাই নিয়ম। যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খৃষ্টমতকে কবরের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দেবে এবং পক্ষান্তরে হিন্দু মতকে মহিমায় উজ্জ্বল করবে সেটাই এখন বলবো।

(২)

প্রাচীনপন্থী জীব বিজ্ঞানীদের মতে, জীবন একটি ব্যতিক্রম এবং সম্ভবত একমাত্র এই পৃথিবীতেই তার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু অপর যে মত ক্রমেই বিজ্ঞানীদের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠছে তা হল, অনু পরমাণুর যে জটিল বিক্রিয়াকে আমরা প্রাণ বা জীবন আখ্যা দিই, উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে তা যে কোন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। তাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মতে জীবন সর্বব্যাপী। কিন্তু এই মত খৃষ্ট ধর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, বাইবেল বলছে, গড একমাত্র এই পৃথিবীতেই জীবন সৃষ্টি করেছেন, তাই জীবন শুধু এই পৃথিবীতেই আছে। কাজেই বিজ্ঞানীরা যদি পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের সন্ধান পান, তবে এটাই প্রমাণ হবে যে, দ্বিতীয় কোন অন্য গড সেই জীবন সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, বহির্বিশ্বের সেই প্রাণী যদি বেশি বুদ্ধিমান বা বেশি উন্নত হয়, তবে এটাই প্রমাণ হবে যে, সেই দ্বিতীয় গডের থেকে বাইবেলের গড অনেক নিম্ন শ্রেণীর।

এই সৌর জগতে পৃথিবীর অবস্থান, বিশেষ করে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ দূরত্ব একটু বেশি হলে সব জল জমে বরফ হয়ে যেত এবং একটু কম হলে বাস্প হয়ে উড়ে যেত। এই কারণে একমাত্র পৃথিবীতেই জল তরল অবস্থায় আছে এবং এই কারণেই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। কাজেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, জলের তরল অবস্থায় থাকা জীবন সৃষ্টির সর্বপেক্ষা প্রাথমিক শর্ত। সুতরাং এটা অনুমান করা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, এমন যদি কোন গ্রহ থাকে যা অনেক দূরের কোন নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং যেখানে জল তরল অবস্থায় আছে তবে সেখানেও প্রাণের উদ্ভব সম্ভব। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, 'ছায়াপথ গ্যালাক্সী'-তে প্রায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে (সূর্য এই ছায়াপথ গ্যালাক্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি নক্ষত্র) এবং এই দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের বেশ কয়েক হাজার কোটি গ্রহ থাকা সম্ভব।

কয়েক বছর আগে 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা 'হাবল্ টেলিস্কোপ' নামে একটা দূরবীণ মহাকাশে পাঠান। এই দূরবীণের সাহায্যে মহাকাশের খুব সুন্দর সুন্দর ছবি পৃথিবীতে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। যা এতদিন পৃথিবীস্থিত কোন দূরবীণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কি করে বিশাল বিশাল মহাজাগতির বস্তুকণার মেঘ আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে নক্ষত্র ও গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি করে, তা এই সব ছবিতে খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠছে। এইসব ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে শুরু করেছেন যে, ছায়াপথের সমস্ত নক্ষত্রেরই নিজস্ব গ্রহমণ্ডলী আছে। কাজেই এইসব গ্রহের মধ্যে জল তরল অবস্থায় আছে এমন গ্রহের সংখ্যাও বেশ কয়েক কোটি থাকা সম্ভব। ইদানীং কালের কিছু কিছু আবিষ্কারও এই অনুমানের স্বপক্ষে রায় দিচ্ছে।

আজকের অতিশয় শীতল ও শুষ্ক মঙ্গল গ্রহ চিরকাল এইরকম ছিল না এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, এককালে তা আজকের পৃথিবীর মতোই নাতিশীতোষ্ণ ছিল এবং তখন

সেখানে জল তরল অবস্থায় ছিল। কাজেই তখন সেখানে অবশ্যই প্রাণের উদ্ভব ঘটেছিল এবং সম্ভবত বহু রকমের এককোষী প্রাণী সেখানে জন্ম লাভ করেছিল। এই অনুমানের ভিত্তি হল এই যে, কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানীরা আন্টর্কাটিকা মহাদেশে একটা উল্কা পিণ্ড খুঁজে পান এবং পরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে 'এ্যালান হিল-৮৪০০১' নামে পরিচিত ওই উল্কা পিণ্ডটি মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছিল। সম্ভবত প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে একটা বড় ধরণের উল্কা পিণ্ড (মতান্তরে ধূমকেতু) মঙ্গল গ্রহকে আঘাত করে এবং তার ফলে মঙ্গল গ্রহের খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ঘুরতে থাকে। প্রায় ১২০০০ বছর আগে তা আন্টার্কটিকায় পতিত হয়।

এর মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে, তারা ওই উল্কা পিণ্ডের মধ্যে এমন কিছু জৈব যৌগের সন্ধান পেয়েছেন যা কেবল জীবানু জাতীয় প্রাণীই তৈরি করতে পারে। এব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আজও সেই জীবানুরা বেঁছে আছে এবং বাঁচার জন্য মঙ্গল পৃষ্ঠের অনেক নীচে চলে গেছে। এ ধারণা আজও জোরদার হয়েছে এই কারণে যে, সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা 'মিথানোকক্কাস জান্নাস্কি' নামে এক প্রকার জীবানুর সন্ধান পান যা ভূতল পৃষ্ঠের বহু নীচে প্রচণ্ড গরম ও চাপে বেঁচে থাকতে সক্ষম।

১৯৮৯ সালে 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা 'গ্যালিলিও' নামে একটি মহাকাশযানকে বৃহস্পতি গ্রহের দিকে পাঠান এবং গত বছর আগষ্ট মাসে তা বৃহস্পতির চতুর্থ বৃহত্তম উপগ্রহ 'ইয়োরোপা'কে অতিক্রম করে যায়। ওই সময় 'গ্যালিলিও' যে সব ছবি পাঠায় তা থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, ''ইয়োরোপা'র উপরিভাগ কঠিন বরফের আস্তরণে ঢাকা থাকলেও ওই বরফের নীচে তরল জলের মহাসমুদ্র রয়েছে। কাজেই অনুমান করা চলে যে, ওই মহাসমুদ্রে জীবন বিদ্যমান।

দূর দূরান্তের নক্ষত্রদের কেন্দ্র করে সত্যিই কোন গ্রহ বা গ্রহমণ্ডলী ঘুরছে কিনা তার সন্ধান করতে কিছু জ্যোতির্বিদ ইতিমধ্যে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। গত ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্যালিফর্নিয়ার 'লিক্' মান মন্দিরের দুই জ্যোতির্বিদ ঘোষণা সকরলেন যে, তাঁরা একটি গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন যা ৩৫ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র "47 Ursae Majoris"-কে কেন্দ্রকরে ঘুরছে। প্রায় দুমাস পরে তারা আর একটি গ্রহেরও সন্ধান পান, যা 'কন্যা' রাশির অন্তর্গত "70 Virginis" নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। অবশ্য এর কয়েক মাস আগে সুইজারল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ ডিডিয়ার কুয়েলজ ও মাইকেল মেয়র ঘোষণা করেন যে, তাঁরা একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন যা ৪৫ আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র "51 Pegasi"-কে কেন্দ্র করে ঘুরছে। গত বছর অক্টোবর মাসে টেক্সাস ও সানফ্রান্সিস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা যৌথভাবে দাবি করেন যে, তাঁরা বৃহস্পতি থেকে ১.৬ গুণ ভারী ৬ষ্ঠ গ্রহটি আবিষ্কার করেছেন যা "সিগনাস" নক্ষত্রপুঞ্জের "16 Cygni B" নামক নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

এদিকে 'নাসা'র বিজ্ঞনীরা বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই 'অরিজিনস্' নামে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এবং ২০১০ সালের মধ্যে 'প্ল্যানেট ফাইণ্ডার' নামে অপর একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র মহাকাশে পাঠাবার কথা ঘোষণা করেছে। নাসার অধ্যক্ষ শ্রী ড্যানিয়েল গোল্‌ডিং আশা করেন যে, এই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে যেসব উন্নত মানের যন্ত্রপাতি থাকবে তার দ্বারা দূরের যে কোন গ্রহের পরিষ্কার ছবি তোলা যাবে। শুধু তাই নয়, ওইসব ছবিতে সেই গ্রহের আকাশের মেঘ, মহাদেশ, মহাসাগর ইত্যাদিও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। শ্রী গোলডিং এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যে আরকয়েক বছরের মধ্যেই এটা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি নেই।

আর একদল বিজ্ঞানী বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে কিনা তার খোঁজ করে চলেছেন। বোস্টন শহরের অদূরে ২৫ মিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি বিশাল 'হারবার্ড স্মিথোনিয়ান' বেতার দূরবীণের সাহায্যে তাঁরা দিনরাত মহাকাশকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এছাড়াও পৃথিবীতে আরও ১০ থেকে ১২টি কেন্দ্র এই কাজ করে যাচ্ছে এবং সম্প্রতি বৃটেনের 'জডরেল ব্যাঙ্ক' মান মন্দিরের বিজ্ঞানীরাও এই অনুসন্ধান কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁরাও এই আশা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন যে, বহির্বিশ্বে যদি কোন বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে আর তারা যদি কোন বেতার সংকেত পাঠায় তবে বিশাল বিশাল বেতার দূরবীণের সাাহয্যে তাঁরা তা ধরতে পারবেন এবং সম্ভব হলে তার জবাব দিতে পারবেন।

তবে এরকম কোন সংকেত তাঁরা আজ পর্যন্ত পান নি। কিন্তু কথা হল, আজ যদি তাঁরা ওইরকম কোন সংকেত পান, তাহলেও এটা প্রমাণ হবে না যে, সেই বুদ্ধিমান প্রাণীরা আজও সেখানে বেঁচে আছে কি না। ধরা যাক, ৩৫ হাজার আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্রহ থেকে সেই সংকেত পাওয়া গেল। তাহলে সেই সংকেত ৩৫ হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল এবং এখন আমরা তার কোন জবাব পাঠালে তাও ৩৫ হাজার বছর পরে সেখানে পৌঁছুবে। তবে এটা অবশ্যই প্রমাণ হবে যে, অন্তত ৩৫ হাজার বছর আগে সেখানে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব ছিল। তবে বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে খুবই আশাবাদী যে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে পারবেন।

এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পল ডেভিস বলেন, "বহির্বিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব শুধু যে আমাদের বিজ্ঞানকেই প্রভাবিত করবে তা নয়, এই আবিষ্কার আমাদের ধর্ম, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই পরিবর্তিত করবে।" তিনি আরও বলেন, "বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হলে খৃষ্ট ধর্মমতকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আর তাহল, যীশু কি শুধু পার্থিব বুদ্ধিমান প্রাণীরই পরিত্রাতা, নাকি সমগ্র বিশ্বের বুদ্ধিমান প্রাণীরও পরিত্রাতা? এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীডেভিস শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীর পরিত্রাণ নিয়েই চিন্তিত। তাদের ধর্মমত অনুসারে

তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ, বুদ্ধিহীন প্রাণীর আত্মাই নেই, তাই তার পরিত্রাণই বা কি আর অ-পরিত্রাণই বা কি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রীডেভিস আরও একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন। অ-খৃষ্টান বুদ্ধিমান প্রাণীর পরিত্রাণের ব্যাপার যীশু বা তাঁর স্বর্গস্থ পিতার কোন মাথাব্যথা আছে বলে আমাদের জানা নেই। উপরন্তু সেই সমস্ত বিধর্মী নরাধমদের জন্য স্বর্গস্থ পিতা অনন্ত নরকের ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। কিন্তু হিন্দুর ভগবান বলে, "সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ" অর্থাৎ কেউ আমার প্রিয় নয়, কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয়, সবাই আমার কাছে সমান (গীতা, ৯।২৯)

কাজেই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বহির্বিশ্বে প্রাণের আবিষ্কার খৃষ্ট ধর্ম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও ইহুদীদের ধর্মেরও কবর রচিত করবে। পক্ষান্তরে এই আবিষ্কার হিন্দুর সনাতন ধর্মকে মহিমান্বিত করবে। মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। হিন্দু ধর্ম মতে অব্যয়, অক্ষয়, ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্ত্বা ব্রহ্মই হল এই সৃষ্টির আদি কারণ এবং জড় জগত, জীব জগত সবকিছুই সৃষ্টিকালে এই চৈতন্যময় সত্ত্বা থেকে উদ্ভুত হয়ে প্রলয় কালে সেই চৈতন্যময় সত্ত্বাতেই বিলীন হয়। সনাতন ধর্মমতে জীবন বা প্রাণ সেই চৈতন্যময় সত্ত্বারই একটা বিশেষ প্রকাশ মাত্র। কাজেই হিন্দু সাধক যে দিকে তাকান, জড় জীব সব কিছুতেই সেই এক চৈতন্যময় সত্তাকেই দেখতে পান।

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্রসমদর্শনঃ।। (গীতা, ৬।২৯)

কাজেই জীবন যে সর্বব্যাপী, হিন্দুর ভগবান ও হিন্দু ঋষিরা অনেক আগেই তা বলে গেছেন। আজ জড় বিজ্ঞান অনেক কষ্টসাধ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা সেই ঋষিদৃষ্ট সত্যকেই আবিষ্কার করতে চলেছে। আরও আশ্চর্যের কথা হল এই যে, ব্যাসদেব শ্রীমদভাগবতে শুধু মনুষ্যবাসযোগ্য অন্য জীবলোকের কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মতো আরও কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলে গেছেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রভূ বলে বর্ণনা করে গেছেন।

বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার যে হিন্দু তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শুধু একথা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই কথা জেনে যাতে প্রতিটি হিন্দুর মনে, নিজের ঐতিহ্য সংস্কৃতি, অতিশয় উচ্চমানের দর্শন ও ধর্মমতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জাগরিত হয় এবং অন্তরে গর্ববোধ জাগরিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকে যদি সাপ বলে মনে করা যায়, তবে অন্যান্য ধর্মমত হল ব্যাঙ। যারা সাপের কাছ থেকে দূরে পালাতে ব্যস্ত। তা না হলে সাপ তাদের খে[illegible] করে ফেলবে। সেখানে হিন্দু ধর্ম হল অভিজ্ঞ সাপুড়ে। যে নিমেষে এই সাপকে ধরে ঝাঁপিতে পুরে ফেলতে সক্ষম। প্রতিটি হিন্দুকে মনে রাখতে হবে যে, অনেক জন্মের পূণ্য ফলে হিন্দু হয়ে জন্মেছি এবং এক সুউন্নত ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি।

পরিবেশ

বিশ্বের উষ্ণায়ণ ঃ মানব জাতির সামনে এক গভীর সমস্যা

গত বছর (২০০৫) সেপ্টেম্বর মাসে আমেকিরায় কাটরিনা ও রিটা নামে দুটো প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় এবং তাতে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক প্রাণহানি হয়। মাত্র ৩ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে দু-দুটো পঞ্চম মাত্রার ঝড় আমেকিরার মেক্সিকো উপকূলে আছড়ে পড়ে। প্রথমে আসে কাটরিনা এবং তার প্রায় ৩ সপ্তাহ পরে আসে রিটা। কাটরিনা ও রিটা, উভয়ই আটলান্টিক মহাসাগরে সামান্য নিম্নচাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তাদের বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র ৪০ কিমি। তারপর ফ্লোরিডা উপদ্বীপ অতিক্রম করে তারা প্রথম মাত্রার ঝড়ে পরিণত হয়। তখন তাদের বাতাসের গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১৫০ কিমি। কিন্তু তার ১ দিন পরেই তারা অতি দ্রুত পঞ্চম মাত্রা-র ঝড়ে পরিণত হয় এবং বাতাসের গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ২৫০ কিমি বা তারও বেশি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দু-দুটো প্রথম মাত্রায় ঝড়ের হঠাৎ পঞ্চম মাত্রার ঝড়ে পরিণত হবার ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের বেশ ভাবিয়ে তোলে এবং তারা বিশ্বের উষ্ণায়ণকেই এর জন্য দায়ী করেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে, বিশ্বের উষ্ণায়ণের ব্যাপারটা আজ কল্পনা ও অনুমানের পর্যায় পার হয়ে বাস্তাব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এর ফলে উত্তর মেরুতে তৈরি হয়েছে প্রায় দেড় কিমি ব্যাসের এক পেয় জলের হ্রদ। এর ফলে গত বিশ বছরে আলাস্কা, কানাডা ও সাইবেরিয়ার গড় তাপমাত্রা প্রায় ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে মেরু অঞ্চলের বরফ প্রায় ৪০ শতাংশ পাতলা হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে তার বিস্তার প্রায় ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

বিজ্ঞানীদের সাধারণ অভিমত হল, উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৬ ডিঃ সেঃ অতিক্রম করলেই তা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। বর্তমানে এই বিষয়টির ওপর অনেক গবেষণা হচ্ছে। যাই হোক, কাটরিনা ও রিটার ধ্বংসলীলারর ঠিক পরেই আমেরিকার জর্জিয়া রাজ্যে অবস্থিত 'জর্জিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি'র আর্থ অ্যাণ্ড অ্যাটমসফেরিক সাইন্স' বিভাগের বিজ্ঞানী ডঃ পিটার ওয়েবস্টার 'সায়েন্স' পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে ডঃ ওয়েবস্টারের মত হল,

সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা আরও বাড়লে তা অত্যন্ত বিধ্বংসী ও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণী ঝড়ের জন্ম দিতে পারে। তিনি পৃথিবীর ৬টি সমুদ্রের উষ্ণতা ও তাদের সৃষ্ঠ ঝড়ের ওপর কাজ করেছেন। এই সমুদ্রগুলি হল—(১) উত্তর আটলান্টিক, (২) পশ্চিম প্রশান্ত, (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত, (৪) পূর্ব প্রশান্ত, (৫) উত্তর ভারত ও (৬) দক্ষিণ ভারত মহাসাগর। ডঃ ওয়েবস্টারের মতে, ১৯৭০ থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মহাসাগরগুলির গড় উষ্ণতা প্রায় ০.৫ ডিঃ সেঃ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭০ সালের পরে যত বিধ্বংসী ঝড় হয়েছে তার পরিসংখ্যান অনুসন্ধান করে ডঃ ওয়েবস্টার দেখতে পান যে, ওই রকম ঝড়ের সংখ্যা ও তাদের স্থায়িত্ব উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও দেখতে পান যে, সমগ্র পৃথিবী জুড়েই প্রলয়ঙ্কর বিধ্বংসী ঝড়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং সেই তুলনায় কম শক্তি সম্পন্ন ঝড়ের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪—এই ৫ বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে ৪৪টি প্রথম শ্রেণী এবং ১৮টি চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ঝড় হয়েছে। অথচ ২০০০ থেকে ২০০৪—এই ৫ বছরের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ঝড় হয়েছে মাত্র ২৯টা। কিন্তু চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ঝড়ের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭। অর্থাৎ বিগত ৩০ বছরের মধ্যে প্রলয়ঙ্কর পঞ্চম শ্রেণীর ঝড়ের সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ডঃ ওয়েবস্টার আরও লক্ষ্য করেন যে, দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণতা তেমন বৃদ্ধি না পেলেও সেখানে পঞ্চম শ্রেণীর ঝড়ের সংখ্যা ও তাদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরিউক্ত জর্জিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির অন্য দুই বিজ্ঞানী শ্রী গ্রেগ হল্যাণ্ড এবং জুডি কারি উল্লিখিত 'সায়েন্স' পত্রিকায় সম্প্রতি আরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তাঁরা বিগত ৩৫ বছরের সমগ্র পৃথিবীতে যত বড় বড় বা হ্যারিকেন হয়েছে তাদের গতি প্রকৃতি পর্যালোচনা করেন। তাঁরাও দেখতে পান যে, গত ৩৫ বছরে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ঝড়ের সংখ্যা কমেছে, কিন্তু ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, গত ১৯৭০ সালে সারা বিশ্বে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ঝড় হয়েছিল মাত্র ১০টা। কিন্তু ২০ বছর পরে ১৯৯০ সালে ওই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১৮টিতে পৌঁছায়। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন যে, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪—এই ৫ বছরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত ঝড়ের মাত্র ২০ শতাংশ ছিল বড় ধরনের ঝড়। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে তা বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ হল্যাণ্ড বলেন, 'আমরা দেখছি যে বিগত ৩০ বছরে শক্তিশালী ঝড়ের সংখ্যা ক্রমাগত ভাবে বেড়েছে'। এই প্রসঙ্গে ডঃ কারি বলেন, 'আগে যে রকমের প্রবল ঝড় লোকে জীবনে একবার দেখতে পেত, আজ সে রকমের বিধ্বংসী ঝড় এক বছরের মধ্যেই একাধিক বার হয়ে চলেছে।'

ডঃ কেরি ইমানুয়েল হলেন ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির একজন বিজ্ঞানী। তাঁর হিসাব অনুসারে গত ১৯৫৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত, ছোট বড় মিলিয়ে, সারা পৃথিবীতে মোট ৪,৮০০টি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে। ডঃ ইমানুয়েল এই সব ঝড়ের ওপর সমীক্ষা চালান এবং তার ফলাফল 'নেচার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তিনিও লক্ষ্য করেন যে, গত ৩০ বছরে পৃথিবীতে বার্ষিক মোট ঝড়ের সংখ্যা প্রায় একই আছে। কিন্তু তাদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা প্রায় ৫০ শতাংস বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ ইমানুয়েল বলেন, "বিগত ১০ বছরে উত্তর আটলান্টিকে ঝড়ের সংখ্যা কমেছে। ফলে মোট ঝড়ের সংখ্যা একই থেকেছে, কিন্তু গত ৩০ বছরে ঝড়গুলোর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। তাই বলা যায় যে, ঝড়গুলো শক্তিশালী হচ্ছে এবং তাদের স্থায়িত্বকাল বাড়ছে।"

কাটরিনা ও রিটা উপকূলের যে অঞ্চলে আঘাত করেছে তা হল আমেরিকার তেল সম্পদের একটি কেন্দ্র। বিশেষ করে রিটা যে পথে অগ্রসর হয়েছে, সেই পথে রয়েছে ৯টি তেল শোধনাগার, যা হল আমেরিকার তেল শোধন ক্ষমতার ৩৩ শতাংশ। আমেরিকার মোট উৎপাদনের ১২ শতাংশ পেট্রল এবং ২০ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস ওই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই ঝড়ে গ্যাস ও তেল শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছে তার আনুমানিক মোট পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটি ডলার। উপরন্তু মেক্সিকো উপসাগরে রয়েছে তেল তোলার প্রায় ৫০০টি রিগ। ঝড়ের জন্য এর মধ্যে ৮৭টি রিগ বন্ধ করে দিতে হয়েছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ ১৪০ কোটি ডলার বেড়েছে। এছাড়া ক্যাটরিনা নিউ অর্লিয়েন্স শহরে আছড়ে পড়ার ফলে প্রায় ১০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছে এবং ১০,০০০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

নিউ অর্লিয়েন্স শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মিসিসিপি নদী। দু-পারে কংক্রীটের দেওয়াল তুলে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ঝড়ের সময় ১ দিনের মধ্যে ১২ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ার ফলে নদীর জল বেড়ে যায় এবং কংক্রীটের দেওয়াল ভেঙে যায়। ফলে গোটা শহরটাই প্লাবিত হয়ে পড়ে। কোনও কোন জায়গায় জলের গভীরতা ৬ মিটার ছাড়িয়ে যায়। এর আগে ১৯৯২ সালে ঘূর্ণি ঝড় 'অ্যাগুরু' সব থেকে বেশি সম্পত্তিহানি (৪,৪০০ কোটি ডলার) এবং ১৯০০ সালে ঘূর্ণিঝড় 'গ্যালভেস্টন' সব থেকে বেশি জীবনহানি (৮,০০০ থেকে ১২,০০০) ঘটিয়েছিল।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা অনেকেই মনে করছেন যে, আমরা অত্যন্ত প্রলয়ঙ্কর ঝড় তুফানের এক কালখণ্ডে প্রবেশ করতে চলেছি বা প্রবেশ করেছি। তাই অদূর ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ খুব শীঘ্রই আমরা জলবায়ুর এক অভাবনীয় পরিবর্তনের সম্মুখীন হব, যখন পৃথিবীর উষ্ণায়ণের ফলে

শুরু হবে অসম্ভব শক্তিসম্পন্ন ঝড় তুফানের এক প্রলয়ঙ্কর দাপট। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমসফেরিক রিসার্চ সংস্থার জলবায়ু বিশ্লেষণ বিভাগের প্রধান ডঃ কেভিন ট্রেনবার্থ বলেন, "এ ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই যে, পৃথিবীর জলবায়ু পাল্টাচ্ছে, যার জন্য মানুষ আংশিক ভাবে দায়ী। এখানে কোনও ছোটখাটো পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে সেইসব পরিবর্তনের কথা, যার ফলাফল হবে অত্যন্ত ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর।"

বিজ্ঞানীরা আরও মনে করেন যে, পৃথিবীর উষ্ণায়ণের ফলে ভবিষ্যতে নেমে আসবে আরও অনেক রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর নিরক্ষ অঞ্চল ও মেরু অঞ্চলের তাপমাত্রার প্রভেদই আমাদের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিরক্ষ অঞ্চলের অধিক তাপশক্তি দু-ভাবে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। প্রায় অর্ধেক তাপ সমুদ্রের জলস্রোত হিসাবে এবং বাকিটা বায়ুপ্রবাহ ও ঝড় তুফানের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। কাজেই মেরু অঞ্চল বেশি উষ্ণ হয়ে গেলে এই তাপ প্রবাহের ধরণ পাল্টে যাবে। ফলে পাল্টে যাবে বর্তমান জলবায়ু।

এটা আজ প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ও আরও তিনটি গ্যাসকে একত্রে 'গ্রীণহাউস গ্যাস' বলে। প্রধানত কয়লা, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালাবার ফলেই এই গ্যাসগুলির সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রাণী জগতের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলেও এই গ্যাসগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে। যাই হোক, পৃথিবী দিনের বেলায় সূর্যের থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ গ্রহণ করে গরম হয়, এবং রাতের বেলায় শুধু অবলোহিত বিকিরণ ত্যাগ করে ঠাণ্ডা হয়। গ্রীণহাউস গ্যাসগুলো পৃথিবীর অবলোহিত বিকিরণ শোষণ করে বলে পৃথিবীর তাপ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। উপরন্তু তারা পৃথিবীতে অবলোহিত বিকিরণ শোষণ করে নিজেরা উষ্ণ হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীকেও উষ্ণ করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, ওই গ্রীণহাউস গ্যাসগুলো অনেকটা কম্বলের মতো কাজ করে পৃথিবীকে ঠাণ্ডা হয়ে বাধা দেয় এবং একেই বলে 'গ্রীণহাউসের এফেক্ট'। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং পৃথিবীর উষ্ণায়ণ (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) ঘটাচ্ছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি সমীক্ষা বলছে যে, গত ১৯৯৫ সালে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মিশেছে ৬২০ কোটি মেট্রিক টন গ্রীনহাউস গ্যাস এবং ২০০০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৭২০ কোটি মেট্রিক টন। সেই সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ৩০ শতাংশ, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৫ শতাংশ এবং মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে ১০০ শতাংশ।

বর্তমান বিশ্বে সব থেকে বেশি গ্রীণহাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে। তবে মূলত পাশ্চাত্যের ৩৪টি শিল্পোন্নত দেশ এ ব্যাপারে সব থেকে এগিয়ে। এদের দ্বারা বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে চলেছে এবং এর ফলে গত ১০০ বছরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্র ০.৬ ডিঃ সেঃ বেড়েছে তাতেই এত হৈ চৈ! তাই বলে রাখা ভাল যে, পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ৩ ডিঃ সেঃ কমলে তুষার যুগ শুরু হবে এবং গ্রীণহাউস এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্র ৩৩ডিঃ সেঃ হ্রাস পাবে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, যদি গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমণ নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তবে বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৩.৫ থেকে ৫ ডিঃ সেঃ বেড়ে যাবে।

পৃথিবী উষ্ণ হলে বাতাস উষ্ণ হবে। ফলে বাতাসের পক্ষে বেশি জলীয় বাস্প ধরে রাখা সম্ভব হবে। অর্থাৎ বাতাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণ প্রতি ১০ বছরে ১.৩ শতাংশ হারে বাড়ছে। এখানে ভয়ের ব্যাপার হল, বাতাসে জলীয় বাস্পের এই বৃদ্ধি অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক ঝড়ের জন্ম দেবে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়িয়ে সৃষ্টি করবে বন্যা। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ ট্রেনবার্থ বলেন, ‘‘ক্যাটরিনার প্রভাবে নিউ অর্লিয়ন্সে এক দিনের মধ্যে ১২ ইঞ্চি বা ৩০ সেমিঃ বৃষ্টি হয়েছিল। বাতাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণ বেশি থাকার জন্যই এত বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল।’’

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্যাটরিনা ও রিটা সামান্য নিম্নচাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মাত্র দুই দিনের মধ্যে মেক্সিকো উপসাগরে ৫ম শ্রেণীর ঝড়ের রূপান্তরিত হয়। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, মেক্সিকো উপসাগরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেন তারা এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠল? বিজ্ঞানীদের মতে, মেক্সিকো উপসাগরের অধিক উষ্ণতাই এর জন্য দায়ী। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ জুডি কারি বলেন, ‘‘উষ্ণ বাতাস সমুদ্রকেও উষ্ণ করে তোলে এবং উষ্ণ সমুদ্র বিধ্বংসী ঝড়ের জন্ম দেয়। এ বছর মেক্সিকো উপসাগরে উষ্ণতা প্রথম থেকেই বেশি ছিল এবং ওই সময় তার উষ্ণতা গড় উষ্ণতা থেকে প্রায় ৩ ডিঃ সেঃ বেশি ছিল।’’ অনেকের মতে, ওই সময় মেক্সিকো উপসাগরে একটা উষ্ণ স্রোত খুবই সক্রিয় ছিল এবং এর প্রভাবেও ঝড় শক্তিশালী হয়েছিল। কাজেই বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরা মত হল, গ্রীণহাউস এফেক্ট এবং তার ফলে পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলেই আজ ঝড়, সাইক্লোন বা হ্যারিকেন বিধ্বংসী রূপ নিচ্ছে।

কিন্তু কিছু বিজ্ঞানী আবার এসব মানতে নারাজ। ফ্লোরিডা রাজ্যের মায়ামী স্থিত ন্যাশনাল হ্যারিক্যান রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানী শ্রীমতী ক্রিশ ল্যাণ্ডসির মত হল, পৃথিবীর উষ্ণায়ণের জন্য ঝড়ের সময় বাতাসের গতিবেগ খুব সামান্যই বৃদ্ধি পায়, ১০০ বছরে

১ থেকে ৫ শতাংশ মাত্র। অর্থাৎ আজকের ঘণ্টায় ১০০ কিমি বেগের ঝড় ১০০ বছর পরে বড়জোর ১০৫ কিমি বেগের ঝড়ের পরিণত হবে। ফ্লোরিডার কি-বিসকেন-এ অবস্থিত ন্যাশনাল ওস্যানিক অ্যাণ্ড অ্যাটমসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিজ্ঞানী ডঃ স্ট্যান গোলডেনবার্গ মনে করেন, গত বছরের তুলনায় এ বছর ঝড়ের সংখ্যা বাড়েনি। তবে এত হৈচৈ-এর কারণ এ বছর ঝড় আছড়ে পড়েছে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায়। কলেরোডো স্টেট ইউনিভার্সিটি-র বিজ্ঞানী উইলিয়াম গ্রে মনে করেন, কাটরিনা ও রিটাকে যতটা ভয়ঙ্কর বলে প্রচার করা হচ্ছে, আসলে তারা অতটা ভয়ঙ্কর ছিল না। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হবার জন্যই হৈচৈ বেশি হচ্ছে। বর্তমান উপগ্রহ বিজ্ঞান উন্নত হলেও ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই অনেক সময় বাতাসের গতিবেগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের বাগবিতণ্ডা যাই হোক না কেন, পৃথিবীর উষ্ণায়ণ যে ক্রমশ তার থাবা বিস্তার করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর ফলে কানাডা, সাইবেরিয়া, আলাস্কা ইত্যাদি স্থানে শীত আসছে দেরি করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দু-সপ্তাহ আগেই বসন্ত চলে আসছে। ফলে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত প্রাণী, মাছ ও পাখীরা ক্রমেই আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে। গত ১৯৯৮ ছিল মানব ইতহাসে উষ্ণতম বছর এবং তার পরেই স্থান পেয়েছে ২০০৩ ও ২০০৪। অনেকে মনে করেন যে, অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে ২০৮০ সালের মধ্যে মেরুপ্রদেশের বরফ সম্পূর্ণ গলে যাবে। ফলে সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্ত পৃথিবীর মূল্যবান উপকূল ভূভাগ প্লাবিত হবে। মুম্বই, হংকং ও নিউইয়র্কের মতো শহর জলে প্লাবিত হবে। বাংলাদেশের মতো নীচু দেশের বেশ খানিকটা ভূভাগ জলের তলায় চলে যাবে এবং মালদ্বীপের মতো দ্বীপরাষ্ট্র লুপ্ত হয়ে যাবে।

পৃথিবীর উষ্ণায়ণের এই প্রভাবে ভারতের পক্ষে খুবই মারাত্মক হতে পারে। কারণ, এর ফলে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হবে, অনেকের মতে, তাতে মৌসুমী বায়ু দুর্বল হবার আশঙ্কা আছে। ভারতের কৃষি মৌসুমী বায়ুর ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। তাই মৌসুমী বায়ু দুর্বল হলে ভারতের কৃষি যে প্রচণ্ডভাবে মার খাবে তা বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞানীদের এইসব সাবধানবাণীকে আমরা অনেকেই সঠিক গুরুত্ব দিতে চাই না, ভাবি যে এসব অনুমান মাত্র যা কখনো বাস্তবে ঘটবে না। তাই বিপদ কতখানি গুরুতর এবং আজ থেকে কতদিন পরে তা দেখা দেবে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার প্রয়োজন আছে। গত বছর বৃটিশ সরকার 'জলবায়ুর বিপজ্জনক পরিবর্তন পরিহার' (অ্যাভোয়ডিং ডেঞ্জারাস ক্লাইমেট চেঞ্জ) বিষয়টির ওপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। ইংল্যাণ্ডের ইক্সিটার শহরের আবহাওয়া কেন্দ্রে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণের পরিষ্কার একটি

বিপজ্জনক মাত্রা ঠিক করা, যাতে করে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ২ ডিঃ সেঃ এর মধ্যে ধরে রাখা যায়। বিজ্ঞানীরা অন্যান্য গ্যাসের ফলাফলকে তুল্য পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণে রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এলেন যে, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৪০০ পিঃ পিঃ এমঃ (বা দশ লক্ষ ভাগের ৪০০ ভাগ)-এর মধ্যে থাকলে পৃথিবীর উষ্ণায়ণকে ২ ডিঃ সেঃ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে। অতঃপর সেই আলোচনা সভা ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং-এর আবহাওয়া বিভাগের প্রধান প্রোফেসর কীথ শাইন-এর ওপর দায়িত্ব দিল বর্তমানে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ হিসাব কষে বার করার।

এ বছর (২০০৬) ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহে প্রোঃ কীথ সাইন হিসাবপত্র পেশ করেন এবং তাতে দেখা যায় যে, বর্তমানে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৪২৫ পিঃ পিঃ এমঃ, অর্থাৎ বিপজ্জনক মাত্রা থেকে ২৫ পিঃ পিঃ এমঃ বেশি। প্রোফেসর সাইনের হিসাব হল, কার্বন ডাই অক্সাইড ৩৭৯ পিঃ পিঃ এমঃ, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের তুল্য কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ৪০ পিঃ পিঃ এমঃ ও ৬ পিঃ পিঃ এমঃ। প্রোফেসর সাইনের হিসাবের ফলাফল এ বিষয়ের ওপর গবেষণারত সকল বিজ্ঞানীকেই ভীত করে তুলেছে। তাদের মতে, প্রোফেসর কীথ সাইনের হিসাবে নিকাশের উপরিউক্ত ফলাফল থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমরা বিরাট রকমের এক জলবায়ু পরিবর্তনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। অনেকে মনে করেন যে, এ থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, পৃথিবীর উষ্ণায়ণের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর পরিণতিগুলো, যেমন চূড়ান্ত পরিবেশ দূষণ, খরা ও দুর্ভিক্ষ, পানীয় জলের হাহাকার ইত্যাদি এবার থেকে দেখা দিতে শুরু করবে। ওই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে লণ্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের প্রোফসর টম বার্ক বলেন, "আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আমাদের উত্তর পুরুষ ভাল আবহাওয়া কাকে বলে, তা আর জানতে পারবে না।" এ বিষয়ে বিখ্যাত আবহাওয়াবিদ জেমস্ লাভলক বলেন, "পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন আজ এমন এক জায়গায় চলে গিয়েছে যেখান থেকে তাকে আর ফেরানো সম্ভব নয়।"

বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর উষ্ণায়ণ দু-রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এক রকমের প্রতিক্রিয়া উষ্ণায়ণের বিপদকে বাড়িয়ে দেয় এবং একে বলা চলে ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া এবং অন্যটা বিপদকে কমিয়ে দেয়, তাই একে ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া বলা চলে। আগেই বলা হয়েছে যে, উষ্ণায়ণের ফলে সাগরের জল উষ্ণ হলে তা কত ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম দিতে পারে এবং ফলাফল কত মারাত্মক হতে পারে। কাজেই উষ্ণায়ণের ফলে সমুদ্রের জল উষ্ণ হওয়াকে ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া বলা চলে। অপরদিকে উষ্ণায়ণের ফলে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে আকাশে বেশি মেঘের সৃষ্টি হয়।

ফলে সূর্যকিরণ পৃথিবীকে বেশি উষ্ণ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে উঁচু পাহাড় পর্বতে বেশি তুষারপাত হয়। সাদা বরফ সূর্যকিরণকে প্রতিফলিত করে উষ্ণায়নকে প্রতিরোধ করে। তাই এইসব প্রতিক্রিয়াকে বলা চলে ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শুধু ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকেই বিপদের সম্ভাবনা থাকে এবং এই ধরণের অনেক মৃদু প্রতিক্রিয়াও অনেক সময় অতিশয় প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি করতে পারে। এই ব্যাপারটা বোঝাতে বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন যাকে বলে 'প্রজাপতি ক্রিয়া'। অর্থাৎ ব্রাজিলে কোনও একটি প্রজাপতির পাখার ঝাপট সুদূর আমেরিকায় প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করতে পারে। সাহারা মরুভূমিতে একটি প্রজাপতির পাখার ঝাপট ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবল ঝড় তুফানের সৃষ্টি করতে পারে।

এব্যাপারে আরও একটি লক্ষ্য করার বিষয় হল, পৃথিবীর উষ্ণায়ণের ফল হিসাবে যত পূর্বানুমান করা হয়, তা সবই করা হয় কম্পিউটার মডেল থেকে। সুতরাং বাস্তব পরিণতি ও পূর্বানুমানের মধ্যে বেশ ভাল রকমের ব্যবধান থেকে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার একটা পূর্বানুমানে বলেছিল যে, বর্তমান ২১শ শতাব্দীর শেষে সমুদ্রের জলস্তর বড় জোর আধ মিটার উঁচু হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে গ্রীণল্যাণ্ড ও আন্টার্কটিকার বরফ যে ভাবে গলতে শুরু করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিপদ হবে তার বহুগুণ বেশি। আমেরিকার 'নাসা'-র জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী ডঃ এরিক রিগনট ও তাঁর সহকর্মীরা বিগত কয়েক বছর ধরে এব্যাপারে অনুসন্ধান করছেন এবং তার ফলাফল এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাতে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, আগামী ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে সমুদ্রের জলের উচ্চতা ৬ মিটার বা ২০ ফুট পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে গ্রীণল্যাণ্ড হল একটি বরফেও দ্বীপ এবং এই দ্বীপের দক্ষিণের হিমবাহগুলি ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায় এবং শেষে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে যায়। প্রতি বছর সমুদ্রের জলস্তর যতটা উঁচু হচ্ছে তার ৬ ভাগের ১ ভাগের জন্য দায়ী গ্রীণল্যাণ্ডের এই সব গলে যাওয়া হিমবাহ। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাত্র ৫ বছর আগে এই হিমবাহগুলির গতিবেগ ছিল বছরে ৬ থেকে ৭ কিমি। কিন্তু বর্তমানে এই গতিবেগ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে বছরে ১৩ কিমি হয়েছে। অর্থাৎ ৫ বছর আগেও এই হিমবাহগুলো সমুদ্রের যতটা জল ঢালতো, আজ তার দ্বিগুণ জল ঢালছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ রিগনট বলেন, "গত ১৯৯৬ সালে গ্রীণল্যাণ্ড বছরে প্রায় ১০০ ঘন কিমি জল সমুদ্রে ঢালতো, কিন্তু আজ তার দ্বিগুণ জল ঢালছে।" তিনি আরও বলেন, "লস এঞ্জেলস্ শহর বছরে যত জল ব্যবহার করে, এই হিমবাহগুলি

বছরে তার ৯০ গুণ জল সমুদ্রে ঢালতো, কিন্তু গত বছরে তা বেড়ে ২২৫ গুণ হয়েছে এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে তা ৪৫০ গুণ হবে।"

গ্রীণল্যাণ্ডের প্রায় ১৬.৮ লক্ষ বর্গ কিমি বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে এবং কোথাও কোথাও এই আস্তরণ ৩ কিমি মোটা। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মাইকেল ওপেনহাইমার বলেন, "এই দ্বীপের সমস্ত বরফ গলে সমুদ্রে মিশলে সমুদ্রের জলস্তর প্রায় ৬ মিটার বা ২০ ফুট উঁচু হয়ে যাবে।" তিনি অরও বলেন, "সমুদ্রের জলস্তর ১ ফুট উঁচু হলে ১০০ ফুট উপকূল প্লাবিত হয়। তাই সমুদ্রেরজল ২০ ফুট উঁচু হলে যে প্লাবন হবে, তার কাছে ২০০৪ সালের প্লাবন হবে নস্যি।"

আন্টার্কটিকা মহাদেশের ওপর এরকরমের একটি সমীক্ষা যে চিত্র তুলে ধরেছে তা আরও ভয়াবহ। প্রকৃতপক্ষে, এই মহাদেশের বরফে সঞ্চিত রয়েছে বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ পানীয় জল এবং এর থেকে প্রতি বছর ১৫২ ঘন কিমি বরফ সমুদ্রে মিশছে। তুলনামূলক ভাবে বললে দাঁড়ায়, ওই ১৫২ ঘন কিমি বরফ থেকে যে পরিমাণ জল হয় তাতে লস এঞ্জেলস শহরের ৩৬ বছরের জলের প্রয়োজন মিটে যাবে। গত ২০০২ সালে দুটো উপগ্রহের সাহায্যে "Gravity Recovery and Climate Experiment" নামক এই সমীক্ষা শুরু হয় এবং এ বছর ৪ঠা মার্চের 'সায়েন্স' পত্রিকায় তার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এই অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, আন্টার্কটিকা মহাদেশের পশ্চিম দিকের হিমবাহগুলিতেই বেশি বরফ গলতে শুরু করে দিয়েছে। তার চেয়েও ভয়ের কথা হল, শুধু এই হিমবাহগুলি গলে গেলে যে পরিমাণ জলের সৃষ্টি হবে তাতেই সমুদ্রের জল ৬ মিটার উঁচু হয়ে যেতে পারে।

আন্টার্কটিকার পূর্বদিকের হিমবাহগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। এখানকার বরফের স্তর গড়ে ২ কিমি মোটা এবং এখানকার সব বরফ গলে গেলে সমুদ্রের জল প্রায় ৪৫ মিটার উঁচু হবে। সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, বর্তমানে সমুদ্রের জল বছরে প্রায় ০.৪ মিঃ মিঃ করে উঁচু হচ্ছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, গত ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর, ১৫৯টি দেশ থেকে আগত প্রায় ১৫০০ সরকারি প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আরও প্রায় ৩৫০০ প্রতিনিধি পরিবেশ বিষয়ে ১০ দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগ দেবার জন্য জাপানের কিয়োটো শহরে সমবেত হন। আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল পাশ্চাত্যের ৩৪টি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ যে পরিমাণ গ্রীণহাউস থেকে গ্যাস বাতাসে ছাড়ে, তাকে কমিয়ে আনা। লক্ষ্য ছিল, গত ১৯৯০ সালে যে দেশ যতটা গ্রীণহাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ত, বর্তমান মানকে তার থেকে ৭ শতাংশ কমিয়ে আনা এবং ২০০৮ থেকে ২০১২-এর মধ্যে ওই হ্রাস

ঘটানো। জাপান ঘোষণা করে যে, সে তার গ্রীণহাউস গ্যাস নির্গমণকে ১৯৯০ সালের মান থেকে ৮ শতাংশ কমিয়ে আনবে। কিন্তু ইউরোপের দেশগুলো ৭ শতাংশ কমাতে রাজি হয়। সেখানে যে সব বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মত হল, খুব অল্প খরচের দ্বারা যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা বাড়িয়ে খুব সহজেই উক্ত হ্রাস ঘটানো সম্ভব।

সেই সময় ১৫৯টি দেশের প্রতিনিধিরাই উপরিউক্ত কিয়োটো প্রোটোকল মেনে নিলেও আজ পর্যন্ত কাজ এগিয়েছে সামান্যই। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমেরিকান কংগ্রেস এখনও কিয়োটো প্রোটোকলকে সরকারি স্বীকৃতি দেয়নি। তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডেমিক্র্যাট দলের বিল ক্লিনটন, কিন্তু কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন রিপাবলিকান দলের সদস্যেরা। তাই কংগ্রেসের রিপাবলিকান সদস্যেরা কিয়োটো প্রোটোকল বাতিল করে দেন। এসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক সাংবাদিক বলেন, "এটা একটা লজ্জার কথা যে, জাপানের এই (কিয়োটো) শহরটির নাম চিরকালের জন্য ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। কারণ এখানে ১৯৯৭ সালে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তা আর কার্যে পরিণত হতে পারলো না।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে। গত বছর (২০০৫) ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে কানাডার মন্ট্রিলে বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রীদের একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিয়োটো পরবর্তী পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা। কিয়োটো চুক্তির ভবিষ্যত নিয়ে প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলে, কিন্তু তাতে তেমন কোনও ফল হয়নি। তাতে একটাই লাভ হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আর তা হল, এই মন্ট্রিল সম্মেলনে আবার আমেরিকাকে আলোচনার সভায় বসানো হয়েছে। এই সম্মেলনে প্রথাগত জ্বালানীর ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। তবে তেল, কয়লা ইত্যাদি প্রথাগত জ্বালানীকে উন্নত কারিগরি ব্যবহার করে ব্যবহার করার উপর জোর দেওয়া হয়, যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমণ কম হয়।

প্রথম দিকে বাণিজ্যিক মহল কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের ওপর কোনও রকমের বিধিনিষেধের প্রবল বিরোধী ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এটা আজ খুবই সুখবর যে, ব্যবসায়ী মহলও ধীরে ধীরে প্রদূষণ বিরোধী হয়ে উঠছে এবং সবুজ কারিগরিতে উৎসাহী হয়ে উঠছে। অনেকে মনে করেন যে, প্রথাগত ও পুনঃব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎসের কারিগরির মধ্যে বিনিয়োগের ব্যবধান কমে আসার জন্যই এই পরিবর্তন এসেছে। আরও একটু বিশদভাবে বলতে গেলে, সৌর, বায়ু ও জলশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও তেল ও কয়লা জ্বালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার মধ্যে অগে যে খরচের ব্যবধান ছিল, আজ সেই ব্যবধান অনেক কমে এসেছে।

এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, "শুধু ছোট ছোট সংস্থাগুলোই নয়, এগিয়ে এসেছে জেনারেল ইলেকট্রিক (জি ই)-এর মতো বিশাল বহুজাতিক সংস্থা।" প্রকৃতপক্ষে আজকের পৃথিবীতে জিই-ই হল বিদুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরি করার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ-সংস্থা। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা এব্যাপারে সচেতন হবে এবং প্রদূষণ হ্রাসকারী সবুজ কারিগরির ব্যবসাতে উৎসাহিত হবে। ফলে কম পরিমাণ গ্রীণহাউস গ্যাস বাতাসে মিশবে। অন্য দিকে তেলের চড়া দাম গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমণ কিছুটা হলেও কমাতে সক্ষম হয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, এটা নেহাতই একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। তাঁরা মনে করেন যে, তেলের চড়া দামের জন্য দায়ী হল তেলের চাহিদার অত্যাধিক বৃদ্ধি। এব্যাপারে সব থেকে ওপরে রয়েছে চীন। অচিরেই এই অধিক চাহিদা পূর্ণ করতে অতিরিক্ত পুঁজি বিনিয়োগ হবে। ফলে তেলের দামও কমে যাবে।

এখান বলে রাখা প্রয়োজন যে, অতি দ্রুত শিল্পায়নের ফলে চীন আজ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রীণহাউস গ্যাস নির্গমণকারী দেশে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার পরেই রয়েছে তার স্থান। সেই সঙ্গে ভারতও তালিকার ওপরের দিকে উঠছে। তাই দাবি উঠছে যে, আমেরিকার সঙ্গে চীন ও ভারতকেও বিধিবদ্ধভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমণ কমিয়ে আনতে হবে। ওই ব্যাপারে আরও একটা লক্ষণীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। জনসাধারণ ক্রমেই পরিবেশ সচেতন হয়ে ওঠার ফলে রাজনীতিকরাও ভোটের লোভে নিজেদের পরিবেশ সচেতন বলে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন। অন্য কথায়, পরিস্থিতির চাপে তারাও পরিবেশ সুরক্ষা ও পৃথিবীর উষ্ণায়ণের ব্যাপারে সরব হতে সুরু করেছেন। আমেরিকার প্রায় অর্ধেক মানুষ মনে করেন, পরিবেশ দূষণ এবং সেই কারণে জলবায়ুর এক সাঙ্ঘাতিক পরিবর্তন প্রায় আসন্ন হয়েছে এবং এক তৃতীয়াংশ মানুষ বিশ্বাস করেন পৃথিবীর উষ্ণায়ণের জন্যই কাটরিনা ও রিটার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

এদিকে চীনের সরকার ও চীনা জনগণও যে পরিবেশ দূষণ ও পৃথিবীর উষ্ণায়ণের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে তারও প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে। মাত্রাতিরিক্ত তেল ও কয়লা জ্বালানোর ওপর চীনা সরকার সম্প্রতি এক অতি কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে, যা বিশেষজ্ঞদের মতে আমেরিকার থেকেও কঠোর। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার জ্বালানীর সাশ্রয়ের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছে এবং আগামী ২০ বছরের মধ্যে দেশে ৩০টি পরিমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার-প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আরও সুখের বিষয় হল, চীনা সরকার নিজেকে কিয়োটো প্রোটোকলের একজন সদস্য করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অথচ বিশ্বের সর্বাধিক দূষণকারী দেশ আমেরিকা আজও ধীরে চল নীতি অবলম্বন করে চলেছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন,

"কি করে তাকে কাজে নামানো যায় তা বোঝা দুষ্কর। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, তারা অনিশ্চিত কোনও ভবিষ্যৎ লাভের আশায় বর্তমানে কোনও সামান্য ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়।"

আগেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বের উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তন ভারতের ক্ষেত্রে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুণায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান, ইন্সটিটিউট অফ ট্রপিকাল মেটিওরলজি (আই আই টি এম)-র বিজ্ঞানীরা বিশ্বের উষ্ণায়ণ ভারতীয় উপমহাদেশকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে এ ব্যাপার নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কম্পিউটার মডেলের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া গিয়েছে তা হল, সারা ভারতেই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে অধিক সংখ্যক আরও শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হবে। তাদের এই সব গবেষণার ফলাফল এ বছর (২০০৬) ১০ ফেব্রুয়ারির 'কারেন্ট সায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আই আই টি এম-এর ক্লাইমেটোলজি বিভাগের প্রধান ড়ঃ কে রূপকুমার বলেন, "বিশ্বের উষ্ণায়ণের ফলে ভারতের জলবায়ু খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। ঝড় বাদল, অত্যধিক গরম ও বারিপাতির ঘটনা খুব বাড়বে। বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল এবং মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার তুলনায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে বাড়বে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ঘটনা। তাছাড়া শীতের ঠিক আগে, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে দেখা দেবে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। আই আই এম টি-র বিজ্ঞানীরা পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে, মুম্বই বিশাখাপত্তনম ও কোচিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা মেপে চলেছেন। এ থেকে তাঁরা দেখেছেন যে, সমুদ্রের জল প্রতি বছর প্রায় ১ মিঃ মিঃ হারে বাড়ছে। বৃটেনের Hadley Centre for Climate Prediction-এর পরীক্ষাগারে জলবায়ু পরিবর্তনের আগাম খবর পাবার জন্য একটি কম্পিউটার মডেল তৈরি করা হয়েছে। সেই মডেল ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, সার্বিকভাবে ভারতের তাপমাত্রা ২০৭০ সালের মধ্যে ২.৫ থেকে ৫.০ ডিঃ সেঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রধানত উত্তর ভারতে এই বৃদ্ধি সর্বাধিক হবে।

বিশ্বের উষ্ণায়ণের জন্য ভারতের কৃষি যে ভীষণভাবে প্রভাবিত হবে তা আগেই বলা হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ফিলিপাইনসের লাগুন-এ অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আই আর আর আই)-এর ডিরেক্টর জেনারেল রবার্ট জিগলার মনে করেন যে, বিশ্বের উষ্ণায়ণ ভারতের ধান চাষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম ওই সময় ফিলিপাইন ভ্রমণে

গিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে রবার্ট জিগলার আব্দুল কালামকে বলেন, "বিশ্বের উষ্ণায়ণের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভারতে ধান চাষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।" রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করতে তিনি আরও বলেন, "এ ব্যাপারে কি কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক গবেষণার জন্য আমরা অতি শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করব। উষ্ণায়ণের কুপ্রভাব ধানের চারার ক্ষতি করতে পারে, সে ব্যাপরে আমরা সদাসর্বদা নজর রেখে চলেছি।"

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ভারতকে কৃষির ব্যাপারে অচিরেই বিরাট সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। (১) প্রথম কৃষি জমির সঙ্কোচ। আজ ভারতে প্রায় ১৭ কোটি হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয় এবং ২০২০ সালের মধ্যে তা কমে ১০ কোটি হেক্টর হবে। (২) দ্বিতীয় সমস্যা হল সেচের জলের অভাব এবং (৩) তৃতীয় সমস্যা হল কৃষিকাজ করার লোকের সংখ্যা হ্রাস। তাই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে হলে অল্প জলে অধিক ফলনশীল ধান ও গমের প্রজাতি তৈরি করতে হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভারতের অর্থানুকূল্যে ১৯৬০ সালে আই আর আর আই স্থাপিত হয় এবং বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথন ছয় বছর (১৯৮২-১৯৮৮) এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন। বর্তমানে ভারত প্রতি বছর এই সংস্থার জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার খরচ করে। এই সংস্থার গবেষণার কাজে ভারত আজ পর্যন্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার খরচ করেছে।

যাই হোক, সুখের কথা হল, সাধারণ মানুষও আজ গ্রীণহাউস এফেক্ট ও বিশ্বের উষ্ণায়ণের বিষয়ে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করার ব্যাপারে এগিয়ে আসছে এবং উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। জনতার চাপে আমেরিকার প্রায় ২৪টা রাজ্যের সরকারকে গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমণ হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ণ করতে হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক বা ক্যালিফোর্ণিয়ার মতো সমৃদ্ধ রাজ্যও। জনতার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে জেনারেল ইলেকট্রিক সহ বেশ কয়েক ডজন আমেরিকান কোম্পানীকে গ্রীণহাউস গ্যাসের নির্গমণের মাত্রা কমাতে হয়েছে। এসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আমেরিকার ইভাঞ্জেলিকাল ক্রিশ্চিয়ান সমাজের নেতা শ্রী বিলি গ্রাহাম বলেন, "পৃথিবীর কর্তৃত্ব গড মানুষের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাই মানুষের ওপরই দায়িত্ব এসে পড়েছে পরিবেশকে রক্ষা করার।" কিন্তু যে কেউ বাইবেলের দু-এক পৃষ্ঠা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে, বাইবেলের গড পরিবেশ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নন এবং তাই বাইবেলে পরিবেশ সুরক্ষার ব্যাপারে কোনও কথাবার্তা নেই। সেই কারণেই ইউরোপের বর্বরদের পক্ষে পৃথিবীর পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে মনুষ্যবাসের

অনুপযুক্ত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। এব্যাপারেও কোনও সন্দেহ নেই যে, বাইবেলের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই ওই বর্বরের দল এই সব দানবীয় কাজ করেছে এবং করছে।

বাইবেলের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই যে কোনও পাঠক বুঝতে পারবেন যে, বাইবেলের গড কি রকম বর্বর ও পরিবেশ ও পরিবেশ সম্পর্কে কতখানি অজ্ঞ। প্রথম অধ্যায় জেনেসিস-এর কয়েক পৃষ্ঠা পড়লেই দেখা যাবে গড আদমকে (সংস্কৃত আদিম থেকে উৎপন্ন) আদেশ করছেন, "পৃথিবীতে যাও, বংশ বৃদ্ধি করে সংখ্যা বাড়াও, পৃথিবীকে দখল কর ও তার ওপর প্রভুত্ব কর। জলের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটিতে চরে বেড়ানো সব প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব কর। ...পৃথিবীতে যত ফল ও বীজ ধারণকারী গাছপালা আছে, সব আমি তোমাকে দিলাম। এরা সবাই তোমার খাদ্য হবে। ...সমস্ত সবুজ গাছপালা তোমার খাদ্য হবে" (জেনেসিস - ১/২৮-৩০)। তারপর, মহাপ্লাবনের পরে, নোয়াকে পিরবেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস করার অধিকার দিয়ে গড বলছেন, "পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, জলের মাছ, আকাশের পাখী, ডাঙার সমস্ত জন্তুকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম এবং সবার ওপর তোমার ভয় বর্ষিত হবে। ...আগে আমি তোমাকে শুধু সবুজ গাছপালা দিয়েছিলাম, এখন সব কিছুই তোমার হাতে তুলে দিলাম" (জেনেসিস-৯/২-৩)।

কিন্তু যুগ যুগ আগে পণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের দ্রষ্টা মুনি ঋষিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের সামনে ইন্দ্রিয় সুখের পথ দেখালে অচিরেই তারা পৃথিবীকে লুণ্ঠন করে নিজেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। তাই তাঁরা মানুষকে লালসা চরিতার্থতার কথা বলেনি। পক্ষান্তরে তাঁরা মানুষকে বলেছেন, প্রথম প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করার কথা এবং দ্বিতীয়ত, ত্যাগ ও আত্মসংযমের কথা। মানুষকে শিক্ষা দিতে তাঁরা বলে গিয়েছেন, **"প্রকৃতি হল সকলের মা, তাই তাঁকে কোনওভাবেই আঘাত করা যাবে না, আহত করা যাবে না। মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মা প্রকৃতিকে শুধু দোহন করবে, কিন্তু তাঁকে কখনও লুণ্ঠন করবে না। মৌমাছি যেমন ফুলের কোনও ক্ষতি না করে তার থেকে মধু আহরণ করে, মানুষও সেইরকম মা প্রকৃতি থেকে তার খাদ্য আহরণ করবে। ...মা প্রকৃতিকে দেবতারাও সদাসর্বদা রক্ষা করেন। মা প্রকৃতি আমাদর জন্য মধু উৎপন্ন করুন। ...একজন পুত্রের কাছে মা যেমন সর্বদা সুরক্ষণীয়, মা প্রকৃতিও আমাদের কাছে তেমনই সুরক্ষণীয়া। হে মাতা ও পরিত্রাতা পৃথিবী, আমরা তোমার শরীরে খননাদি করে যে আঘাত করি, সে সব যেন অতি সত্বর নিরাময় হয়।"** (অথর্ববেদ—১২শ অধ্যায়)।

এটা খুবই সুখের কথা যে, অতি সম্প্রতি পাশ্চাত্যের বন্ধুরাও প্রকৃতিকে রক্ষা করার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। এতকাল নিষ্ঠার সঙ্গে ভোগবাদের মধ্যে দিয়ে

ভোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তাঁরা ত্যাগ ও আত্মসংযমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করছেন। তাই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পিটার বিটোসেক বলেন, "একটা নতুন ভাবধারা অবশ্যই জন্ম নেবে, যা মানুষকে বোঝাবে যে, মানুষের অস্তিত্ব প্রকৃতির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রকৃতির অস্তিত্ব মানুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। ...পরিবর্তন অবশ্যই আসবে, কারণ প্রকৃতি ও জীব জগৎ থেকে বিপদ সঙ্কেতগুলো ক্রমেই ভয়ঙ্কর থেকে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ...পরিবর্তন তখন আসবে যখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন তার উত্তর পুরুষের প্রাণ ধারণাকেই বিপজ্জনক এবং প্রায় অসম্ভব করে তুলবে।" আমেরিকার প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি শ্রী আল গোরে বলেন, "প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি এবং যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের একান্ত অপরিহার্য হিসাবে গ্রহণ করি, প্রকৃতির দান হিসাবে তাদের প্রতি সম্ভ্রম জাগানো মধ্যে দিয়ে একটা নতুন ভাবধারা জন্ম নেবে।"

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতি বা বৈদিক হিন্দু সংস্কৃতিই পারে বিপন্ন এই মানব জাতিকে রক্ষা করতে। একমাত্র হিন্দুর সংস্কৃত গ্রন্থেই মানবজাতির পরিত্রাণের পথনির্দেশ আছে।

উষ্ণতর পৃথিবী ও কিয়োটা সম্মেলন

গত ১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭, পৃথিবীর ১৫৯টি দেশের প্রায় ১৫০০ সরকারী প্রতিনিধি, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে ৩,৫০০ প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার তরফ থেকে আরও ৩,৫০০ সাংবাদিক জাপানের কিয়োটো শহরে সম্মিলিত হয়েছিল এই আশা নিয়ে যে, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা যে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে তার প্রতিকারের নিমিত্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া যায় কি না। দশদিন ধরে এই সম্মেলন চলার কথা ছিল। কিন্তু পূর্বঘোষিত দশ দিনের মধ্যে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পারার জন্য একদিন বাড়িয়ে ১১ ডিসেম্বর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রথম বিশ্ব সম্মেলন হয় পাঁচ বছর আগে, ১৯৯২ সালে, ব্রাজিলের রিওডি জেনেরো শহরে। ঐ রিও-সম্মেলনে যে সব দেশ যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে তার কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা সমীক্ষা করাও কিয়োটো সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল।

কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ও আরও তিনটি গ্যাসকে একত্রে গ্রীন হাউস গ্যাস বলা হলেও এর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণই বাতাসে সর্বাপেক্ষা বেশী। কয়লা, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানোর ফলে এই গ্যাসগুলোর সৃষ্টি হয়। বাতাসে মিশে গিয়ে এরা পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সূর্য থেকে আলো ও তাপ যখন পৃথিখবীতে আসে তখন এরা কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। কিন্তু সূর্য ডুবে গেলে পৃথিবী যখন সেই তাপ মহাকাশে বিকিরণ করতে শুরু করে তখন এই গ্যাসগুলো তাকে বাধা দেয় এবং একটা কম্বলের মত কাজ করে। ফলেপৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যায়, দিন ও রাত্রের তাপমাত্রার ব্যবধান কমে যায়।

বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুর পরিবর্তন তো ঘটবেই, তা ছাড়া আরও অনেক রকম বিপর্যয় ঘটবে। প্রধানতঃ মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে এবং সমুদ্রের গড় উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকূলবর্তী ভূভাগ সমুদ্রের জলে ডুবে যাবে। মুম্বাই, নিউইয়র্ক, হংকং-এর মত সমুদ্র তীরবর্তী শহরগুলো প্লাবিত হবে। বাংলাদেশের বেশ খানিকটা ভূভাগ জলেরতলায় চলে যাবে এবং মালদ্বীপের মত অনেক দ্বীপরাষ্ট্র চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে সৃষ্টি

হবে প্রলয়কর ঘূর্ণি ঝড়, যা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, জাপান ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর উপর প্রবল বেগে আছড়ে পড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রধানতঃ যা ঘটবে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন তা হল, আফ্রিকা মহাদেশে চলতে থাকবে বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত খরা এবং চীন, ভারত ইত্যাদি এশিয়ার দেশগুলোতে চলতে থাকবে মুষলধারে বর্ষণ ও বন্যা। ফলে সারা পৃথিবীতেই কৃষির সমূহ ক্ষতি হবে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার "লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরী"-র বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন স্যান্টার বলেন, "পৃথিবীর বর্তমান জলবায়ু যা সংকেত দিচ্ছে তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটবে।"বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর কার্যকরী সভাপতি বলেন, "পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ব্যাপারটাকে অবজ্ঞা করার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।" এটা সহজেই অনুমান করা চলে যে, যে কৃষি আজ ৬০০ কোটি বিশ্ববাসীর পেট ভরাচ্ছে এবং প্রতি বছর আরও ৮ কোটি নবাগতের মুখে অন্ন যোগাচ্ছে, সেই কৃষির বিপর্যয় কতটা ভয়াবহ হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে বহু কোটি মানুষ অনাহার ও অপুষ্টিতে প্রাণ হারাবে।

বিগত ১৯৯৫ সালে মোট ৬২০ কোটি মেট্রিক টন গ্রীনহাউস গ্যাস পৃথিবীর বাতাসে ছাড়া হয়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে যে আগামী ২০০০ সালে বাৎসরিক ৭২৫ কোটি মেট্রিক টন ঐ গ্যাস বাতাশে মিশবে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, বর্তমান সভ্যতা তেল ও কয়লা জ্বালিয়ে প্রতি বছর এই বিশাল পরিমাণ দূষিত গ্যাস বাতাসে ছেড়ে পরিবেশকে কলুষিত করে চলেছে। বিজ্ঞানীদের হিসাব মত ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে, শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে, আজ পর্যন্ত বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ৩০ শতাংশে, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৬ শতাংশ এবং মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে ১০০ শতাংশ। পাশ্চাত্যের ৩৪টি শিল্পোন্নত দেশই মোট গ্রীনহাউস গ্যাসের ৭০ শতাংশেরও বেশী বাতাসে ছাড়ছে এবং এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকলের উপরে। সে একাই ২২ শতাংশ গ্রীনহাউস গ্যাসের জন্য দায়ী। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই চীনের স্থান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটা সমীক্ষায় বলা হয়েছে গ্রীনহাউস গ্যাসের জন্য গত ১০০ বছরে পৃথিবীর উষ্ণতা ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর জন্য উপরোক্ত ৩৪টি দেশই মূলতঃ দায়ী। মাত্র ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি অনেকের কাছেই নগণ্য মনে হতে পারে। তাই বলে রাখা দরকার যে, তাপমাত্র ৩ ডিগ্রি কমলে তুষার যুগ শুরু হবে এবং বাতাসে কোন গ্রীনহাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে।

গত ১৯৮৭ সালে আমেরিকার গাডার্ড ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী জেমস্ হ্যানসেন যখন বলেছিলেন যে, পৃথিবী উষ্ণ হতে শুরু করেছে তখন কেউই তেমন আমল দেয়নি বরং হ্যানসেনকে উপহাস করেছে, কিন্তু বর্তমানে এই উষ্ণতা বৃদ্ধি বেশ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

১৯৯৫ সাল মানব ইতিহাসের উষ্ণতম বছর বলে নথিভুক্ত হয়েছে এবং উত্তর গোলার্ধের শীতল দেশগুলোতে বসন্ত নির্দিষ্ট সময়ের এক সপ্তাহ আগেই এসে যাচ্ছে। যে সমস্ত মাছ, পাখী ও প্রাণী ঠাণ্ডা আবহাওয়া পছন্দ করে, তারা দলে দলে আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবার ফলে গত ২০ বছরে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ১০ শতাংশ বেড়েছে যা, বিজ্ঞানীদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘ এই সতর্কবাণী দিয়েছে যে, বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাস ছাড়াকে নিয়ন্ত্রিত না করলে ২১শ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর উষ্ণতা ৩.৫ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে যা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপি এক বিশাল বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে।

১৯৯২ সালের রিও সম্মেলনে উপরোক্ত ৩৪টি শিল্পোন্নত দেশের কাছে এই মানবিক আবেদন রাখা হয়েছিল যে, তারা যেন নিজ নিজ দেশের গ্রীনহাউস গ্যাস পরিত্যাগের পরিমাণ ৫ বছরের মধ্যে ১৯৯০ সালের পরিমাণে নামিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন দেশই এ ব্যাপারে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। তাই বর্তমান কিয়োটো সম্মেলন ঐ ৩৪টি দেশের দ্বারা পরিত্যক্ত গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাধ্যতামূলকভাবে কমাবার দাবী রাখে। সভা এই প্রস্তাব পেশ করে যে, আমেরিকা সহ ঐ ৩৪টি দেশকে তাদের নিঃসৃত গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ ১৯৯০ সালের পরিমাণ থেকেও আরও ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে এবং তা আগামী ৫ বছরের মধ্যেই করতে হবে। কিন্তু আমেরিকার প্রতিনিধিরা এই দাবী তোলে যে ঐ ৩৪টি দেশের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলোকেও যুক্ত করতে হবে, অন্যথায় কোন রকম চুক্তিপত্রে তাঁরা স্বাক্ষর করবেন না। বিশেষ করে চীনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

অপর দিকে উন্নতিশীল দেশগুলো এই মত প্রকাশ করতে থাকে যে, এটা পাশ্চাত্য দেশগুলোর একটা কৌশল মাত্র, যার দ্বারা তারা উন্নতিশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতিকে ব্যাহত করতে চাইছে। তাই এ ব্যাপারে কোন রকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে যেতে অস্বীকার করে চীনা প্রতিনিধি চেন ইয়াও কঙ বলেন, "যতক্ষণ না চীন তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে, তত দিন গ্রীনহাউস গ্যাস সম্বন্ধীয় কোন রকম দায় দায়িত্বের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো চীনা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।" ইয়াও কঙ আরও বলেন, "পাশ্চাত্য দেশগুলোর দূরদৃষ্টির অভাবই আজ সারা বিশ্ববাসীকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ সারা বিশ্ববাসীকে করতে হচ্ছে।"

যাই হোক, প্রচণ্ড দরকষাকষি, কলহ ও বাদানুবাদের পর ১১ ডিসেম্বর একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়ছে। ঐ সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা ও জাপান তাদের গ্রীনহাউস গ্যাস বর্জনের পরিমাণ ১৯৯০ সালের পরিমাণ থেকে ৭ শতাংশ কমাবে এবং ৮ শতাংশ কমাবে ইয়োরোপের দেশগুলো। আরও বলা হয়েছে যে; ২০০৮ থেকে ২০১২

সালের মধ্যে উপরিউক্ত মাত্রায় কমিয়ে আনতে হবে। উপস্থিত সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরাই ঐ চুক্তিতে তাদের সহমত ব্যক্ত করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন উপরোক্ত কিয়োটো চুক্তিকে "বিশাল প্রথম পদক্ষেপ" বলে বর্ণনা করেন এবং বলেন, "আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে এত দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।" আমেরিকার অভিজ্ঞ মহলের অভিমত হল এই যে, একমাত্র জ্বালানী সাশ্রয়কারী নতুন নতুন কারিগরির উদ্ভাবনের দ্বারাই আমেরিকার পক্ষে উপরোক্ত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে। তাই ক্লিনটন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সরকার বছরে ১০০ কোটি ডলার ঐ সব গবেষণার পিছনে খরচ করবে। অপর দিকে আমেরিকান কংগ্রেস কিয়োটো চুক্তিকে নিন্দা করতে শুরু করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে কংগ্রেস ঐ চুক্তিকে মান্যতা দেবে না। এ ব্যাপারে স্মরণ করা উচিত হবে যে, রাষ্ট্রপতি ক্লিনটন ডেমোক্র্যাট দলের লোক কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস ও সেনেটে রিপাব্লিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। জনৈক রিপাব্লিকান সেনেটর বলেন, "যদি রাষ্ট্রপতি ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তাহলে আমরা চুক্তিকে কবর দেব।" তবে এটাও সত্য যে, যদি রিপাব্লিকানরা কিয়োটো চুক্তিকে অনুমোদন না করেন তবে তাঁরা বিশ্ববাসীর দ্বারা নিন্দিত হবেন।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু উপরোক্ত চুক্তিতে মোটেই সন্তুষ্ট নন। তাদের মতে উক্ত চুক্তি পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির ব্যাপারে খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হবে। তাদের মতে, কোন চুক্তি না করলে ২০২০ সালে বাৎসরিক গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ হবে ৮৭০ কোটি মেট্রিক টন এবং কিয়োটা চুক্তির ফলে তা সামান্য কমে হবে ৭৯০ কোটি মেট্রিক টন। তাঁরা মনে করেন যে, জ্বালানী ব্যবহারের নিয়ম কানুন সামান্য কঠোর করে আমেরিকার পক্ষে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ এখনই ৩০ শতাংশ কমিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু তেল কোম্পানীগুলোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মার্কিন সরকার তা করছে না। যাই হোক, আমরা এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারি যে, "কোন চুক্তি না হওয়ার চাইতে একটা দুর্বল চুক্তি হওয়াও ভাল"।

পরিবেশ সংরক্ষণ ঃ নতুন ভাবধারার সন্ধানে বিশ্ব

অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণী পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাতাস থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে আমরা বেঁচে আছি, তা এল কোথা থেকে? বিজ্ঞনীদের বিশ্বাস যে, এককালে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা অনেক বেশি ছিল এবং সেই সব আগ্নেয়গিরি থেকে যেসব গ্যাস নির্গত হয়েছিল তাই ক্রমাগত জমা হয়ে আজকের বায়ুমন্ডলে সৃষ্টি হয়েছে। এইসব গ্যাসের প্রধান উপকরণ ছিল মিথেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ইত্যাদি গ্যাস, যার কোনটাই প্রাণধারণের সহায়ক নয়। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যে অক্সিজেন ছাড়া এক মুহূর্তও প্রাণধারণ করা সম্ভব নয়, বাতাসে সেই মুক্ত অক্সিজেন এল কোথা থেকে? অনেকেরই হয়তো জানা নেই, মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী জগতের পক্ষে প্রাণ ধারণের সেই একান্ত জরুরি উপাদান, বাতাসের মুক্ত অক্সিজেন-রূপ অমৃত উদ্ভিত জগতেরই দান।

উদ্ভিদরাও জীবন ধারণের জন্য বাতাস থেকে মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় উদ্ভিদরা গ্রহণকরে, তার থেকে সামান্য কিছুটা বেশি অক্সিজেন বাতাসে ছেড়ে দেয়। এই সামান্য পরিমাণ বাড়তি অক্সিজেনই বিগত কোটি কোটি বছর ধরে জমতে জমতে আজকের বাতাসে মুক্ত অক্সিজেনের ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। আর সেই অক্সিজেন গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে আছি। এর থেকে এটাই পরিস্কার হচ্ছে যে, উদ্ভিদ বা গাছপালা না থাকলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হত না।

শুধু তাই নয়, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সময় উদ্ভিদরা যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে, তাই দিয়ে তারা খাবার তৈরী করে। প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল দিয়ে তারা গ্লুকোজ তৈরি করে। পরে সেই গ্লুকোজ থেকে সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ ইত্যাদি শর্করা ও কার্বোহাইড্রেট তৈরী করে, যা আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। প্রাণীর এই খাদ্য তৈরী করার ক্ষমতা নেই। উদ্ভিদরাই আমাদের জন্য নানা রকমের ফল, তরিতরকারি, ধান, গম ইত্যাদি শস্য তৈরী করে চলেছে, যা খেয়ে আমরা বেঁচে আছি।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, গাছপালা বা উদ্ভিদের ওপর আমরা দুভাবে নির্ভরশীল। প্রথমত, তাদের তৈরী খাদ্য গ্রহণ করে আমরা আমাদের শরীরের পুষ্টি ঘটাচ্ছি। দ্বিতীয়ত, তাদের তৈরী মুক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে আমরা প্রাণধারণ করছি। অর্থাৎ উদ্ভিদের ওপর আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে উদ্ভিদরা আমাদের ওপর মোটেও নির্ভরশীল নয়। আমরা না থাকলে

গাছপালার কোন অসুবিধা হবে না। শুধু তাই নয়, অসুখ বিসুখ হলে আমরা যে ওষুধপত্র খাই তার বেশির ভাগই গাছপালা থেকে তৈরী হয়। বিশেষ করে আমাদের নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি বা আয়ুর্বেদের সমস্ত ওষুধই গাছপালা থেকে তৈরী হয়।

কিন্তু মানুষ এতই অকৃতজ্ঞ যে গাছপালার এই উপকার সে মনে রাখে না। দুর্মদ লোভের দ্বারা তাড়িত হয়ে সে নির্মম ভাবে গাছপালা কেটে বনজঙ্গল সাফ করে ফেলছে। প্রাণদায়ী এইসব গাছপালা কেটে মানুষ যে তার নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে তা বলাই বাহুল্য।

পৃথিবীতে যত বনাঞ্চল আছে তার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ (২৩ শতাংশ) রয়েছে রাশিয়ায়। প্রধানত সাইবেরিয়ার সরলবর্গীয় বনাঞ্চলে। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ বনাঞ্চলগুলো হল ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকা, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, ইন্দানেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশের নিরক্ষীয় বনাঞ্চল এবং আলাস্কা ও পশ্চিম কানাডার বিস্তীর্ণ সরলবর্গীয় বৃক্ষের চিরহরিৎ বনাঞ্চল। কাঠ বিক্রি করে সহজে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে মানুষ এই সব বনাঞ্চল অতি দ্রুত কেটে সাফ করে ফেলছে। এত নির্মমভাবে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে যে, মনে হবে মানুষ যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। লোভ বুঝি তাকে উন্মত্ত করে তুলেছে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সাইবেরিয়া, উত্তর ইউরোপ ও কানাডার সরল বর্গীয় বনাঞ্চল এবং আমাজন অববাহিকার নিরক্ষীয় বনাঞ্চল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলোর অধীন, যা পৃথিবীর সমগ্র বনাঞ্চলের প্রায় ৭০ শতাংশ। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তিই হল ভোগবাদ এবং প্রকৃতিকে সংরক্ষণের কোন কথা তাদের শাস্ত্রে অনুপস্থিত। খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে এরা যাযাবর ইহুদীদের বর্বর পশুপালক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে, যার মূল কথাই হল প্রাকৃতিকে নির্মমভাবে শুধু লুণ্ঠন করে যাও।

বাইবেলের গড আদিম মানব আদমকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে বলেছেন, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. ...I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food... I give you every green plant for food." (Genesis-1.28-30)। এরপর মহাপ্লাবন শেষ হলে নোয়াকে নির্বিচারে সব কিছু হত্যা করার অধিকার দিয়ে গড বললেন, "The fear and dread of you will fall upon all the beasts of the earth and all the birds of the air, upon every creature that moves along the ground and upon all the fish of the sea, they are given unto your hand... Just as I gave you the green plants, now I give you everything" (ibid–9/2-3)।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সব বর্বর তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্যের বর্বরদের পক্ষে প্রকৃতির ওপর কতখানি বর্বরতার অনুষ্ঠান করা সম্ভব। এইসব বর্বরের দল প্রকৃতিকে নিরন্তর নির্মমভাবে লুণ্ঠন করে আজ তাকে ধ্বংসের কাঠগোড়ায় এনে হাজির করেছে। পৃথিবীকে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী করে তুলেছে। এক কালে এইসব বর্বরের দল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে জংলী বলে গালি দিত। টিটকারী দিয়ে বলত, এরা অসভ্য, কারণ এরা গাছ পুজো করে, পাথর পূজা করে। আর আমরা সভ্য, কারণ আমরা গাছ পূজা করি না (শুধু কেটে সাফ করি)। আমরা সভ্য, কারণ আমরা শুধু ভোগ বুঝি, সংরক্ষণ বুঝি না।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এইসব বর্বরদের ভোগবাদের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞানের নামে, উন্নতির নামে ১৯শ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু হয়েছে প্রকৃতির ওপর নগ্ন আক্রমণ ও নির্মম লুণ্ঠন। কয়লা, তেল ইত্যাদি জ্বালানি, যা ভূগর্ভে সঞ্চিত হতে বিগত কোটি কোটি বছর লেগেছে, মাত্র ২০০ বছরের মধ্যে সেইসব পার্থিব সম্পদ জ্বালিয়ে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। যান্ত্রিক উপায়ে নির্বিচারে হত্যা করে বহু প্রজাতির মাছ ও বন্য পশু পাখিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে। এইসব জঘন্য কাজের জন্য ঐ সব বর্বরদের মধ্যে অনুতাপের লেশমাত্র নেই। কারণ, অনেক আগেই স্বয়ং গড এইসব দানবীয় কাজের ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন। তাই গাছ পূজার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি প্রেম ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রেরণা এই বর্বরের দল বুঝবে কেমন করে?

যাই হোক, বিজ্ঞানের দ্বারা সঞ্জীবিত পাশ্চাত্যের উন্মত্ত ভোগবাদ দুই ভাবে প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করছে। প্রথমত, প্রতিদিন কোটি কোটি টন তেল, কয়লা জ্বালিয়ে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করছে। দ্বিতীয়ত, মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু অন্নদাতা ও প্রাণদাতা গাছপালা, যারা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন তৈরী করে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা হ্রাস করে, তাদের নির্বিচারে কেটে পরিবেশকে বিষময় করে তুলছে।

গাছ কেটে বন জঙ্গল উজাড় করে কাঁচা টাকা রোজগারের ব্যপারে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলোর খুবই বদনাম ছিল। সেই ধারা আজকের গণতান্ত্রিক রাশিয়ায় আজও বজায় আছে। আজকের রুশ সরকারেরও যখনই কাঁচা টাকার প্রয়োজন হয়, তখনই সে জঙ্গল কেটে টাকা রোজগারের সহজতম পন্থা বেছে নেয়।

দু-একটি গাছ কাটা, আর হাজার হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল কেটে সাফ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এই কাজের জন্য আমেরিকা, জাপান, কোরিয়া ও ইউরোপের দেশগুলোতে বিশাল বিশাল কাছকাটার কোম্পানী আছে। এগুলোকে সাধারণভাবে 'লগিং' (logging) কোম্পানী বলে। ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সুহার্তোর আত্মীয় স্বজন ও চ্যালা চামুণ্ডাদেরও অনেক লগিং কোম্পানি আছে।

এই কোম্পানীগুলো উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি দ্রুত গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করার ক্ষমতা রাখে। বিগত ১৯৯৬ সালে রাশিয়ার অর্থনীতি যখন খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ে, তখন

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়েলেৎসিন পশ্চিম সাইবেরিয়ার বিশাল এক বনাঞ্চল এই সব লগিং কোম্পানীগুলোকে ইজারা দিয়ে দেয়। তারপর শুরু হয় গাছ কাটার এক দানবীয় মহোৎসব। স্বয়ংক্রিয় করাতের ঘড়ঘড় আওয়াজে সমগ্র বনভূমি কেঁপে ওঠে। মাত্র ২-৩ মাসের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল শুষ্ক বন্ধ্যা ভূমিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশের পরিবেশবিদ ও পরিবেশ দূষণ দূরীকরণের বহু বেসরকারি সংস্থা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু রুশ সরকার এতে কর্ণপাত না করে গাছ কাটার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট (ডব্লিউ আর আই) নামে একটা বেসরকারি প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থা আছে। ওই সংস্থা গাছ কাটার বিরুদ্ধে এবং বন জঙ্গল সংরক্ষণের সপক্ষে প্রচার চালায়। তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং জনমত গঠন করে। বিগত ১৯৯৭ সালে এই সংস্থার বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয় যে, পৃথিবীর সাবেক বনাঞ্চলের শতকরা প্রায় ৬০ শতাংশ ইতিমধ্যে কেটে উজাড় করে ফেলা হয়েছে। কয়েক বছর আগে কানাডার সরকার পশ্চিম কানাডার বনাঞ্চলের কিছু অংশ কেটে ফেলার পরিকল্পনা করে। কিন্তু উপরিউক্ত ডব্লিউ আর আই ও অন্যান্য প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থার প্রবল বাধাদানের ফলে কানাডা সরকারকে শেষ পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।

জাতিসঙ্ঘের অন্তর্গত ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফ এ ও) একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্বে বনাঞ্চল ধ্বংসের এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরে। ওই রিপোর্টে বলা হয় যে, কানাডা, রাশিয়া ও উত্তর ইউরোপের দেশগুলোর সরলবর্গীয় অরণ্য যে কেটে ফেলা হচ্ছে তা সর্বজনবিদিত। এছাড়া নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনাঞ্চলও খুব দ্রুত বেগে কেটে ফেলা হচ্ছে। রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রতি বছর প্রায় ১,২৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার নিরক্ষীয় বনাঞ্চল হয় কেটে সাফ করা হচ্ছে, নয় তো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এই সংস্থা তার নিজস্ব উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত বনাঞ্চলের ওপর নজর রাখে। উপগ্রহের পাঠানো সেই সব ছবি থেকে ধরা পড়েছে যে, প্রতি বছর প্রায় ২১,০০০ বর্গ কিলোমিটার হারে ব্রাজিলের নিরক্ষীয় বনাঞ্চল কেটে ফেলা হচ্ছে।

সমগ্র ইউরোপে বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা প্রায় ৩০টা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সব বনাঞ্চলের গাছ নানা রকম অসুখ বিসুখে মারা যাচ্ছে। এখানকার বাতাসে দূষণের মাত্রা খুব বেশি। কল-কারখানার ধোঁয়া ও মোটর গাড়ির ধোঁয়া প্রতিনিয়ত বাতাসে মিশছে। বৃষ্টি হলে এইসব বিষাক্ত ধোঁয়া বৃষ্টির জলে মিশে নানা রকম অ্যাসিডের সৃষ্টি করে। এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে সেখানকার গাছপালা অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে। গত ১৯৯৫ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন এবং ইউ এন কমিশন ফর ইউরোপ যৌথভাবে এক রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে বলা হয় যে, ইউরোপের প্রতি চারটি গাছের মধ্যে একটি এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, কল-কারখানার

ধোঁয়ার মধ্যেকার নাইট্রোজেন-অক্সাইড ও সালফার অক্সাইড এই অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী এবং বর্তমানে চেক রিপাবলিকের সমগ্র বনাঞ্চল এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে মৃত্যুর দিন গুণছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, গাছপালা অক্সিজেন তৈরী করে এবং ফলমূল সৃষ্টি করে মানুষ সহ সমগ্র প্রাণীকূলকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাছাড়াও বিশ্বের প্রায় ৫ কোটি বনবাসী মানুষ এবং বহু প্রজাতির বন্য প্রাণীর আশ্রয় এই বনাঞ্চল। উপরন্তু বনাঞ্চল বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে জলবায়ু ও ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আফসোসের কথা হল এই যে, বিগত ৫০ বছরে বিশ্বের প্রায় ৫০ শতাংশ বনাঞ্চল মানুষ কেটে সাফ করে ফেলেছে। শহরায়ণের প্রয়োজনে ও জনসংখ্যার চাপে পৃথিবীর প্রায় ৭৬টি দেশের সমগ্র বনাঞ্চল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এবং ভারত সহ ১১ দেশের বনাঞ্চলও নিঃশেষিত হবার মুখে। সাবেক বনাঞ্চলের মাত্র ৫ শতাংশই এইসব দেশগুলোতে অবশিষ্ট রয়েছে।

পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৬০০ কোটি, যার অর্ধেক বা প্রায় ৩০০ কোটি এশিয়ায় বাস করে। বর্তমানে এশিয়ার এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী মানসিকতার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পাশ্চাত্যের লোকেদের মত প্রাচুর্যের জীবন যাপন করার আকাঙ্ক্ষা আজ এশিয়ার মানুষের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। ফল স্বরূপ এশিয়াতেও শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের ঢঙে ব্যাপক শিল্পায়ন। ফলে এশিয়ার পরিবেশও দ্রুত অবনতির পথে চলেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, অতি দ্রুত শিল্পায়নের কারণে এশিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলোতে কল-কারখানার বিষাক্ত ও ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। বিগত ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে এই বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ থাইল্যাণ্ডে বেড়েছে ১২ গুণ, ফিলিপাইনে ৮ গুণ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৫ গুণ। ফলে এশিয়ার হ্রদ, নদী ও শহরগুলি অতি দ্রুত দূষিত হয়ে পড়ছে। রিপোর্টে বলা হয় যে, বর্তমানে পৃথিবীর সর্বাধিক দূষিত ১৫টি শহরের মধ্যে ১৩টি এশিয়ায় অবস্থিত।

ম্যানিলায় অবস্থিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এর একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয় যে, বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা দূষিত অঞ্চল হল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, যে সমস্ত দেশ মাত্রাতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করছে (গ্রীনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি করছে) তাদের মধ্যে চীনের স্থান দ্বিতীয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই চীনের স্থান।

কল-কারখানার এইসব বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ নদী নালার দ্বারা বাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তাই ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে সমুদ্রের জলও যে দূষিত হয়ে পড়ছে তা বলাই বাহুল্য। গত ১০০ বছর আগেও সাগর মহাসাগরগুলো ছিল সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত, কিন্তু আজ আর তা বলা চলে না। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ, তৈলবাহী জাহাজ থেকে চুঁইয়ে পড়া তেল এবং কল-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রকে দূষিত করে চলেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের দুই তৃতীয়াংশ সমুদ্রের জল দ্বারা আচ্ছাদিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা সমুদ্রের জলের মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাছাড়া এই সমুদ্রই পৃথিবীর জলবায়ু ও তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্র না থাকলে আকাশে মেঘ বলে কোন বস্তু থাকত না এবং বৃষ্টি বাদলও হত না। পৃথিবী তখন আজকের মঙ্গল গ্রহের মতই শুষ্ক বন্ধ্যা মরুভূমিতে পরিণত হত। দিনের বেলায় সূর্যের তাপে প্রচণ্ড গরম এবং রাত্রে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত। ফলে কোন প্রাণীরই জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে যেত। সেই প্রাণদায়ী সমুদ্রকে মানুষের ভোগবাদী সভ্যতা আজ বিষাক্ত করতে শুরু করেছে। উপরন্তু যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিদিন কোটি কোটি টন মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরে ফেলা হচ্ছে। আধুনিক ট্রলার দিয়ে মাছ ধরাকে তুলনা করে চলে জমিতে রোলার চালানোর সঙ্গে। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়, বৃদ্ধ শিশু, সমস্ত রকম প্রাণীই পাইকারী দরে মারা পড়ে। ফলে বহু প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী অতি দ্রুত গতিতে লুপ্ত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীদের অনুমান যে, মানুষের ভোগবাদী সভ্যতার আক্রমণে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ প্রজাতির মাছ, জলজ প্রাণী, পাখি, পোকামাকড় এবং উদ্ভিদ চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে আজ এশিয়ার মানুষও প্রাকৃতিকে লুণ্ঠন করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে প্রকৃতির ওপর মানুষের আক্রমণ আজ এশিয়াতে সর্বাধিক। চীনের লোকরা হাঙর মাছের পাখনার ঝোল খেতে ভালবাসে। তাদের সেই লোভ মেটাতে হাঙর মাছ দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। জঙ্গল কেটে কাঠ বিক্রি করা বড়লোক হবার সহজতম পন্থা। তাই ইন্দোনেশিয়ায় জঙ্গলকাটার ধূম পড়ে গেছে। বোর্ণিও দ্বীপের যে অংশ ইন্দোনেশিয়ার অধিকারে তার নাম কালিমান্তান। কয়েক বছর আগে, প্রেসিডেন্ট সুহার্তোর আমলে সেখানে ২৭৮টি লগিং কোম্পানীকে গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রতি বছর তারা প্রায় ৮৬০০ বর্গ কিলোমিটার বন কেটে সাফ করতে থাকে। এককালে কালিমান্তানে মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫,৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং কয়েক বছরের মধ্যে তা কমে ৩,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটারে পৌঁছায়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভোগবাদের যে দৌড় এশিয়ার লোকেরা শুরু করেছে তাতে কি তারা কোনদিনও পাশ্চাত্যকে ধরতে পারবে? অথবা, এশিয়ার লোকেরা কি কোনদিন তাদের জীবন যাত্রার মান ইউরোপ বা আমেরিকার প্রাচুর্যের স্তরে উন্নীত করতে পারবে? এ প্রশ্নের একটিই জবাব, কখনোই না। আজ পৃথিবীর মাত্র ৪ শতাংশ লোক আমেরিকায় বাস করে। কিন্তু তারা ভোগ করে পৃথিবীর মোট ভোগ্য পণ্যের ২৪ শতাংশ। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আমেরিকার মানুষ আজ যা ভোগ করছে, সমগ্র দানব জাতির জন্য দূরের কথা, শুধু এশিয়ার বা শুধু ভারত বা চীনের লোকদের জন্যও তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ভাল বোঝা যাবে। আজ আমেরিকার প্রতি ১.৬ জন মানুষ পিছু একখানা গাড়ি আছে। ভারতের ১০০ কোটি লোকের জন্য তা করতে গেলে

গাড়িলাগবে ৬২ কোটি এবং চীনের ১২০ কোটি লোকের জন্য লাগবে ৭৫ কোটি। অর্থাৎ চীন ও ভারতে মোট ১৩৭ কোটি গাড়ি লাগবে। যা এক অসম্ভব ব্যাপার। ধরা যাক তা করা হল। তাহলে ঐ ১৩৭ কোটি গাড়ির তেল যোগাড় করা হবে এক দুঃসাধ্য কাজ। তাছাড়া ঐ ১৩৭ কোটি গাড়ি যে পরিমাণ দূষণ ঘটাবে তার ফলে মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ গড়ে রোজ ২২০০ ক্যালরি খাদ্য খায় এবং একজন আমেরিকান খায় ৩৬০০ ক্যালরি। যদি ভারত ও চীনের ২২০ কোটি মানুষ রোজ ৩৬০০ ক্যালরি খাদ্য খায় তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষকেই না খেয়ে মরতে হবে। তেমনি ভারতের একজন লোক গড়ে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করে ২.২ ঘন মিটার, কিন্তু একজন কানাডার লোক ব্যবহার করে ৯৮ ঘন মিটার। তাই ভারত ও চীনের সবাই যদি ঐ পরিমাণ বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে শুরু করে তাহলে দেখা যাবে যে পৃথিবীর সব নদনদী, খাল বিল অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পাশ্চাত্যের ভোগবাদ পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের ভোগবাদের পক্ষে সমবন্টন সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, পৃথিবীর সকল মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা পাশ্চাত্যের ভোগবাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষকে বঞ্চিত রেখে বা শোষণকরে অল্প কিছু মানুষের জন্য ব্যাপক ও অঢেল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাই পাশ্চাত্যের ভোগবাদের উদ্দেশ্য। শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে দিয়েই এই নীতির পত্তন হয়েছিল এবং শোষণের ভিত্তির ওপরই আজ তা টিকে আছে। কিছু সংখ্যক মানুষের সাময়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাই এর লক্ষ্য এবং সমগ্র মানব জাতির দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গল সাধন করতে তা একেবারেই অক্ষম।

তাই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান মিখাইল গর্বাচেভ (বর্তমানে আমেরিকাবাসী এবং ইন্টারন্যাশানাল গ্রীন ক্রশ নামক একটি প্রকৃতিপ্রেমী সংস্থার সভাপতি) সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "আধুনিক (ভোগবাদী) সভ্যতা পাশ্চাত্যের লোকদের জন্য একটি উন্নত মানের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে পৃথিবীর বাদবাকি মানুষের জন্য কি এই উন্নত মানের জীবনযাত্রার, প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব?" তিনি আরও বলেন, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদদের কাছে এই সমস্যার কোন সমাধান আছে বলে আমি মনে করি না। একমাত্র কোন নৈতিক মতবাদই এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।" এইসব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে শ্রীগর্ভাচভ এটাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে কতিপয় মানুষের জন্য আরামপ্রদ এক জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করাই পাশ্চাত্যের ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষ্য। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করার কোন তত্ত্ব পাশ্চাত্য ভোগবাদে নেই এবং পৃথিবীর সমগ্র মানুষ এই ভোগবাদী পথে অগ্রসর হলে প্রকৃতির সম্পূর্ণ

ধ্বংস অনিবার্য। তাই প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হলে ভোগবাদী ভাবধারাকে বর্জন করে অবশ্যই অন্য কোন ভাবধারাকে গ্রহণ করতে হবে।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এতদিনে পাশ্চাত্যের টনক নড়েছে যে, ভোগবাদী তাণ্ডবের হাত থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে অন্য কোন ভাবধারাকে গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এবং পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা ইতিমধ্যে নতুন এক ভাবধারার সন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছেন। যে ভাবধারা সমগ্র মানব জাতির তো বটেই, সমগ্র প্রাণী জগৎ ও উদ্ভিদ জগতেরও দীর্ঘস্থায়ী,সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক পিটার ভিটুসেক বলেন, "একটা নতুন ভাবধারার অভ্যুদয় অবশ্যই হবে, যা মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, মানুষ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। ...পরিবর্তন অবশ্যই আসবে, কারণ প্রকৃতি যে সব বিপদ সঙ্কেত পাঠাচ্ছে তা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ...মানুষ যখন বুঝতে পারবে, বা বুঝতে বাধ্য হবে যে, পর্যাবরণের অবনতি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অস্তিত্বকেই বিপজ্জনক করে তুলবে, তখনই পরিবর্তন আসবে।"

সেই নতুন ভাবধারা যে বস্তুবাদী ও ভোগসর্বস্ব হতে পারে না, তাও আজ দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। তাই আমেরিকার একজন বিশিষ্ট প্রকৃতিপ্রেমী ইউজিন লিণ্ডেন বলেন, "আজকের বস্তুবাদী দিগ্‌গজদের পক্ষে কি পর্যাবরণের অবনতি রোধ করার কোন দাওয়াই বাতলানা সম্ভব? নাকি, এতদিন প্রকৃতির ওপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিবিধান করা তাদের পক্ষে সম্ভব?" এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আমেরিকার বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি আল গোরে মহাশয় বলেন, "আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত তা হল, মানব সমাজের মধ্যে প্রাচীন মূল্যবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে মানুষকে প্রকৃতির অপার দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।"

এখন কথা হল, সেই নতুন ভাবধারা হিন্দুত্ব ছাড়া আর কি হতে পারে? মানুষকে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ একমাত্র হিন্দুত্বের দ্বারাই যে সম্ভব তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। একমাত্র হিন্দুত্বই শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃতির দান দেবতার দান এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দান গ্রহণ করে মানুষ ঋণ করে চলেছে, যাকে 'দেবঋণ' বলে। এই দেবঋণের ফলে মানুষ চিরকাল দায়বদ্ধ। একমাত্র হিন্দুত্বই এই শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃতি সকলেরই জন্মদাত্রী মা। তাই তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, ভালবাসতে হবে। তাকে কখনোই পীড়ন করা বা আঘাত করা যাবে না।

তাই আমরা শ্রীগোরে, শ্রীগর্বাচভ, শ্রীবিটুসেক প্রমুখ সমস্ত প্রকৃতি প্রেমিকদের ডেকে একথাই বলব, "যে নতুন ভাবধারার সন্ধান আপনারা করছেন তা হিন্দুত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা আসুন, দেখুন। দেখবেন আপনারা যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, হিন্দুত্বের মধ্যে তার

থেকে আরও অনেক বেশি কিছু পেয়ে যাবেন। কারণ হিন্দুর মূল বাণীই হল সমগ্র জগতের দীর্ঘস্থায়ী ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন। কারণ, এই বিশ্বে একমাত্র হিন্দুই বলে—প্রকৃতিরূপী মাকে দোহন কর, শোষণ করো না।

বছর দুয়েক আগে ববি ম্যাক্‌কখে নামে এক বন্ধ্যা মার্কিন গৃহবধূ একসঙ্গে ৭টি সন্তানের জন্ম দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে। আমেরিকার চিকিৎসকরা একে প্রকৃতির ওপর মানুষের এক মহান বিজয় বলে বর্ণনা করতে থাকেন। বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক মহান বিজয় বলে প্রচার করতে থাকে। তাদের মতে শ্রীমতী ম্যাক্‌কখে সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং যে ওষুধটি তারা ব্যবহার করেছিলেন তা অসাধ্য সাধন করেছে। তবে ৭টি সন্তানের জন্ম দেওয়াটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এটা ঐ ওষুধটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র।

হতে পারে শ্রীমতী ম্যাক্‌কখের বন্ধ্যাত্ব ঘোচানোটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক মহান বিজয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, শ্রীমতী ম্যাক্‌কখে বন্ধ্যা হলেন কেন? সেটা কি প্রকৃতির আর একটি বিপদ সংকেত নয়? ভোগবাদী মানুষ এত কাল প্রকৃতির ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে, এটা কি তার শাস্তি নয়? পীড়ন ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধ গ্রহণ নয়? প্রকৃতিকে লুণ্ঠনের বর্তমান ধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যে দিন সব মায়েরাই বন্ধ্যা হয়ে যাবেন এবং ওষুধ ছাড়া সন্তান ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। বিজ্ঞান ও ভোগ মানুষকে প্রকৃতি থেকে যেভাবে বিচ্ছিন করে চলেছে তার ফলে এটাই হবে মনুষ্য জাতির অন্তিম পরিণতি। বহু জীবজন্তুকে বিলুপ্ত করার পর মানুষ নিজেই হয়তো একদিন বিলুপ্তির সম্মুখীন হবে।

একমাত্র হিন্দুত্বের পক্ষেই সম্ভব 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' মন্ত্রে উদ্দীপিত করে মানুষকে ভোগের রাস্তা থেকে ত্যাগের রাস্তায় নিয়ে আসা। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' মন্ত্রের দ্বারা মানুষকে এই বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা এবং সর্বোপরি প্রকৃতি ও মানব সমাজের মধ্যে নিবিড় বন্ধন পুনঃস্থাপিত করে মনুষ্য জাতিকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।

বিবিধ

ভারত মায়ের কৃতী সন্তান লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল

গত ২৪ আগস্ট, ২০০৪; লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল ছেলে আদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন নিউইয়র্ক শহরের ৫২ তম স্ট্রীটে অবস্থিত ডব্লিউ এল রস কোম্পানীর সদর দপ্তরে। এর প্রায় সপ্তাহখানেক আগে ওই সংস্থার কর্ণধার উইলবার রস-এর সঙ্গে লক্ষ্মীনিবাসের ফোনে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। তবে আজই প্রথম লক্ষ্মীনিবাসের সঙ্গে তাঁর হবে মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা, আর সেই কারণেই তিনি ছেলেকে সঙ্গে করে তাঁর নিজস্ব 'গাল্‌ফস্ট্রীম' জেট বিমানে লন্ডন থেকে উড়ে এসেছেন। প্রায় বছর দুই আগে উইলবার রস আমেরিকার কয়েকটা রুগ্ন ইস্পাত কারখানা কিনে গড়ে তুলেছেন 'ইন্টারন্যাশনাল স্টিল গ্রুপ' বা আই এস জি, যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ২ কোটি টন। বর্তমানে লক্ষ্মীনিবাসের নজর পড়েছে ওই আই এস জি-র ওপর।

যাইহোক, সেদিন দেখা সাক্ষাৎ সবই হল, কিন্তু চূড়ান্ত কথাবার্তা হল না। তবে এই প্রাথমিক কথাবার্তার ফলশ্রুতি হিসাবেই ১ অক্টোবর ৬৬ বর্ষীয় শ্রীরস তাঁর সংস্থার প্রধান কার্যকর্তা শ্রীরডনী মটকে সঙ্গে করে হাজির হলেন মিত্তালের লন্ডনের বাড়িতে। সেখানে কথাবার্তা কিছুটা এগুলো বটে, তবে ৯ অক্টোবর রস সাহেবের তৃতীয় বিবাহ ধার্য থাকার কারণে চূড়ান্ত কথাবার্তা স্থগিত রাখা হল। ৯ অক্টোবর ব্যস্ত থাকার জন্য লক্ষ্মীনিবাসের পক্ষে রস-এর বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হল না। তবে উপহার হিসাবে পাঠালেন রত্ন খচিত একটি পাত্র (ট্রে) এবং প্রায় ১০০ বছরের পুরানো (১৮৯৭ খ্রীঃ) ফ্রান্সের বিখ্যাত এক বোতল 'পেত্রুশ' মদ, যার অনুমানিক দাম ৯,২০০ পাউন্ড বা ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।

এর প্রায় দু'সপ্তাহ পরে এল সেই মহান মুহূর্ত। ২৫ অক্টোবর প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র সই সাবুদ হবার পর লক্ষ্মীনিবাস ও রস সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। সেখানে লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল ঘোষণা করলেন যে, তিনি ৪৫০ কোটি ডলার (বা ২০,৭০০ কোটি টাকা) দিয়ে রস-এর আই এস জি-কে কিনে নিয়েছেন। এই লেনদেন সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিত্তালের 'ইস্পাত ইন্টারন্যাশনাল' হয়ে গেল বছরে ৭ কোটি টন ইস্পাত উৎপাদনকারী বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত সংস্থা, যার বাৎসরিক বিক্রির পরিমাণ হল ৩১০০ কোটি ডলার (বা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা)। লক্ষ্মীনিবাস আই এসজি-র নতুন নাম দিলেন ''ইস্পাৎ আমেরিকা।'' ১৪টা দেশে ছড়িয়ে থাকা তাঁর ১৫টা কারখানায় মোট

কর্মী সংখ্যা দাঁড়ালো ১,৬৫,০০০। দ্বিতীয় স্থানে থাকল আমেরিকার সংস্থা 'আর্সেলর', যার বার্ষিক উৎপাদন ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টন (সারণী-১)। যে ১৪টি দেশে মিত্তালের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে রয়েছে তা (সারণী-২) দেখানো হল।

গত বছর ২৪ অক্টোবর ছিল লক্ষ্মীনিবাসের বাবা শ্রীমোহনলাল মিত্তালের ৭৮ তম জন্মদিন। ওইদিন প্রভু ভেঙ্কটেশ্বরের পুজো দিতে তিনি গিয়েছিলেন তিরুপতি। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে গেলেন ছোট ছেলে বিনোদ কুমারের মুম্বাইয়ের বাড়িতে এবং সেখানেই পরদিন জানতে পারলেন যে বড় ছেলে লক্ষ্মীনিবাস বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে হয়েছে বৃটেনের সর্বাপেক্ষা ধনী (ভারতের তো বটেই) ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোট পরিমাণ হয়েছে ১৯০০ কোটি ডলার বা ৮৭, ৪০০ কোটি টাকা, যা তাঁকে বিশ্বের ১৫ জন ধনী ব্যক্তির মধ্যে স্থান করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যবসার জগতে তাঁর এত সুনাম হয়েছে যে, ২৫ অক্টোবর নিউইয়র্কে আই এস জি-কে অধিগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার বাজারে আই এস জি-র শেয়ারের দাম ১৯ শতাংশ বেড়ে গেল, আর 'ইস্পাত ইন্টারন্যাশনাল'-এর শেয়ারের দাম বাড়ল ১৭ শতাংশ। সব থেকে বড় কথা হল, যে বৃটেন প্রায় ২০০ বছর আমাদের দেশকে পরাধীন করে রেখেছিল এবং যারা ভারতের মানুষকে ঘৃণাভরে নেটিভ, বা কালা আদমী বলত, আজ একজন কালা আদমীই হয়েছে বৃটেনের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, এককালের রাজকীয় প্রাসাদ লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেন ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড বা ৪৫৬ কোটি টাকায় কিনে সেই গর্বের প্রাসাদে বসবাস করছেন কালা আদমী লক্ষ্মীনিবাস মিত্তাল। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, যেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা করতে এসে এই ভারতবর্ষকে পরাধীন করেছিল. সেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বর্তমান মালিক একজন ভারতীয়।

লক্ষ্মীনিবাসের এই কৃতিত্বে কলকাতার গর্বও কম নয় কারণ লক্ষ্মীনিবাস এই কলকাতারই ছেলে। ১৯৭০ সালে কলকাতারই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হন। তাঁর বাবা মোহনলাল মিত্তাল কলকাতাতেই তাঁর লোহার ব্যবসা শুরু করেন। পরে ১৯৫৬ সালে মোহনলাল ইস্পাত গলাবার উপযোগী একটি ইলেকটিক আর্ক ফার্নেস কেনেন এবং পুরানো লোহা-লক্কড় কিনে তা গলিয়ে ইস্পাত তৈরি করা শুরু করেন। ১৯৭০ সালে বি. কম. পাস করার পর লক্ষ্মীনিবাস বাবার সঙ্গে ব্যবসায় মন দিলেন। ১৯৭১ সালে কলকাতারই এক ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে ঊষাকে বিয়ে করেন।

বাবার সঙ্গে ব্যবসা করতে করতে লক্ষ্মীনিবাসের মনে হল যে, এই ভারতে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। এখানে এত সরকারি নিয়ম কানুন, লাইসেন্স পারমিটের কড়াকাড়ি যে নতুন কিছু গড়ে তোলা এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষ সেই সময় সরকারি লৌহ-ইস্পাৎ সংস্থাগুলোর স্বার্থে নতুন কোন কারখানা করার পারমিট দেওয়া প্রায় বন্ধ ছিল। তাই লক্ষ্মীনিবাস পাড়ি দিলেন ইন্দোনেশিয়ায় এবং ১৯৭৬ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যায় করে স্থাপন করলেন 'ইস্পাত ইন্দো'। তখন তার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বছরে ৬০ হাজার টন, যার বর্তমান

উৎপাদন ক্ষমতা হয়েছে বছরে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন। এরপর লক্ষ্মীনিবাসের বড় পদক্ষেপ হল ১৯৯৮ সালে আমেরিকার ইনল্যান্ড স্টিল কোম্পানীকে অধিগ্রহণ। বর্তমানে এর নাম 'ইস্পাত আমেরিকা'। মাত্র ১ বছরের মধ্যে লক্ষ্মীনিবাস এর উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন বাড়িয়ে ফেললেন। এবং সেই সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়ে ফেললেন। তাছাড়া উৎপন্ন ইস্পাতের গুণগত মান এত বাড়িয়ে ফেললেন যে, বিশ্বের বৃহত্তম মোটরগাড়ি তৈরির কোম্পানীগুলো 'ইস্পাত আমেরিকা'র বাঁধা খরিদ্দারে পরিণত হল। গাড়ি তৈরি করতে দরকার হয় উৎকৃষ্ট মানের ইস্পাতের চাদর। আগে 'ইংল্যান্ড স্টিল'-এর পক্ষে এই গুণমানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু লক্ষ্মীনিবাসের হাতে পড়ে ইস্পাতের গুণমান এত বৃদ্ধি পেল যে, ফোর্ড, জেনারেল মোটরস, হোন্ডা, টয়োটা ইত্যাদি বৃহৎ সংস্থাগুলো লক্ষ্মীনিবাসের 'ইস্পাত আমেরিকা'-র ভক্ত হয়ে পড়লো।

এর পর লক্ষ্মীনিবাস মিত্তালের সর্বাপেক্ষা বড় পদক্ষেপ হল ২০০৬ সালে লুক্সেমবার্গে অবস্থিত ইউরোপ তথা বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাৎ উৎপাদনকারী সংস্থা আর্সেলর স্টিল কোম্পানীর অধিগ্রহণ এবং নতুন কোম্পানী আর্সেলন মিত্তাল গঠন। ফলে লক্ষ্মীনিবাস হয়ে গেলেন বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাৎ উৎপাদনকারী ব্যক্তি। গত ২০১০ সালে এই সংস্থা উৎপাদন করেছে মোট ৯ কোটি ৮২ লক্ষ টন ইস্পাৎ। লক্ষ্মীনিবাস হলেন আর্সেলন মিত্তাল কোম্পানীর ৪১% শেয়ারের মালিক। বর্তমানে লক্ষ্মীনিবাসের মোট সম্পত্তির পরিমাণ হল ২৮৭ কোটি মার্কিন ডলার এবং তিনি হলেন বিশ্বের ২১তম ধনী ব্যক্তি।

এককালে, সুদূর অতীতে এই ভারতবর্ষই পৃথিবীর মানুষকে ইস্পাত তৈরি ও তার ব্যবহার শিখিয়েছিল। অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয়রা লোহার ব্যবহার জানতো। মহাভারতের ঘটনা ঘটেছে আজ থেকে কম করে ৫০০০ বছর অগে, কারণ ভারতীয় ও আমেরিকার (এন এ এস এ) বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, খৃঃ পূঃ ৩০৬৭ সালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই মহাভারতে আছে, ধৃতরাষ্ট্র লোহার ভীমকে চূর্ণ করেছিলেন। কঠোপোনিষদের ঋষি বলেছেন—**উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি**। কাজেই, ক্ষুর না থাকলে সেই ঋষি ক্ষুরের কথা বললেন কি করে? আর ইস্পাত না থাকলে ক্ষুর থাকে কি করে? অথচ পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা বলছেন খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছর আগে মানুষ লোহার ব্যবহার শিখেছে। বৃটিশরা যখন ভারতে আসে তখন ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত শিল্প খুবই উন্নত ছিল। কুতুব মিনারের কাছে চন্দ্ররাজা বা সমুদ্রগুপ্তের সময়ে নির্মিত লোহার স্তম্ভ সেই উন্নত প্রযুক্তির প্রমাণ। ১৭৪২ সালে ভারতীয় লৌহ-ইস্পাত শিল্পে ৮০,০০০ শ্রমিক কাজ করত। একমাত্র ভারতের কারিগরেরাই উচ্চ অঙ্গার বিশিষ্ট ইস্পাত, বা হাই কার্বন স্টিল তৈরি করতে পারত। সেই ভারতীয় ইস্পাত দিয়েই পৃথিবীর সবাই উৎকৃষ্ট তরবারি তৈরি করত। এককথায় বললে, ভারতই বিশ্বের লৌহ ও ইস্পাৎ শিল্পে নেতৃত্ব করত। আজ লক্ষ্মীনিবাস মিত্তালের হাত ধরে ভারত আবার সেই হৃত গৌরব ফিরে পেতে চলেছে কিনা, একমাত্র সময়ই তা বলতে পারবে।

সারণী-১

বিশ্বের ১১টি বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদনকারী সংস্থা

সংস্থা	বার্ষিক উৎপাদন
মিত্তাল স্টিল	৭.০০ কোটি টন
আরসেলর	৪.৩০ কোটি টন
নিপ্পন স্টল	৩.১৩ কোটি টন
আই এফ ই	৩.০২ কোটি টন
পসলো	২.৮৯ কোটি টন
সাংহাই বাওস্টিল	১.৯৯ কোটি টন
কোরাস গ্রুপ	১.৯১ কোটি টন
ইউ এস স্টিল	১.৭৯ কোটি টন
থাইসেন গ্রুপ	১.৬১ কোটি টন
নুকল স্টিল	১.৫৮ কোটি টন
আর্সেলন-মিত্তাল	৯.৮২ কোটি টন

(ভারতীয় সংস্থাগুলো একত্রে উৎপাদ করে প্রায় ২ কোটি টন ইস্পাত)।

সারণী-২

মিত্তালের সাম্রাজ্য

	সংস্থা	দেশ	বার্ষিক উৎপাদন
১।	ইস্পাত আমেরিকা	আমেরিকা	২০০.০০ লক্ষ টন
২।	ইস্কর	দক্ষিণ আফ্রিকা	৬৩.০০ লক্ষ টন
৩।	ইস্পাত পোলস্কা	পোল্যান্ড	৬০.০০ লক্ষ টন
৪।	ইস্পাত ইনল্যান্ড	আমেরিকা	৫৩.০০ লক্ষ টন
৫।	ইস্পাত কারমেট	কাজখস্তান	৩৮.০০ লক্ষ টন
৬।	ইস্পাত সাইডেক্স	রোমানিয়া	৩৮.০০ লক্ষ টন
৭।	ইস্পাত মেক্সিকানা	মেক্সিকো	৩৪.০০ লক্ষটন
৮।	ইস্পাত নোভাহাট	চেক রিপাব্লিক	৯.০০ লক্ষ টন
৯।	ইস্পাত জার্মানী	জার্মানী	২৮.০০ লক্ষ টন
১০।	ইস্পাত ইউনিমেটাল	ফ্রান্স	১৪.০০ লক্ষ টন
১১।	ইস্পাত সিউবেক	কানাডা	১৪.০০ লক্ষ টন
১২।	ইস্পাত আন্নাবা	আলজেরিয়া	১.০০ লক্ষ টন
১৩।	আর্সেলন-মিত্তাল	লুক্সেমবার্গ	৯.৮২ কোটি টন

যান্ত্রিক পাশ্চাত্য সভ্যতার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, বর্তমানে আমরা মানব ইতিহাসের একটা মতিচ্ছন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে চলেছি। একদিকে আমরা প্রাচ্যের বাসিন্দারা আধুনিক হবার জন্য অন্ধভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করে চলেছি। আর অপরদিকে পাশ্চাত্য তার আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার করাল গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সবথেকে দুঃখের ব্যাপার হল এই যে, গ্লোবালাইজেশনের নামে আমরা পাশ্চাত্য মূলধন, কারিগরি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য দরজা খুলে দিয়েছি। কিন্তু একবারও চিন্তা করছি না যে, এই যান্ত্রিক ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদের দেশে সমাজ ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদকেই ধ্বংস করে দিয়েছে এবং চিরন্তন মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থাটাকেই পতনোন্মুখ করে তুলেছে।

পাশ্চাত্যের এই যান্ত্রিক সভ্যতা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এতটা বাড়িয়ে তুলেছে যে, আজ আমেরিকার শতকরা ২৫টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র একজন। বর্তমানে সেখানকার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫জন মানসিক রোগের শিকার এবং প্রতি দশ বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। খুন ও পথ দুর্ঘটনার পর আত্মহত্যাই সেখানে মৃত্যুর তৃতীয় মূল কারণ। খুন খারাপির ফলে গতবছর সেখানে প্রায় ৪০,০০০ লোক মারা যায় এবং জনসাধারণকে এই ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য মৃত ঐ চল্লিশ হাজার লোকের চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো রাজধানী ওয়াশিংটনে, হোয়াইট হাউসের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়। একটা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গড়ে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন আমেরিকান বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়। প্রতি ১০০০ বিবাহের মধ্যে সেখানে ৫৩৮টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে এবং স্কুলের অবিবাহিত মেয়েরা শতকরা ২৫টি বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন মার্কিন সাংবাদিক বলেছেন, "It is really amazing to see a twelve year old school girl to carry her second baby."

বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ নামে পরিচিত কিছু বিজ্ঞানী উপরোক্ত সামাজিক ব্যাধিগুলোর কারণ অনুসন্ধান করতে নেমে পড়েছেন। এইসব বিজ্ঞানীদের মতে এইসব সামাজিক ব্যাধিগুলোর মূল কারণ হল, যে পরিবেশের মধ্যে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল আর আজ যে পরিবেশে তারা

বাস করতে বাধ্য হচ্ছে, এই দুই পরিবেশের মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা পরিবেশকে অনেকদিন থেকেই কলুষিত করছে। তবে সবথেকে প্রধান হল এই যে, এই সভ্যতা মানুষে মানুষে মৈত্রী, ভালবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদিকে নষ্ট করে বিচ্ছেদের প্রাচীর খাড়া করে তুলেছে।

আজও পৃথিবীতে কিছু কিছু জনবসতি আছে যাদের মধ্যে এখনও তথাকথিত সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটে নি। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জারোয়া প্রজাতির লোকেরা এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ ছাড়া জাপানের 'আইনু', দক্ষিণ আফ্রিকার 'কুংসান' এবং দক্ষিণ আমেরিকার 'এক্' জাতির লোকেরা এই পর্যায়ে পড়ে। এরা মূলতঃ শিকারের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু জাতির লোকেরা চাষবাস করলেও, সেই হাজার হাজারবছর আগে যেমন ছিল আজও তেমনই রয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত শিকারী ও কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, তাদের মধ্যে মানসিক রোগ বলতে কিছু নেই। মানসিক রোগীদের রক্তে 'কার্টিসল' নামে একটা যৌগ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমস্ত জাতির লোকেদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কার্টিসল একেবারেই নেই। এই সমস্ত আদিম প্রজাতির মানুষদের মধ্যে যেটা খুব স্পষ্ট করে চোখে পড়ে তাহল, তাদের সবাই সবাইকে চেনে, জানে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে বছরের পর বছর এক সঙ্গে থাকতে থাকতে নিজেদের মধ্যে একটা নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য শিল্প সভ্যতার ততটা অনুপ্রবেশ এখনও ঘটে নি বলে আমাদের পাড়াগাঁয়ে গেলেও ঠিক এমনই একটা পরিবেশ সহজেই চোখ পড়ে। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের প্রায় রোজই দেখা সাক্ষাৎ হয়। কাজেই কোন কারণে ঝগড়া বা মনোমালিন্য হলে তা সহজেই মিটে যায়। কিন্তু শহরের মানুষকে সভ্যতা এতখানি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যে, দেখা যায়, এই ফ্ল্যাটে কি ঘটছে পাশের ফ্ল্যাটের লোক জানতে পারে না। কাজেই তাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটলে তা আর মিটবার সুযোগ পায় না।

বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার সূত্রপাতের সময় থেকেই পুরাণো পারিবারিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর ভাঙন শুরু হয়েছে। প্রথমত, গ্রামের চাষীদের শহরের শিল্প শ্রমিকে পরিণত করার মধ্যে দিয়ে তা শুরু হয় এবং বর্তমানে বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ কার্যদক্ষতা সম্পন্ন লোককে তাদের আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু বান্ধবের বেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূর দূরান্তে চালান করার মধ্যে দিয়ে সেই প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিশ্বাস, বদান্যতা, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি কোমল প্রবৃত্তিগুলো বর্তমান থাকে। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা মানুষকে পরিচিত গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানব মনের এই কোমল দিকগুলোকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলছে। মানুষকে অসামাজিক, স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে।

সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব তৈরী করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা টেলিভিশনকে আর একটি মোক্ষম কারণ বলে মনে করেন। যদি সেই টিভিকে কেবল্ বা ভিসি আর-এর সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে, তবে ফল হয় আরও মারাত্মক। বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ রুডলফ্ নেসে-এর মতে টিভির আরও একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর দিক আছে। তিনি মনে করেন যে, টিভিতে যেসব কাল্পনিক লোকজন এবং তাদের কাল্পনিক জীবনযাত্রা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখানো হয়, তা দর্শকের মনে নিজের প্রতি হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, সে তার আত্মীয়, বন্ধু ও পারিপার্শ্বিক লোকজনকেও টিভিতে দেখানো লোকজনের চাইতে হীন ভাবতে শুরু করে। এছাড়া টিভি যে মানুষের মনে অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে তা বলাই বাহুল্য। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পাঁচের দশকে যখন আমেরিকায় প্রথম টিভি চালু হয়, তখন যে যে শহরে টিভি চলতে থাকে সেই সেই শহরে চুরি, রাহাজানি ইত্যাদি ঘটনা হঠাৎই বেড়ে যায়।

গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের স্ত্রী হিলারী ক্লিনটন আমেরিকার বাচ্চাদের সমস্যা নিয়ে একটা বই লিখে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন। তাতে তিনি নানা ভাবে, উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছেন যে, টিভি কিভাবে শিশুমনকে কদর্য ও অপরাধপ্রবণ করে তুলতে সাহায্য করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ রবার্ট পুটনামের মতে, টিভি সমষ্টিগত রুচিকে প্রাধান্য না দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত রুচিকেই প্রাধান্য দেয়। বিজ্ঞানীদের মতে টেলিফোন, সেলুলার ফোন এবং অধুনা 'ইন্টারনেট' ও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরী করে চলেছে।

বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদরা এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, বর্তমান শহুরে সভ্যতার বিচ্ছিন্নতা শিশুকে বড় করে তোলার কাজকে একা এক মায়ের পক্ষে এক দুঃসাধ্য কার্যে পরিণত করেছে। অথচ গ্রাম্য বা আদিম পরিবেশে বা সমাজে শিশু মানুষ করার কাজটা খুবই সহজ ব্যাপার। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশিরা এই দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয় বলে মায়ের ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে চেপে বসে না। এইসব গ্রাম্য বা আদিম সমাজে একটা দৃশ্য খুবই চোখে পড়ে। তাহল, কোন মহিলা তার প্রতিবেশির বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। অথচ আজকের সভ্য সমাজে এরকম একটা দৃশ্য শুধু বিরলই নয়, কল্পনার বাইরে।

ফিলিপ ওয়াকার নামে একজন নৃতত্ত্ববিদ প্রায় ৫০০০ শিশুর কঙ্কাল পরীক্ষা করেছেন। যার মধ্যে খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছরের সময়কার পুরানো কঙ্কালও রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, ওই সমস্ত কঙ্কালের হাড়ে শ্রীওয়াকার কোন আঘাতের চিহ্ন পান নি। অথচ বর্তমান কালের ২০টি ওইরকম কঙ্কাল পরীক্ষা করলে অন্ততপক্ষে একটার মধ্যে জখমের চিহ্ন পাওয়া যাবে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আগেকার শিশুরা মা, মাসী, পিসী, কাকা, জ্যেঠা, ঠাকুমা, দিদিমা ইত্যাদির চোখের সামনে বড় হত বলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকতো না। নৃতত্ত্ববিদ মার্টিন ড্যালী, মার্গো উইলসন প্রভৃতির মতে, বর্তমানে শিশু নির্যাতনের ঘটনা

বেড়ে চলেছে এবং সেই কারণেই আঘাতের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে শিশুরা শুধু দৈহিক এবং মানসিকই নয়, যৌন নির্যাতনেরও শিকার হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, যেসব শিশু জন্মদাতা পিতার বদলে সৎ পিতার আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়, তারা অনেক বেশি মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হয়। এই কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা যত বাড়ছে, শিশু নির্যাতনের মাত্রাও তত বাড়ছে।

কিছুদিন আগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯৫৭ ও ১৯৯০ সালের মধ্যে আমেরিকানদের গড় মাথাপিছু আয় দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। অথচ আমি খুব সুখে আছি—একথা বলার মতো লোকের সংখ্যা মোটেই বাড়ে নি। ১৯৫৭ সালে এরকম লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং ১৯৯০ সালেও তাইই আছে। এ থেকে মনস্তত্ত্বদিরা মনে করেন যে, শুধু ভোগের সামগ্রী বাড়লেই মানুষের সুখ বাড়ে না। ডেভিড মায়ার নামে একজন মনস্তত্ত্ববিদ তাঁর The Persuit of Happiness গ্রন্থে লিখেছেন, "More domestic products is not the answer to our deepest needs" —অর্থাৎ শুধু ভোগ্যপণ্যই আমাদের অন্তরের প্রয়োজনের একমাত্র সমাধান নয়। বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদ শ্রীমতী টিমথী সিলার মনে করেন যে, মানুষ সব সময় নিজেকে তুলনা করে প্রতিবেশী ও তার সহকর্মীদের সঙ্গে। কাজেই সে যদি দেখতে পায় যে প্রতিবেশীরা বা সহকর্মীরা রাতারাতি ধনী হচ্ছে না বা প্রাচুর্য দেখাচ্ছে না, তবে সেও নিজের যা কিছু আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে যাবে।

বিজ্ঞানী শ্রীডেভিড মায়ার মনে করেন যে, সব মানুষই একটু বেশি পেতে চায়। কথায় বলে, আসলের চেয়ে 'ফাউ'-এর আদর বেশি। আজকের ধনতান্ত্রিক শিল্প সভ্যতা বিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের মনে ওই একটু বেশি পাবার বাসনাকে নিরন্তর বাড়িয়ে চলেছে। অপরদিকে, ওই একটু বেশি পাবার বাসনা মানুষে মানুষে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলছে। সবাই তার প্রতিবেশিকে দেখাতে বাস্ত যে, দেখ এটা আমার আছে। তোমার নেই। কাজেই আমার স্ট্যাটাস তোমার থেকে ওপরে। এই প্রতিযোগিতা প্রতিবেশির সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাবের বদলে হিংসা, ক্ষোভ, হীনম্মন্যতা ইত্যাদির জন্ম দিচ্ছে এবং পক্ষান্তরে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছে।

বিজ্ঞানী মায়ার, মিলার ও অন্যান্যদের মতে, আত্মসংযমই হল একমাত্র পথ, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করতে পারে। একমাত্র আত্মসংযমই পারে বিজ্ঞাপনের দ্বারা সৃষ্ট প্রলোভনকে দমন করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশির সঙ্গে স্ট্যাটাস-এর প্রতিযোগিতাকে রুখতে। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আত্মসংযমের কথা কোন নতুন কথা নয়। কারণ, হিন্দু সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদই হল, ত্যাগ আর আত্ম সংযম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স
শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।। (২।৭০)

অর্থাৎ যেমন বিভিন্ন নদনদীর জল পরিপূর্ণ অচল, স্থির সমুদ্রে পতিত হয়ে তাকে বিচলিত না করেই মিশে যায়, বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সমস্ত বিষয় ভোগ বাসনাও যে ব্যক্তির মনে কোন বিকার সৃষ্টি না করে বিলীন হয় তিনিই পরম শান্তি লাভ করেন। কিন্তু বিষয়ভোগ আকাঙ্খাকারীর শান্তি লাভ অসম্ভব।

কিন্তু পাশ্চাত্য মতে মানুষ সমাজবদ্ধ পশু মাত্র। তাই তাদের তত্ত্বে ভোগবাদের প্রাধান্য। আত্মসংযমের বিন্দুমাত্র স্থান তাতে নেই। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ ফ্রয়েড-এর মতে মানুষ হল যৌন কামনার দ্বারা বশীভূত ও যৌন কামনার দ্বারা তাড়িত পশু। ফ্রয়েড সাহেব আদিম মানব সমাজকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা আরও ভয়াবহ। তাঁর মতে তারা যূথবদ্ধ ভাবে বাস করতো এবং সেই যূথের নারীদের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য পুরুষদের মধ্যে সর্বদাই মারামারি লেগে থাকতো। তারপর এদিন যূথকর্তা বৃদ্ধ হলে তার ছেলেরাই তাকে মেরে তার মাংস খেয়ে ফেলত ও নারীদের ওপর প্রভুত্ব অর্জন করতো।

কিন্তু সেই পাশ্চাত্যের মনোবিজ্ঞানীরাই আজ অন্য কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন যে, এতদিন তাঁরা আদিম মানব সমাজকে কামনা তাড়িত উচ্ছৃঙ্খল বলে যেমন ভেবে এসেছেন, তা ঠিক নয়। সেই আদিম মানবদের মধ্যেও দয়া, মায়া, সহানুভূতি, প্রেম, ভালবাসা ইতাদি কোমল মানবিক দিকগুলোও আজকের মতোই বর্তমান ছিল এবং সেই কারণে সহজাত অপরাধবোধ তাদের মধ্যে আত্মসংযমের কাজ করতো। আজকের অনেক মানব সমাজে তথাকথিত সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বিজ্ঞানীরা আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে, এই সমস্ত সমাজেও সহজাত অপরাধবোধ থেকে আত্মসংযম জন্মলাভ করছে।

গত বছর বিশ্ববিখ্যাত সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকায় শ্রীল্যান্স মোরো নামে একজন স্বনামধন্য লেখক একটি প্রবন্ধ লিখলেন। যার শিরোনাম হল, "Fifteen Cheers for Abstinence" বা আত্মসংযমের উদ্দেশ্যে পনেরোটি সাধুবাদ। ওই প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার যেসব ব্যাধিগুলো আজ প্রবলভাবে দেখা দিচ্ছে, যেমন—এইডস্, মাদক দ্রব্য সেবন, নাবালিকাদের গর্ভধারণ, পথ দুর্ঘটনা ইত্যাদির একমাত্র প্রতিবিধান আত্মসংযম। কথা বলে ক্ষান্ত হলে চলবে না। সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রবেশ ঘটাতে হবে এবং সর্বোপরি শিশু বয়স থেকেই সবাইকে বোঝাতে হবে যে, যে যত সংযমী হবে, সেই তত লাভবান হবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আত্মসংযমের একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, শ্রীমোরো সাহেব যা বলতে চেয়েছেন তাহল, নির্ভেজাল হিন্দু সংস্কৃতি। আমাদের মুনি ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে যা বলে গেছেন, আজ পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেই সত্যকেই উপলব্ধি করছে এবং অনুসরণ করার কথা বলছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এর মধ্যে দিয়ে আমাদের ঋষিরা যে জীবন যাত্রার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ভোগবাদী পাশ্চাত্যও সেই সত্যদৃষ্ট ঋষিবাক্য মাথায় তুলে নিতে বাধ্য হচ্ছে, ঋষিদৃষ্ট পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ষাটের দশকে যেই আমেরিকা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যৌন শিক্ষা আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় করেছিল, আজ সেই আমেরিকাই বলছে যে, যৌন শিক্ষার বদলে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা চালু করতে হবে এবং আত্ম সংযম ও ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা দিতে হবে। সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনের বলে যে আমেরিকায় এতদিন যে কেউ ইচ্ছা করলেই আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক হতে পারত, আজ সেই দ্বিতীয় সংশোধনের ওপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। যে আমেরিকা এতদিন ভাবতো যে শুধু পুলিশ ও প্রশাসনের দ্বারাই অপরাধ দমন করা সম্ভব, সেই আমেরিকাই আজ অপরাধীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচারের কথা ভাবছে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি উক্তি দিয়ে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটানোই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি বলেছিলেন, **''আমাদের ঋষিরা কতটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন তা অনুধাবন করতে পাশ্চাত্যের এখনও কয়েক শ'বছর লাগবে।''**

উগ্র জাপানী জাতিদম্ভ ও পরমাণু বোমা

"বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি অস্বাভাবিকভাবে এবং সব দিক দিয়েই জাপানের স্বার্থেরপরিপন্থী হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি শত্রুপক্ষ নতুন ধরণের এক নিষ্ঠুরতম বোমা ব্যবহার করতে শুরু করেছে যার ধ্বংস ক্ষমতা হিসাব নিকাশের বাইরে এবং তা ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে। ...আমি সমস্ত ব্যপারটা নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করেছি এবং বর্তমানে জাপানের নিজ ভূমিতে ও বিদেশের মাটিতে জাপ-সৈন্যের পরিস্থিতি চিন্তা করে বই সিদ্ধান্তে উপনীয় হয়েছি যে, এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যাবার অর্থ হল বিশ্বব্যাপী রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতাকে দীর্ঘায়িত করা।" ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগস্ট দুপুরবেলা সম্রাট হিরোহিতোর উপরিউক্ত বেতার ভাষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পট্‌স্‌ডাম দলিল (Potsdam Dedaration) স্বীকার করে জাপানের আত্মসমর্পণের খবর যখন জাপান-বেতারে প্রচারিত হচ্ছিল তখন প্রত্যেকটি বেতার যন্ত্রের সামনে জাপানী জনতা ভীড় করে সেই খবর শুনছিল আর নীরবে চোখের জল ফেলছিল।

কিন্তু তখন তাদের মনে সেই নতুন ধরণের বোমা সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। প্রায় ২০০ কোটি ডলারের বাজেট নিয়ে, মেজর জেনারেল পেস্‌লী গ্রোভস্‌ এর নেতৃত্বে চূড়ান্ত গোপনীয় "মানহাটান প্রোজেক্ট" এর মাধ্যমে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারই পরিণতি হল ঐ ভয়ঙ্কর বোমা—মাত্র মাসখানেক আগে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে যার সফল পরীক্ষা হয়েছিল। জেনারেল গ্রোভস্‌ তখনই এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে, জাপানকে আত্মসমর্পণ বাধ্য করতে হলে কমপক্ষে দুটো বোমা দরকার। প্রথম বোমাটা লাগবে এর ধ্বংসের ভয়াবহতা বোঝাতে এবং দ্বিতীয়টা লাগবে জাপানকে এটা বিশ্বাস করাতে যে, আমেরিকার হাতে এই বোমা একাধিক মজুত আছে।

যে দুটো বোমা জাপানে ফেলার জন্য তৈরী করা হয়েছিল তার একটার নাম ছিল "লিট্‌ল্‌ বয়" (Little Boy) বা বাচ্চা ছেলে। ইউরেনিয়াম ব্যবহারকরে এটা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওজন ছিল ৪,৪০০ কিলোগ্রাম বা ৬৫ টন, লম্বা ৩ মিটার ও ব্যাস ৭০ সেন্টিমিটার। অপরটার নাম ছিল "ফ্যাট ম্যান" বা মোটা লোক, যা প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে তৈরী করা হয়েছিল। এর ওজন ছিল ৪,৫৬০ কিলোগ্রাম, ব্যাস দেড় মিটার এবং লম্বা সাড়ে তিন মিটার। ঠিক এইরকম একটা বোমা নিউ মেক্সিকোর

মরুভূমিতে পরীক্ষা করা হয়েছিল। জাপানের প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে, প্রশান্ত মহাসাগরে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত টিনিয়ান (Tinian) নামক একটি ছোট্ট দ্বীপে (যার আয়তন মাত্র ১০০ বর্গ কিমি) আমেরিকা তার সর্ব বৃহৎ বিমানক্ষেত্র তৈরী করেছিল এবং এই টিনিয়ান থেকেই জাপানের মূল ভূখণ্ড ও জাপান অধিকৃত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে বিমান আক্রমণ চালানো হত। সেকালের শ্রেষ্ঠ বোমারু বিমান বি-২৯-এর জন্য সেখানে তৈরি করা হয়েছিল ২,৫৯০ মিটার লম্বা চারটি সমান্তরাল রানওয়ে।

এই বি-২৯ বিমানের সাহায্যে টিনিয়ান থেকেই জাপানে পরমাণু বোমা ফেলার পরিকল্পনা করা হয়। মূলতঃ জাপানে ফেলার জন্যই পরমাণু বোমা তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল এবং কিভাবে সেই বোমা জাপানে ফেলা হবে তার প্রায় এক বছর আগে, নিউ মেক্সিকোতে পরীক্ষা করার আগেই, চূরান্তভাবে ছক তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল।

সেই অনুসারে আমেরিকার বিমান বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিমান চালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল টিবেটস-এর নেতৃত্বে '৫০৯ তম কম্পোজিট গ্রুপ' নামে পরিচিত বৈমানিকদের একটি বিশেষ দল ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই চূড়ান্তভাবে গঠন করা হয়ে গিয়েছিল। ছক অনুসারে ১৯৪৫ সালের জুন মাসে উক্ত ৫০৯ গ্রুপের বৈমানিকদের টিনিয়ানে নিয়ে আসা শুরু হয়েছিল।

১৬ জুলাই যখন পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষা করা হল তখন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বার্লিন নগরীর পটসডাম নামে পরিচিত শহরতলিতে বৃটিশ প্রধামন্ত্রী চার্চিল ও রাশিয়ার কর্ণধার স্ট্যালিনের সাথে বৈঠক করছিলেন। ২৬শে জুলাই 'পটস্‌ডাম ডিক্লারেশন' সেই বৈঠকের দলিল প্রকাশ করা হল এবং তাতে বলা হল, 'আমরা জাপান সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, এই মুহূর্তে সমস্ত জাপানী বাহিনী মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করুক। অন্যথায় জাপানের ভাগ্যে আছে অতি নিকটবর্তী এক ভয়াবহ ও সর্বাত্মক ধ্বংস।' এই ভয়াবহ ও সর্বাত্মক ধ্বংস বলতে কি বোঝায় তা তখন কেবল ট্রুম্যান ও চার্চিলের জানা ছিল।

ট্রুম্যান ও স্ট্যালিনের মধ্যে এই বোঝাপড়া হয় যে, রাশিয়া ও আমেরিকার মিলিত বাহিনী ১১ই নভেম্বর জাপান আক্রমণ করবে। কিন্তু এতে অসুবিধা ছিল এই যে এর বদলে রাশিয়া কোন বাড়তি সুবিধা দাবি করলে ট্রুম্যানের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না। এই দিক থেকে বিচার করে ট্রুম্যান পরমাণু বোমা দিয়ে জাপানকে কাবু করতেই বেশি সঙ্গত বলে মনে করলেন। এ ছাড়া স্ট্যালিনকে ভয় খাইয়ে দেবার ইচ্ছাও তার মনে ছিল। কাজেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ অগ্রসর হতে থাকল। যে ২৬শে

জুলাই পট্‌স্‌ডাম দলিল প্রকাশ করা হয়, সেই একই দিনে মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ ইন্ডিয়ানাপোলিস 'লিটন বয়'-এর বিভিন্ন অংশ টিনিয়ান দ্বীপে বয়ে নিয়ে গেল।

পরের দিন ২৭শে জুলাই, পট্‌স্‌ডাম দলিল জাপানে পৌঁছালে জাপানের মন্ত্রীসভায় তা নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হল। শেষ পর্যন্ত সমর মন্ত্রী কোরোচিকা আনামির কথাতেই সবাই সায় দিল যে, আত্মসমর্পণ করার চাইতে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাই অনেক বেশি সম্মানের কাজ হবে। পর দিন ২৮শে জুলাই, প্রধানমন্ত্রী কানতারো সুজুকি একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করলেন যে, জাপ-মন্ত্রীসভা পট্‌স্‌ডাম দলিলকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্তই বেছে নিয়েছে। ইতিমধ্যে ২৭শে জুলাই 'ফ্যাট ম্যান' অংশগুলিও টিনিয়ানে পৌঁছে গিয়েছে।

আমেরিকার কাছে যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে জাপান কোনমতেই পট্‌স্‌ডাম দলিল্ মেনে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়, তখন আমেরিকার সমর মন্ত্রী (War Secretary) হেনরী এল স্টিমসন চূড়ান্ত নিঃস্পত্তির জন্য ট্রুম্যানকে তার বার্তা পাঠালেন। পট্‌স্‌ডাম থেকে ট্রুম্যান তার জবাবে জানালেন, "Suggestion approved. Release when ready" অর্থাৎ পরামর্শ অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলেই ফেলে দিও।

সামরিক গুরুত্ব অনুসারে ৪টি শহরকে পরমাণু বোমা ফেলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল, আর এগুলো হল, (১) হিরোশিমা (২) কোকরা, (৩) নাগাসাকি ও (৪) নিগাতা। ট্রুম্যানের অনুমোদনের খবর মিনিয়ানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে ১লা আগস্টই বোমা ফেলা হয়ে যেত। কিন্তু ১লা আগস্ট এক বিশাল সামুদ্রিক ঝড় (Typhoon) জাপানের দিকে এগিয়ে আসে এবং আবহাওয়া বিমান চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ঝড় কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হতে ৫ তারিখ হয়ে গেল। যে B-29 বিমানটিতে লিট্‌ল্ বয় কে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল টিবেট্‌শ্, নিজের মায়ের নামে, তার নাম রাখলেন 'এনোলা গে" (Enola Gay)। টিবেট্‌শ্ নিজে এনোলা গেতে চাপলেন এবং এছাড়া আরও ৬টি B-29 বিমান এবং মোট ১১ জন বিমান চালকের দলটি লিট্‌ল্ বয়কে নিয়ে ৬ই আগস্ট, সোমবার রাত ২টা ৪৫ মিনিটে টিনিয়ান ত্যাগ করল।

জাপানের সর্ববৃহৎ দ্বীপ হন্‌সুর দক্ষিণ প্রান্তে, পশ্চিম উপকূলে হিরোশিমার অবস্থিত। ১৯৪২ সালে এর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের কারণে অনেক লোক অধিকতর নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত হবার ফলে ১৯৪৫ সালে লোকসংখ্যা কমে দাঁড়ায় প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার। এর মধ্যে ৪৩ হাজার সামরিক বাহিনীর লোক ও প্রায় ২০ হাজার কোরিয়ার শ্রমিক ছিল। তিন দিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা হিরোশিমা শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে "ওটা" (Ota) নদীর ৬টি উপনদী। এই শহরেই অবস্থিত ছিল জাপ-সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান কার্যালয়।

উপরিউক্ত ৭টি বি ২৯ বিমানের দলটি বেলা ৭টা ৯ মিনিটে হিরোশিমার আকাশ সীমায় পৌঁছায় ও যথীরীতি বিমান আক্রমণের সংকেত বেজে ওঠে। কিন্তু কোন আক্রমণ না করে চলে যাওয়ায় ৭টা ৩১ মিনিটে বিপদ কেটে যাবার সংকেত বাজানো হয়। এর প্রায় ৪৫ মিনিট বাদে ঘনিয়ে অসে সেই চূড়ান্ত ধ্বংসের কাল। ৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ হিরোশিমার প্রায় ৫০০ ফুট উপরে দেখা দেয় মৃত্যুদূত এনোলা গে এবং সাহায্যকারী আর দুটো বিমান। হিরোশিমা বেতারের ঘোষক বলে ওঠে "তিনটি শত্রু বিমান এবং এই কথা বলতে বলতেই তার স্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। তার আগেই ঘটে যায় সেই নারকীয় বিপর্যয়।

ঠিক বেলা ৮টা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড সময়ে এনোলা গে থেকে লিট্‌ল্ বয়কে ফেলা হয় এবং এর ঠিক ৪৩ সেকেণ্ড পরে মাটি থেকে ৫৮০ মিটার উচ্চতায় বিস্ফোরণ ঘটে। এক পলকের জন্য দেখা যায় চোখ ধাঁধানো নীলাভ সাদা রঙের ঝলকানি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চরম তাপ। বোমাটা যেখানে ফাটে তারঠিক নীচে মূল কেন্দ্র বা hypo centre এর তাপমাত্রা মুহূর্ত্তের মধ্যে ৩০০০ থেকে ৪০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছায়। মূল কেন্দ্র থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে তাপমাত্রা উঠে যায় প্রায় ৫৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কাজেই এই দেড় কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে যা কিছু ছিল তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বা কালো ধোয়া বা ছাইয়ের পিণ্ডে পরিণত হয়। মানুষজন যে যেই অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থাতেই কালো মমীতে পরিণত হয়। এর থেকে দূরে দূরে যারা ছিল তাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল আরও বেশী অভিশাপ। তীব্র গরমে তাদের গায়ের চামড়া পুড়ে যায়, শরীরের জল বাষ্প হয়ে যাবার ফলে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় তারা "মিজু মিজু" বা জল জল বলে কাতরাতে থাকে। বোমার বিস্ফোরণের সময় যারা আলোর ঝলকানির দিকে তাকিয়েছিল, প্রচণ্ড তাপে তাদের অনেকের চোখ গলে যায়। সেই সময় হঠাৎ কোথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বড়বড় কালো মাছি উড়ে আসে ও আহত লোকদের গায়ে ডিম পারতে থাকে, কিন্তু মাছিগুলোকে তাড়ানোর মত সামান্য শক্তিও আর তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।

আলো ও তাপের ঝলকানির পরই শুরু হয় বাতাসের ঝড় বা Shock Wave যার সর্বোচ্চ গতিবেগ দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৩.২ কিলোমিটার। বিস্ফোরণের সময় আকাশে ব্যাঙের ছাতার মতো সে মেঘের সঞ্চার হয় কিছুক্ষণ পরে তার থেকে শুরু হয় মার্বেলের মত বড় বড় আকারের কালো জলের ফোটার বৃষ্টি বা black rain । হিরোশিমার শহরতলীতে কিছু জায়গায় আলুর ক্ষেত ছিল। পরে দেখা যায় যে মাটির নীচে সব আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। লিট্‌ল বয় এর বিস্ফোরণের তীব্রতার পরিমাণ ছিল ১২.৫ হাজার টন ট্রাইনাইট্রোটলুইন বা টি এন টি'র সমান। বাতাসের শক্ ওয়েভে হিরোশিমার

মোট ৭৬,০০০ বাড়ীর মধ্যে ৭০,০০০ বাড়ী ভেঙে পড়ে। প্রায় ৪৮,০০০ বাড়ী একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। বিস্ফোরণের দিন প্রায় ১ লক্ষ লোক মারা যায় এবং পরে আহতদের মধ্যে যারা মারা যায় তাদের হিসাব করে বছরের শেষে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার।

ছোট খাট বোমার বিস্ফোরণের পর আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো যায়, দমকলের সাহায্যে আগুন নেভানো সম্ভব হয়। কিন্তু ধ্বংস সেখানে সম্পূর্ণ ও ব্যাপক, সেখানে হাতপাতালে, দমকল, ডাক্তার, নার্স সবাই মারা পড়েছে, তখন কেই বা আগুন নেভাবে আর কেই বা আহতদের সেবা করবে। ঐ দিন হিরোশিমার সমস্ত হাসপাতাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, শতকরা ৯০ জন নার্স ও ৯০ জনের মধ্যে ৬৫ জন ডাক্তার মারা যায় এর পর যা বাকী থাকল তা হল পারমাণবিক বিকিরণের ফলে রক্তাল্পতা, ক্যান্সার ও আরও নানারকম ভোগান্তি, যার জের আজও চলছে।

পট্স্ডাম থেকে দেশে ফেরার পথে "গোজটা" যুদ্ধজাহাজে বসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হিরোশিমায় বোমা ফেলার খবর শুনলেন। ঐ দিনই রাতে ওয়াশিংটন থেকে ঘোষণা করা হল, "It is an atomic bomb. It is a harnesing of the basic power of the Universe–the force from which the sun draws its powers, has been lossed against these who brought the war to the Far West."। সেইদিন ট্রুম্যান তার ডায়েরীতে লিখলেন, "It is really a good thing for the world that Hitler's crowd or Stalin's men did not discover the Atomic Bomb"।

হিরোশিমার খবর যখন টোকিওর বড় সামরিক কর্তাদের কাছে পৌঁছালো তখন তারা বিশ্বাসই করতে চাইল না যে এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে পারে। জাপানী বেতার কিন্তু ঘোষণা করতে থাকল যে, শত্রুপক্ষ এক নতুন ও সাংঘাতিক ধরণের বোমা হিরোশিমাতে ফেলেছে। সেই দিনই জাপানী মন্ত্রীসভা ও সামরিক কর্তাব্যক্তিদের জরুরী বৈঠক বসল। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনের ঘোষণাও জাপানে পৌঁছে গেছে। তখন সমর মন্ত্রী কোরিচিকা আনামী বললেন যে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই সঠিক কাজ হবে কারণ সম্ভবত আমেরিকানদের হাতে ঐ একটাই বোমা ছিল। কাজেই ওয়ার সেক্রেটারী জেনারেল গ্রোভ্স্ এর অনুমান মত আর একটা বোমা ফেলে জাপানকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হল যে, ঐ রকম একাধিক বোমা আমেরিকার আছে।

৮ই আগস্ট রাত ৩টা ৪৭ মিনিটে ৫০৯ গ্রুপের অন্য আরেকটা B-2 বিমান ফ্যাট ম্যানকে নিয়ে দ্বিতীয় লক্ষ্য কোকুরা শহরের দিকে রওনা দিল। কিন্তু কোকুরার কপাল ভাল যে সেদিন তার আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল বলে লক্ষ্য স্থির করা গেল না। বিমানটি

তেলের জন্য নিকটবর্তী আমেরিকান ঘাঁটি ওকিনাওয়া দ্বীপে অবতরণ করল। ইতিমধ্যে মেজর চার্লস্ সুইনীর কাছ থেকে বিকল্প লক্ষ্য নাগাসাকিতে বোমা ফেলার নির্দেশ পৌঁছে গেছে। এতে একদিন দেরী হয়ে গেল এবং ৯ই আগস্ট বেলা ১১টা ২ মিনিটে ফ্যাট ম্যানকে নাগাসাকিতে ফেলা হল। হিরোশিমার মত একই ঘটনা নাগাসাগিকে ঘটল এবং ৭৪,০০০ লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। নাগাসাকির মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে একটা পাহাড় চলে গেছে। তাই হিরোশিমার মত ব্যাপক ধ্বংস এখানে হতে পারল না, পূব দিকের উরাকামি উপত্যকাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল। ২২ কিলোটন টি এন টি ক্ষমতা সম্পন্ন ফ্যাট ম্যান নাগাসাকির প্রায় ৫০০ মিটার উপরে বিস্ফোরিত হয়। লিট্‌ল বয় থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন হবার ফলে নাগাসাকিতে ধ্বংসের ব্যাপকতা আরও বেশী হত যদি হিরোশিমার মত তা সমতল হত। বিস্ফোরণের ফলে হিরোশিমার সব গাছ উপরে পরে ছিল, কিন্তু নাগাসাকিতে মনে হল কেউ যেন গাছগুলোক টেনে ছিড়ে ফেলেছে। ধ্বংসের তীব্রতা দেখে মনে হল যেন কোন দৈত্য সমস্ত শহরকে দলে পিষে সমান করে দিয়েছে। ঐ দিনই (৯ই আগস্ট) ১৬ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাশিয়া জাপান অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। ঐ দিনই টোকিওতে, সম্রাটের প্রাসাদের একটি কক্ষে জাপানের সব মন্ত্রী ও সামরিক কর্তাদের জরুরী সভা বসল। টানা ৮ ঘণ্টা তর্ক বিতর্কের পরও কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল না। প্রধান মন্ত্রী সুজুকি, বিদেশমন্ত্রী শিগেটোরি টোগো ও নৌবাহিনী প্রধান মিৎসুমাশা ইওয়ানি আত্মসমর্পণ ও শান্তির পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু সমর মন্ত্রী ও অনামী আত্মসমর্পণের চাইতে পরাজয় ও মৃত্যু বেশী সম্মানজনক বলে দাবী করতে থাকলেন। তিনি বোঝাতে থাকলেন, "কর্তব্য পর্বতের মত ভারী, কিন্তু মৃত্যু পালকের চাইতেও হাল্কা।" রাত ১১টার পর প্রধান মন্ত্রী সুজুকি এ ব্যাপারে সম্রাট হিরোহিতের মতামত নেবার প্রস্তাব দিলেন এবং সম্রাট সুজুকির মতকেই যুক্তিযুক্ত বলে মত প্রকাশ করলেন। সেই অনুসারে ১৫ই আগস্ট প্রথাগত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

(২)

গত ১৯৯৫ সালের ২৯শে মে টোকিওর 'জুদোকন হল'এ জাপানের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল 'লিবারাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (LDP)-র নেতারা ও দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এক সভার আয়োজন করে। এই সভা সম্পর্কে LDP জানায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার সে পবিত্র দায়িত্ব জাপান মাথায় তুলে নিয়েছিল তার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য জাপান ২২টি এশীয় দেশের প্রধানমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র ১৫টি দেশের জাপানে

নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতরাই ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, যুদ্ধের সময়ে যে সব দেশ জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, বা জাপানের ভাষায় যে সব দেশে জাপ-সৈন্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র সংগ্রাম করেছিল, সেই রকম কোন একটি দেশের প্রতিনিধিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলনা। পক্ষান্তরে উক্ত সভা ও অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে কোরিয়ার ছাত্ররা সিওলের জাপানী দূতাবাস অবরোধ করে ও জাপানী সাংস্কৃতিক ভবনে বোতল বোমা ছোড়ে। কোরিয়ার ছাত্ররা এই দাবী তুলে স্লোগান দিতে থাকে যে কোরিয়া দখল করার পর থেকে জাপান কোরিয়া জনগণের উপর যে উৎপীড়ন অত্যাচার চালিয়ে ছিল তার জন্য জাপান সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে।

যে সমস্ত দক্ষিণ পন্থী এল.ডি.পি. নেতা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সেসুকো অকুনো যিনি মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এশিয়ার কোন দেশ দখল করে নি, শুধু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করেছে মাত্র। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শেগোটো নাকানো যিনি মনে করেন যে ১৯৩৭ সালের ''নানজিং গণহত্যা'' শুধু রটনা মাত্র। আরও একজন প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী মিচিও ওয়াতানাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন যিনি মনে করেন যে ১৯১০ সালে কোরিয়া দখলে করে জাপান ঠিক কাজই করেছিল।

প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জাপানী আগ্রাসনকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে এশীয় দেশগুলোকে মুক্ত করার ও পবিত্র সংগ্রাম বলে চালাতে চেষ্টা করার সাবেকী নেতাদের প্রচেষ্টা খুবই দুরভিসন্দিপূর্ণ। উপরন্তু এ যুক্তি ধোপে টেকে না কারণ, ১৯১০ সালে সে যখন কোরিয়া দখল করে এবং ১৯৩৭ সালে চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে তখন চীন বা কোরিয়া কেউই পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের কবলে ছিল না। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, ঐ সময় চীনের নানজিংএ জাপ-বাহিনী যে ব্যাপক গণহত্যা চালায় ও ৩ লক্ষের বেশী অসামরিক লোককে নির্বিচারে হত্যা করে, সে ঘটনা আজও জাপানের ইতিহাস বইতে লেখা হয় না। কোন কোন বইতে ফুট নোটে দু এক কথা লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে আজও কট্টর দক্ষিণপন্থী নেতারা মনে করেন যে, সেই সময় জাপানী সেনারা যে সমস্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ করেছিল তা মেনে নেওয়া উচিত নয় কারণ তাতে পূর্বপুরুষদের নিন্দা করা হবে। সব থেকে বড় কথা হল খোদ সাম্রাটেরই নিন্দা করা হবে কারণ সম্রাটের নির্দেশেই সেনাবাহিনী ঐ সমস্ত অন্যায় করেছিল।

এই সব কট্টরপন্থী নেতারা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে জাপানের জনগণের একটা বিরাট অংশ আজও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে একমাত্র জাপানী বা ইয়ামাতো জাতিই এশিয়ার

অন্যান্য জাতিগুলো থেকে বুদ্ধিবৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সমস্ত দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ এবং এই কারণে একমাত্র তাদেরই অধিকার আছে এশিয়ার প্রভুত্ব করার। এ বিশ্বাস এত দৃঢ়মূল যে প্রায় প্রত্যেকটি জাপানী মনে করে যে এশিয়ার প্রভুত্ব করার অধিকার তাদের জন্মগত। তারা আরও বিশ্বাস করে যে তাদের সম্রাট সূর্য দেবী বা আমাতেরাসু-র প্রত্যক্ষ বংশধর এবং সেই কারণে দৈবী গুণ ও ক্ষমতা সম্পন্ন। কাজেই এশিয়ার সম্রাট হবার পক্ষে তিনিই যোগ্য ব্যক্তি।

জার্মানীর নাৎসীদের জাতিদম্ভ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাদের ইহুদী নিধন ও নির্যাতনের কথা এত প্রচারিত হয়েছে যে, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের লোকের কাছেই তা আর অজানা নেই। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে জাপানীদের জাতিদম্ভ ও যুদ্ধের সময় তাদের হীন ও গর্হিত কাজ খুব কমই প্রচারিত হয়েছে। চীনের যেখানেই তারা পা ফেলেছে সেখানেই তারা নির্বিচারে গণ্যহত্যা চালিয়েছে। কোরিয়া দখল করার পর থেকে লক্ষ লক্ষ কোরিয় যুবক যুবতীকে জাপানে ক্রীতদাসের মত খাটিয়েছে। এদের নিষ্ঠুরতার একট উদাহরণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। ১৯৪২সালে আমেরিকার কবল থেকে ফিলিপাইন দখল করার পর ফিলিপাইনের উত্তরে ছোট্র দ্বীপ "বাতাল"-এ তারা ১০,০০০ ফিলিপিনো ও ১০০০ আমেরিকান যুদ্ধবন্দীকে জল খাবার না দিয়ে ৬ দিন ক্রমাগত মার্চ করতে বাধ্য করে, যার ফলে সবাই মারা যায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী কয়েক গজ পরপর একজন ঢলে পড়তে থাকে কিন্তু মার্চ বন্ধ হয় না। এই নিষ্ঠুর ঘটনা "বাতাল ডেথ মার্চ" নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

নাৎসী সৈন্যরা অনেক অত্যাচার ও হত্যা করেছে ঠিকই, কিন্তু জাপানের মত দলবদ্ধভাবে তারা বিজিত দেশের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে তা শোনা যায় নি। জাপান এশিয়ার যে সব দেশ দখল করেছিল সেইসব দেশ, বিশেষ করে কোরিয়া, তাইওয়ান ও ফিলিপাইন থেকে লক্ষ লক্ষ অল্পবয়সের মেয়েদের ধরে এনে সামরিক বাহিনীর পতিতালয় বানিয়েছিল। এই সব পতিতালয়কে বলা হত "কম্‌ফোর্ট স্টেশন" এবং ঐ সব হতভাগিনী মেয়েদের বলা হত "কম্‌ফোর্ট উইমেন"। গত ১৯৯২ সালে জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী ইশোয়াকি ইয়োশিমি সরকারী দলিল দস্তাবেজ যা পাওয়া গেছে তা ঘেটে আবিষ্কার করেন যে প্রায় ২ লক্ষ কম্‌ফোর্ট উইমেনকে কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েটনাম ও ব্রহ্মদেশ থেকে ধরে আনা হয়েছিল যাদের মধ্যে প্রায় ৮০০ জন আজও জীবিত। তবে বিশেষজ্ঞদের মত হল, প্রকৃত সংখ্যা এর থেকে বেশ কয়েক গুণ বেশী।

ব্যাপারটা দুনিয়ার কাছে অজানাই থেকে যেত যদি না এক কালের কম্‌ফোর্ট ওম্যান, কোরিয়ার শ্রীমতী কিম্ সাং হি, যার বর্তমান বয়স ৭৩ বছর, লজ্জা শারমের মাথা

খয়ে ১৯৯১ সালে জাপান সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করতেন। এতে জানাজানি হয়ে যাবার ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশই জাপান সরকারকে ধিক্কার জানায়। এতে আরও জানা যায় যে, যে সব কম্‌ফোর্ট উইমেন আজও জীবিত আছেন তারা তৎকালীন শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের ফলে নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আজ অর্থকষ্টে অত্যন্ত হীন জীবন যাপন করছেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে এটা কিছু সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কোন নারী ধর্ষণের ঘটনা নয়। পক্ষান্তরে জাপানী সরকার ও সেনাবাহিনীর মদতে, সর্বোপরি সম্রাট হিরোহিতোর অনুমোদনক্রমে সুপরিকল্পিতভাবে গণ নারী ধর্ষণের ঘটনা।

সব থেকে বড় কথা হল, আজকের দক্ষিণপন্থী এল্ ডি পি নেতারাও এর স্বপক্ষে সাফাই গাইতে ব্যস্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী সিসুকো ওকুনো ১৯৯৫ সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘৃণ্য মত ব্যক্ত করেন যে, আদতে ঐ সব মেয়েরা পতিতার পেশাতেই নিযুক্ত ছিল। হয়তো জাপানী সেনাবাহিনী দয়া করে সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করতে তাদের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু সাংবাদিকরা যখন পাল্টা প্রশ্ন করেন যে, তা হলে জাপানী পতিতাদের জন্য কেন সে সুযোগ দেওয়া হল না? তখন সিসুকো ওকুনোর পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। যাই হোক, ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে, জাপানের আত্মসমর্পণের ৫০ বর্ষ পূর্ত্তির প্রাক্কালে, তৎকালীন সমাজতন্ত্রী দলের প্রধানমন্ত্রী শ্রী তোমিইচি মুরায়ামা এই অপরাধ স্বীকার করেন ও জীবিত প্রত্যেক কমফোর্ট ওম্যানকে ১৯,০০০ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার কথা ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, শ্রীমুরায়ামা অপরাধ স্বীকার করে এবং দুঃখপ্রকাশ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন এবং এই ঘটনার জন্য যে সম্রাট হিরোহিতোই মূলতঃ দায়ী তা উচ্চারণ করেন নি। কারণ ঐ কথা বললে অবশ্যই তাকে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিতে হত। এর স্বপক্ষে বলা যায় যে, ১৯৯০ সালে নাগাসাকির মেয়র শ্রী হিতোসি মোতাশিমা যখন প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করেন যে সম্রাটের উচিত যুদ্ধের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব স্বীকার করা, তখন তাকে আততায়ীর গুলির আঘাতে জখম হতে হয়। এছাড়াও ১৯৯৩ সালে বিরোধী দলের প্রধানমন্ত্রী যখন এই মত ব্যক্ত করেন যে, জাপান সরকারের উচিত যুদ্ধকালীন অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তখন এল ডি পি দলের নেতারা বলেন যে তাকে খুন করা উচিত। সেই কারণে শ্রী মুরায়ামা তার বক্তব্যের মধ্যে সাবধানে এ কথাটাও যোগ করেছেন যে, যুদ্ধের কোন ব্যাপারেই সম্রাট হিরোহিতো দায়ী নন, যদিও বাস্তবিক পক্ষে সম্রাটই যুদ্ধের মূল পরিচালিক ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে সব থেকে সুখের কথা হল এই যে, কম্‌ফোর্ট উইমেনদের তালিকায়

কোন ভারতীয় মহিলার নাম নেই কারণ জাপ-সেনা ভারতের মাটিতে পা রাখার সুযোগ পায় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুই শরিক জাপান ও জার্মানী, দুজনেই জাতিদম্ভের দোষে দুষ্ট হলেও জাপানের জাতিদম্ভ অনেক বেশী উগ্র ও দৃঢ়মূল। নাৎসী দলই জার্মানীতে আর্যতত্ত্ব ও জাতি হিসাবে জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব আমদানী করে এবং নাৎসীদের পতনের সঙ্গে তার অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই আজকের জার্মানীর বেশিরভাগ লোকই নাৎসী দল ও তার নেতা হিটলারকে ভাল চোখে দেখে না, মনে করে অনর্থক ভাবে যুদ্ধ বাধিয়ে হিটলার জার্মানীর ক্ষতিই করেছে। এর জন্য দেশের লোকদের অনেক দুঃখ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে জাপানীদের মধ্যে এমন কোন মনোভাব নেই। তারা এটাও মানতে নারাজ যে বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান আগ্রাসী নীতি অবলম্বন করেছিল এবং এশিয়ার অন্যান্য জাতির ওপর অত্যাচার, উৎপীড়ন চালিয়েছিল।

আজকের জার্মানীতে নাৎসি বিরোধী অনেক আইন কানুন হয়েছে ও নাৎসী নীতির সমর্থকদের দমন করার জন্য জেল, হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলেও "এ্যামনেস্টী ইন্টারন্যাশনাল" মনে করে। পক্ষান্তরে পুরাণো জাতিদম্ভের আদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিকরাই আজকের জাপানের ক্ষমতায় বসে আছেন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রী হাসিমোতোর ব্যাপারেও ঐ একই কথা বলা চলে এবং তার বাবাও এককালে কট্টর জাতিদম্ভের আদর্শে বিশ্বাসী এল ডি পি দলের সরকারে মন্ত্রী ছিলেন। এই সব রাজনীতিকরা আজও বিনা বাধায় সনাতন জাপানী জাতিদম্ভের আদর্শ প্রচার করে বেড়াচ্ছেন এবং ভোটে জিতে সরকার গড়ছেন।

জার্মানী আত্মসমর্পণ করার পর হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের ওপর বহু অত্যাচার হয়। তাদের ধন সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বিতাড়িত করা হয় এবং নির্বিচারে হত্যা ও নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। কিন্তু জাপান আত্মসমর্পণ করলে কোন জাপানীকে ঐ ধরণের কোন অত্যাচারের শিকার হতে হয় নি। এ ছাড়া, যুদ্ধের পর জার্মান যুদ্ধপরাধীদের ন্যুরেনবার্গ ট্রায়ালের মত বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং শাস্তি ভোগ করতে হয়। (অতি সম্প্রতি ইটালীতে গা ঢাকা দেওয়া একজন নাৎসী সেনাবাহিনীর কর্তাকে পুলিশ খুঁজে বের করে ও সঙ্গে সঙ্গে আটক করে।) কিন্তু সেই তুলনায় জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের কোন শাস্তি ভোগ করতে হয় নি বললেই চলে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা প্রয়োগ করার জন্য সমস্ত বিশ্ব তখন জাপানীদের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং আমেরিকার প্রতি ধিক্কার জানাতে থাকে। কাজেই ঐ অবস্থায় টোকিওতে জাপানী যুদ্ধপরাধীদের যে বিচার হয় তা বিচারের প্রহসন মাত্র। বিচার না বলে তাকে সাধারণ ক্ষমা (general mercy)

বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে সম্রাট হিরোহিতো কোন অপরাধেই দোষী সাব্যস্ত হলেন না। আগের মতোই সম্রাটের আসনে বহাল থাকলেন। পক্ষান্তরে হিটলার আত্মহত্যা না করলে তার ভাগ্যে কি হোত তো সহজেই অনুমান করা চলে।

আজও প্রতি বছর ৬ই আগস্ট যখন বিশ্ব জুড়ে হিরোশিমা দিবস পালন করা হয় তখন সাধারণ মানুষও জাপানের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে এবং আমেরিকার নিন্দা করে। আমেরিকার নিন্দা অবশ্যই করা উচিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জাপানের অতি উগ্র জাতিদম্ভ, বিশ্বের অন্যান্য জাতির মানুষের প্রতি তাদের ঘৃণা, যুদ্ধকালীন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, বহু নরহত্যা, নারী জাতির প্রতি অত্যাচার ইত্যাদি আরও বহু জঘন্য অপরাধকেও আমাদের স্মরণ করা উচিত। আরও মনে রাখা উচিত যে এই উগ্র জাপানী জাতি দম্ভ আবার বিশ্বের বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে।

ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও দেশবাসীর কর্তব্য

পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটি যুদ্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এদের ফলাফল হয়েছিল খু
সুদুরপ্রসারী। এই যুদ্ধ তিনটি হল ৬২৪ খৃষ্টাব্দে আরবের বদর যুদ্ধ, ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশ
যুদ্ধ এবং ১৮১৫ খৃস্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধ। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এে
মধ্যে পলাশী যুদ্ধের গুরুত্ব সর্বাধিক কারণ এই যুদ্ধে জয়ী হবার ফলেই ভারতে ইংর
আধিপত্যের পথ সুগম হয়। এর ফলেই ভারতকে কেন্দ্র করে, ভারতের সম্পদ লুঠ ক
বৃটিশ পরবর্তীকালে তার বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়। পলাশ
যুদ্ধে সাহায্য করার পুরস্কার হিসাবে বৃটিশ যে বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন বিলাতে নিয়ে যায়
দিয়েই সেখানে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়। পলাশী যুদ্ধের উপঢৌকন হিসাবে বৃটিশ প্রথমে ২
পরগণার জমিদারী লাভ করে এবং এই রাজস্ব দিয়েই সে একটা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন ক
শক্তিশালী হবার সুযোগ পায়। এই সৈন্যবাহিনীর জোরেই তারা রপরবর্তীকালে মীরকাসিম
পরাজিত করে সমস্ত সুবা বাংলা দখল করে।

এ কথা হয়তো সকলেরই স্মরণ আছে যে পলাশীর প্রান্তরে নবাব ও ইংরাজের সৈন্যসং
ছিল যথাক্রমে ৫০ হাজার ও ৩ হাজার এবং কিছু দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে এব
যুদ্ধের প্রহসনের মধ্য দিয়ে ইংরাজরা জয়ী হয়। দেশদ্রোহীদের এই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রমূলে ছি
ধনকুবের জগৎশেঠের বংশ। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা আর্থিক কবলে জগৎশেঠের কাছে আব
থাকার ফলে তার ইচ্ছানুসারেই সমস্ত ব্যাপারটা অনুষ্ঠিত হয়। এমন কি স্বয়ং সিরাজ উদ্দৌ
মতিঝিলে প্রাসাদ নির্মাণের ব্যাপারে জগৎশেঠের কাছে ঋণী থাকার দরুণ সমস্ত চক্রান্ত বুঝ
পেরেও বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি কোন রকম কার্যকর ভূমিকা নিতে অসমর্থ হন। পরে মীরকাশি
নবাব হয়ে জগৎশেঠের বংশকে উপরিউক্ত জঘন্য কাজের শাস্তি হিসাবে, সমূলে বিনাশ করে

তবে এ কথাও সত্য যে, এই সব চক্রান্তকারী দেশদ্রোহীদের পক্ষেও তখন এটা বুঝে ও
সম্ভব হয় নি যে পলাশীর যুদ্ধের মত একটা ছোট যুদ্ধের ফলাফলও এত ভয়াবহ ও সুদূরপ্রস
হতে পারে। তবে পলাশীর যুদ্ধ যত ছোটই হোক না কেন, যুদ্ধের প্রহসনই হোক না কেন,
কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, একটা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বিগত দু'শ বছরের ইংর
অধীনতার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, তার চেয়েও নিঃশব্দে, ম
একটা সই এর মাধ্যমে ভারত আবার পরাধীন হতে চলেছে এবং তখনকার মত আজ
কয়েকজন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্র করে সেই পরাধীনতাকে নিয়ে আসছে। এ

বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে তিনজন প্রধান। একজন অন্ধ্রের, একজন পাঞ্জাবের এবং তৃতীয়জন মীরজাফরের দেশ এই বাংলার অধিবাসী।

এই দেশদ্রোহীরা দিনরাত এই মিথ্যা প্রচার করে চলেছে যে, তারা ডাঙ্কেল প্রস্তাবের শুধু সম্মানজনক ও দেশের পক্ষে কল্যাণকর শর্তগুলোকেই মেনে নেবে এবং বাদবাকীগুলো বর্জন করবে। অথচ ডাঙ্কেল প্রস্তাবের প্রথম কথাই হল, এটা একটা সম্পূর্ণ প্যাকেজ প্রোগ্রাম। মানতে হলে এর পুরোটাই মানতে হবে এবং বর্জন করতে হলে পুরোটাই বর্জন করতে হবে। মাঝামাঝি কোন রাস্তা খোলা নেই। এই বিশ্বাসঘাতকরা অরও একটা কথা প্রচার করছে এবং বলছে যে, ডাঙ্কেল প্রস্তাব মেনে নিলে দেশের মঙ্গল হবে।

দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়বে, সম্পদে দেশ উপছে পড়বে। একদম ক্ষুধার্ত নেকড়ে একটা হরিণের কাছে উপস্থিত হলে একমাত্র ধূর্ত শৃগালদের পক্ষেই বলা সম্ভব যে তারা উপকার করতে এসেছে এবং একমাত্র গর্দভদের পক্ষেই তা বিশ্বাস করা সম্ভব। এই সব ডাহা মিথ্যা বলার জন্যঐ সব শৃগালেরা বিদেশের কাছ থেকে কত উৎকোচ পেয়েছে তা একমাত্র তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব। এদের পূর্বসূরীরা এককালে ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশকে খণ্ডিত করেছে। আজ এরাই আবার অর্থের লোভে দেশকে বিদেশীর কাছে বিক্রী করে দেবার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

ভারতের ইতিহাস এটাও বলে যে, পলাশী যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই গোটা ভারত বৃটিশের পদানত হয়ে যায়নি। এর পর তারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করছে। বর্তমান ডাঙ্কেল প্রস্তাবের পদ্ধতিও অনুরূপ। এর শর্তগুলির কোনটা এক বছর, কোনটা পাঁচ বছর, কোননা বা দশ বছর পর থেকে প্রযোজ্য হবে এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদেশীদের হস্তগত হবে। আর এই অধীনতার কার্যক্রমের সাথে সাথে পরিকল্পনা মাফিক আসতে থাকবে পাশ্চাত্য বিকৃত রুচির সংস্কৃতি; যার দ্বারা চালিত হয়ে ভারতের মানুষ ধীরে ধীরে পশুতে পরিণত হবে এবং প্রতিবাদ করার ভাষা ও শক্তি হারিয়ে ফেলবে।

এক কালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের নীল চাষের বীভৎসতার কথা হয়তো সকলেরই স্মরণ আছে। কিন্তু তা যতই বীভৎস হোক না কেন, সীমিত ছিল বাংলা ও বিহারের কিছু অংশে। কিন্তু বর্তমান ডাঙ্কেল প্রস্তাবেরর মধ্য দিয়ে নীল চাষের সে ভয়াবহতা সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হতে চলেছে। নীল চাষের সময় শারীরিক অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে চাষীদের বাধ্য করা হত ধানের বদলে নীলের চাষ করার জন্য। এর ফলে বহু গরীব চাষী না খেতে পেয়ে মারা পড়ত। জমি জায়গা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হত। আজ পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে গেছে। চাষীদের উপর শারীরিক নির্যাতন চালালে সে বর্বরতার খবর সবাই জেনে যাবে। তাই অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে চুক্তি, আইন, বিচার ইত্যাদি আপাত নির্দোষ, সভ্য রাস্তা বেছে নেওয়া হয়েছে। নীলকরেরা যে কাজটা করেছিল বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে, সে কাজটাই এখন করা হবে বীজের পোটেন্ট, তার ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি ও আইনের সাহায্যে।

আজ চাষীভাইরা এ বছরের ফসলের কিছুটা অংশ রেখে দেন আগামী বছর বীজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু ডাঙ্কেল প্রস্তাব প্রযোজ্য হলে তাদের আর সে স্বাধীনতা থাকবে না। প্রত্যেক বছর তাকে আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানীগুলো থেকে পেটেন্ট করা উন্নত বীজ নিয়ে আসতে হবে এবং চাষ করতে হবে। ফসলের কিছু অংশ সে যদি পরের বছর বীজ হিসাবে ব্যবহার করে তবে সে হবে আইনের চোখে অপরাধী। এমন কাজ কেউ করলে সেই বিদেশী কোম্পানী তার নিজের দেশের (অর্থাৎ আমেরিকার) আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা করবে এবং আমাদের চাষীকে সেই বিদেশী আদালতে গিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে। যেহেতু আমাদের দেশের চাষীদের পক্ষে অত টাকা খরচ করে বিদেশে গিয়ে এবং সেখানকার উকিল লাগিয়ে মামলা করা সম্ভব হবে না, তাই ইচ্ছামত আদালতের রায় অনুযায়ী জমি জায়গা, হাল বলদ সব কব্জা করা যাবে।

এইভাবে চাষীদের সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা লুপ্ত হবে। বিদেশীরা যেই বীজ সরবরাহ করবে তারা সেই ফসলের চাষ করতেই বাধ্য হবেন। যতটা বীজ দেবে ততটাই চাষ করতে বাধ্য হবেন। এই ব্যবস্থা যখন আর একটু অগ্রসর হবে তখন চাষীরা তাদের জমি জায়গার অধিকার হারিয়ে উদ্বাস্তু হবেন এবং বদলে দেখা দেবে বিশাল বিশাল বিদেশী কোম্পানীর বিশাল বিশ্বাস চাষের খামার। আমাদের চাষীরা সেই সব খামারের ক্রীতদাসে পরিণত হবেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির দ্বারা চালিত ঐ সব খামারে তখন চলবে বেশী মুনাফা কামানোর জন্য যান্ত্রিক চাষ। উক্ত ফলনশীল বীজ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অত্যধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার, কীট নাশক ও জলের ব্যবহার। ফলে বর্তমান আমেরিকার মত বহু লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জমি অচিরেই তার স্বাভাবিক উর্বরতা হারিয়ে পরিত্যক্ত উর্বর মরুতে পরিণত হবে। যে সমস্ত বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার নিজেদের দেশে নিষিদ্ধ, তা যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়ে জল বাতাস দূষিত করবে এবং ভূ-গর্ভস্থ জল সম্পদ নিঃশেষে হবে। কৃষকদের একটা বিরাট অংশ বেকার হবে এবং এই ভাবে লুণ্ঠনের শিকার হয়ে দেশের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। এর পর কি হবে তা ভাববার কোন অবকাশ এই সব বিদেশী পশুদের নেই। তাদের দৃষ্টি শুরু বর্তমান লুণ্ঠন ও মুনাফার উপর। এইভাবে তারা নিজেদের দেশকে লুট করে তাকে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত করে ফেলেছে এবং তাই আমাদের মত দেশের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে বিদেশী অষুধের কোম্পানীগুলো আমাদের দেশের গাছ গাছড়া থেকে কি কি ওষুধ তৈী হতে পারে তার পেটেন্ট করে নিয়েছে। এক নিম গাছ থেকেই তারা ১৮টি ওষুধের পেটেন্ট বানিয়েছে। ডাঙ্কেল প্রস্তাব সই হলে ঐ সব নিজেদের দেশের গাছগাছড়া থেকে আমরা নিজেরা আর ঐ সব ওষুধ তৈরী করতে পারবো না। বিদেশী কোম্পানীগুলো গাছগাছড়া, শেকর বাকড়, সব নিজেদের দেশে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে তৈরী হয়ে আসা ওষুধ আমাদের চড়া দামে কিনতে হবে। এইভাবে প্রকারান্তরে তারা আমাদের দেশের গাছ গাছড়ার মালিক হবে। ঐ সব গাছে হাত দেবার অধিকারও আমাদের থাকবে না। এইভাবে তারা

তাদের ইচ্ছামত গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুপাখির যে সব নতুন নতুন প্রজন্ম ঘটাবে, তারাই তার মালিক হবে। ইতিমধ্যে বিদেশে আরও কিছু কিছু জিনিস দেখা দিয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বীজ নির্বাচন, কৃত্তিম প্রজনন, ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে ইচ্ছামত উচ্চ ও নিম্ন বুদ্ধিবৃত্তির মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। চিরকালের জন্য পদানত রাখার উদ্দেশ্যে ঐ সব বিদ্যা কাজে লাগিয়ে তারা যে ভারতবর্ষকে একটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দেশে পরিণত করার কাজে অগ্রসর হবে না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

মানুষ ইতিহাস থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে। দু'শ বছর আগে যে পরিস্থিতিতে বিদেশী ইংরাজ শক্তি ভারত দখল করেছিল, এক দিক থেকে দেখতে গেলে, আজও সেই পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে। সেদিনের মত আজও ভারতের মানুষ নানা দল উপদলে বিভক্ত। আজও ভারতের মানুষ দলীয় স্বার্থ তথা ব্যক্তিগত স্বার্থে নিমগ্ন রয়েছে এবং একযোগে বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করার চিন্তা করছে না। সেদিন ডাঙ্কেল প্রস্তাব সই হয়ে ভারত বিদেশের কাছে বিক্রী হয়ে যাবে, সেদিনও যদি ভারতের মানুষ বৈঠকখানা ঘরে টেলিভিশনের সামনে খোশ গল্পে মত্ত থাকে তবে ভারতবাসীর পক্ষে পরাধীন হয়ে কুকুরের জীবন যাপন করাই উপযুক্ত হবে। আর যদি তারা তা না চান তবে সেই মুহূর্তে সমস্ত দলাদলি ভুলে গিয়ে এক সাথে বিদেশী শত্রু ও তার পদলেহী দালালদের বিরুদ্ধে ঘৃণায় সোচ্চার হতে হবে। সর্বস্ব পণ করে এই গোলামীর প্রচেষ্টাকে রুখতে হবে। আজ খুব সহজেই একে রোখা যেতে পারে। কিন্তু একবার সই হয়ে গেলে তা রুখতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দিতে হবে।

দু'শ বছর আগে কিছু স্বার্থান্বেষী বিশ্বাসঘাতকরাই বিদেশীদের পক্ষে ও দেশ দখল করার পথ সুগম করে দিয়েছিল। আজও এই ধরণের এক দল দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক এই কাজে লিপ্ত রয়েছে। এই সব দেশদ্রোহীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত এ ব্যাপারে মনুসংহিতা বলছে, ছয়রকম অপরাধীকে রাজা কোন রকম দয়া প্রদর্শন না করে সর্বাগ্রে বধদণ্ডে দণ্ডিত করবেন। এরা হল, (১) মিথ্যা রাজাজ্ঞা সমন্বিত পত্রলেখক, (২) প্রকৃতিবর্গের বেধকারক, (৩) নারী, (৪) বালক, (৫) ব্রাহ্মণ হন্তা ও (৬) শত্রুসেবী (৯/২৩২)। মনু আরও বলছেন যে, রাজা উৎকোচ গ্রহণকারী রাজপুরুষের সমস্ত ধন বলপূর্বক অপহরণ কতোকে দেশ থেকে নির্বাচিত করবেন (৭/১২৪)। কৌটিল্য তাঁর "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থের পঞ্চম অধিকরণের প্রথম প্রকরণটি শুধু এই সমস্ত দেশদ্রোহীদের শাস্তিদানের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এই সব দুষ্কৃতকারীদের তিনি অবশ্যই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কতে বলেছেন এবং যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক উচ্চপদে আসীন ও প্রভাবশালী, তাদের প্রকাশ্যে হত্যানা করে গুপ্ত হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে সত্যবান তাঁর পিতা রাজা দ্যুমৎসেনকে বলছেন, "যদি অহিংস উপায়ে অসাধুকে সাধু করা অসাধ্য হয় তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার করুন।" দণ্ডের ভয় নেই বলেই আজকের বিশ্বাসঘাতকরা প্রকাশ্যে দেশদ্রোহীতা করতে সাহস পাচ্ছে। এটা নিশিত যে, অর্থের লোভে তারা এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। অর্থ অবশ্যই প্রিয়। কিন্তু সব মানুষের কাছেই সব থেকে প্রিয় হল তার প্রাণ।

ড্রাগনের কবলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭), বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাকোষ (IMF) যুগ্মভাবে একটা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যার শিরোনাম হল, "চীন-২০২০"। এই রিপোর্টে চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে যে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে চীন হয়ে উঠবে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানীকারক দেশ। অর্থাৎ এ ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই হবে চীনের স্থান। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এশিয়ার সাবেক 'চার বাঘ", যথা দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর ও হংকং অর্থনৈতিক যুদ্ধে চীনের কাছে পরাস্ত হবে। কাজেই বলা চলে যে, আর ২০ বা ২৫ বছর পর চীন হয়ে উঠবে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। গত জুলাই মাসে হংকং চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কাজ বেশ খানিকটা এগিয়েই গিয়েছে।

ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ৭০এর দশকের শেষের দিকে দেঙ জিয়াঙ পিঙ-এর অর্থনৈতিক উদার নীতি গ্রহণের পর থেকে চীন এক চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। গত ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে চীনের জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে বছরে শতকরা ৯.৪ শতাংশ হারে, যা নাকি এক অভূতপূর্ব ব্যাপার এবং এর ফলে চীনের ২০ কোটি মানুষ দরিদ্রসীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান চীনা রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন গত সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ১৫শ কংগ্রেসে উপরোক্ত আর্থিক উদার নীতি গ্রহণের সপক্ষে আরও অনেক সাফল্যের উল্লেখ করে ঘোষণা করেন যে, চীন আপাততঃ দেঙ এর প্রদর্শিত পথেই চলবে। উপরন্তু তিনি এই ইঙ্গিত দেন যে, শীঘ্রই চীনের সরকারী শিল্প সংস্থাগুলোকে ব্যাপক হারে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে নিয়ে আসা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের চীন বিশেষজ্ঞ শ্রী বিক্রম নেহেরু মনে করেন যে, উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, খুব কম করে ধরলেও বছরে অন্ততঃ ৬.৫ শতাংশ হারে অগ্রগতি এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার হবে। এই হারে অগ্রগতি বজায় থাকলে আগামী ২৫ বছরে চীনের আর্থিক ক্ষমতা সাত গুণ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ বিগত ৮০ বছরে চীন যে অগ্রগতি করেছে, আগামী ২৫ বছরে তার থেকে বেশী অগ্রগতি করবে।

বর্তমানে চীনে ছোট, মাঝারি ও বৃহৎ মিলিয়ে মোট ৩ লক্ষ সরকারী শিল্প সংস্থা আছে এবং মোট রপ্তানীর এক তৃতীয়াংশ এই কারখানাগুলো থেকে আসে। চীনের নিজস্ব বিনিয়োগের প্রায় ৭৫ শতাংশ এদের পিছনে ঢালতে হয় এবং বদলে মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫০

শতাংশ এরা প্রস্তুত করে। এগুলোর বেশীর ভাগই লোকসান চলছে এবং বর্তমানে মোট লোকসানের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি ডলার। প্রায় ১৫ কোটি লোক এই কারখানাগুলোতে কাজ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব কারখানায় প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে লোকসানের সংস্থাতেও টাকা ঢালতে হয়। এই সমস্যা সমাধান করতে গত সেপ্টেম্বর মাসের পার্টি কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি জিয়াং জেমিন তাঁর পরিকল্পনা (Jiang's Plan) পেশ করেন। এতে প্রস্তাব রাখা হয় যে, মাত্র ১০০০ বৃহৎ ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখে বাকীগুলোকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে তুলে দেওয়া হবে। পার্টি সদস্যরা এতে সমর্থন জানায় এবং বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করার জন্য জিয়াং এর প্রতিদ্বন্দী কিয়াও শী কে ভোট দিয়ে পার্টি কংগ্রেস থেকে বিতারিত করে। অর্থনীতিবিদদের ধারণা যে, উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সরকারী আওতায় থাকার ফলে যে উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে তা ব্যবহৃত হবে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে চীনের রপ্তানী বেড়েছে ২৬ শতাংশ, আমদানী কমেছে ০.১ শতাংশ এবং এর ফলে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে ১৭৮০ কোটি ডলার এবং সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ দাড়িয়েছে ১২,১২০ কোটি ডলার। রপ্তানী বাণিজ্যের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় চীনের সাফল্যের প্রধান কারণ হল এর বিশাল জনসংখ্যা (বর্তমানে ১২০ কোটি) এবং সস্তা শ্রমিকের অফুরন্ত যোগান। গ্রাম থেকে শহরের কারখানায় কাজ করতে আসা প্রবল জনস্রোতের জন্য মজুরী বাড়াবার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও সস্তা শ্রমিকের যোগান ঠিক থাকছে। বিশেষজ্ঞের মতে আগামী ৩০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত এই সস্তা শ্রমিকের যোগান অক্ষুণ্ণ থাকবে। জিয়াং এর প্ল্যান অনুযায়ী যে প্রাইভেটাইজেশন হবে তাতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ সরকারী শ্রমিক বেকার হবে এবং এটাও মজুরীর উর্ধ্বগতি রোধ করবে।

পক্ষান্তরে এশিয়ার সাবেক চার বাঘ ও নতুন তিন বাঘ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের জনসংখ্যা চীনের তুলনায় নগণ্য এবং বিগত ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে ক্রমাগত ১০ শতাংশের বেশী হারে প্রগতি করার ফলে এই সব দেশগুলোতে জীবন ধারণের মান ও মজুরী দুইই বেড়ে গেছে। তাইওয়ান, কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে মাথা পিছু আয় বেড়েছে ৫ থেকে ৬ গুণ এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে বেড়েছে ৩ থেকে ৪ গুণ। এই কারণে যেসব বিদেশী পুঁজিপতি এতদিন ফিলিপাইন বা মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করে আসছিল, তারা এখন চীনের দিকে ঝুঁকছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, "থাই ডিউরেবল টেক্সটাইল কোম্পানী" আগে থাইল্যাণ্ডের কারখানায় প্রায় ৩০০ রকমের পণ্য উৎপাদন করতো যার বেশীরভাগটাই বাংলাদেশে চলে যেত। কিন্তু বর্তমানে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় পেরে না ওঠার জন্য মাত্র ৫০ রকমের পণ্য উৎপাদন করছে এবং চীনে কারখানা স্থাপন করার কথা

ভাবছে। তেমনি "অ্যাস্ট্রা ফুটওয়্যার" পশ্চিম জাভার কারখানায় মাসে ১০ লক্ষ জোড়া "Nike" মার্কা জুতো তৈরী করে এবং প্রায় ১৮,০০০ লোক কাজ করে। বর্তমানে শ্রমিকদের দিনে ৩ ডলার হিসাবে মজুরী দিতে হচ্ছে, কিন্তু চীনে ঐ একই কাজ অর্ধেকেরও কম মজুরীতে করানো সম্ভব। দক্ষিণ চীন থেকে উত্তর চীনে মজুরী আরও কম। এই কারণে অনেক কোম্পানী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ব্যবসা তুলে নিয়ে চীনে কারখানা স্থাপন করছে। ফলে চীনের রপ্তানী বাড়ছে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর রপ্তানী কমছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, চীনের ২০ কোটি বেকার বা অর্ধবেকার লোক অচিরেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ ছিনিয়ে নেবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটা প্রধান অসুবিধা হল দক্ষ কারিগর ও শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ারের দারুণ অভাব। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা চীনে প্রায় ২ কোটি, যাকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশীই বলা চলে। এই কারণে যে সব কোম্পানীগুলো অত্যাধুনিক কারিগরি বা হাইটেক সামগ্রী তৈরী করার কথা ভাবছে তারাও ব্যবসার ক্ষেত্র হিসাবে চীনকেই বেছে নিচ্ছে। এই কারণে চীন বর্তমানে হাইটেক ক্ষেত্রেও প্রাধান্য বিস্তার করছে ও প্রতিযোগীতায় জয়ী হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ সিঙ্গাপুরের কথা বলা চলে। এই দ্বীপ রাষ্ট্রের মোট রপ্তানীর সিংহভাগই হল হাইটেক ইলেকট্রনিক সামগ্রী। এখানে জীবনযাত্রার মান আজ বৃটেনের সমপর্যায়ে চলে গেছে এবং মজুরীও অত্যাধিক চড়া হয়েছে গেছে। এই কারণে সিঙ্গাপুরের কোম্পানীগুলোও ব্যবসা আস্তে আস্তে চীনে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার তাগিদে। এই সমস্ত কারণে বিদেশী বিনিয়োগের অঙ্কও চীনে খুব দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। গত ১৯৮৭ সালে যেখানে মোট বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছিলমাত্র ২৩০ কোটি ডলার, ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ৩,৮০০ কোটি ডলার।

গত বছর অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে ভারতের জাতীয় উৎপাদন বেড়েছে ৫.১ শতাংশ যা চীনের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে, ১৯৯০-৯১ সালের উদার নীতি গ্রহণের ফল এখন থেকে ফলতে শুরু করবে এবং উন্নয়নের হারও বাড়বে। "হার্ভার্ড ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট"এর ডিরেক্টর জ্যাফ্রি স্যাক্স এর মতে, এশিয়ার দুই দৈত্য (giant) ভারত ও চীনের পক্ষে বছরে কম করে হলেও ৬.৫ শতাংশ হারে আর্থিক প্রগতি করা মোটেই কঠিন কাজ হবে না। এশিয়াবাসীরা বেশী সঞ্চয় প্রবণ বলে এর থেকে বেশী হারে উন্নতি করাও সম্ভব। তাঁর মতে এশিয়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাতে আর ২০ থেকে ২৫ বছর পরে এশিয়ার দেশগুলিই, প্রধানতঃ ভারত ও চীন, বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রাধান্য করবে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রাধান্যের যুগের অবসান ঘটবে। গত পঞ্চাশের দশকে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ১৭ শতাংশ এশিয়া উৎপাদন করতো এবং গত বছর, অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে ২১শ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করবে। দেখে শুনে মন হয় যে, কবির আকাঙ্ক্ষা "ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" পূরণ হতে আর বেশী বাকী নেই। (প্রবন্ধে উল্লিখিত ডলার বলতে মার্কিন ডলার বুঝতে হবে।)

একবিংশ শতাব্দী এশিয়াবাসীদের শতাব্দী

গত শনিবার, অর্থাৎ ১৮ই অক্টোবর, ১৯৯৭, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ডাঃ সি. রঙ্গরাজন মুম্বাইতে বলেন যে, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যে পর্যায়ে পৌঁচেছে তাতে বছরে ৭ শতাংশ হারে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ডঃ রঙ্গরাজন মুম্বাইতে আয়োজিত "গ্লোবাল ফিনান্স" শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে উক্ত মত ব্যক্ত করেন। তিনি অরও বলেন যে, চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে ৭ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেনি বটে, তবে আশা করা যায় যে, শেষ ৬ মাসে উৎপাদন বাড়বে এবং ৭ শতাংশের লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানো সম্ভব হবে। লক্ষ্য করার বিষয় হল, ডঃ রঙ্গরাজনের বক্তব্য হার্ভার্ড ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এর ডিরেক্টর মিঃ জেফ্রী ম্যাকস্-এর বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। কিছুদিন আগে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন যে, বর্তমানে ভারত ও চীন, এশিয়ার এই দুই দৈত্যের পক্ষে বছরে অন্তত ৬ শতাংশ হারে আর্থিকপ্রগতি করা কোন অসম্ভব কাজ হবে না। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব মত গত বছর, অর্থাৎ ১৯৯৬-৯৭ সালে ভারতের উৎপাদন বেড়েছে ৬.৮ শতাংশ এবং চীনের বেড়েছে ৯.৭ শতাংশ। মিঃ ম্যাকস্ আরও বলেন যে, যদি ভারত ও চীন তাদের অগ্রগতির এই হার বজায় রাখতে পারে তাহলে আগামী ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের দেশগুলোর প্রধান্যের যুগেরঅবসান ঘটবে এবং এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে ভারত ও চীন, বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৯৫০ এর দশকে সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপাদনের মাত্র ১৭ শতাংশ এশিয়ার দেশগুলো উৎপাদন করতো। কিন্তু গত বছর তা বেড়ে ৪০ শতাংশ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, আগামী শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই তা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করবে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে এশিয়ার দেশগুলো মোট ইস্পাৎ উৎপাদন করেছে ২৫.২ কোটি টন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের প্রধান প্রধান ইস্পাৎ উৎপাদনকারী দেশগুলো উৎপাদন করেছে ২৩.২৮ কোটি টন। ইস্পাৎ উৎপাদনকে সাধারণভাবে শিল্পে উগ্রসরতার সূচক হিসাবে দেখা হয়। কাজেই সে নিয়মে দেখা যাচ্ছে যে এশিয়ার দেশগুলো ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপকে শিল্পে অতিক্রম করে গেছে। এই প্রসঙ্গে এটাও বলা

যুক্তিযুক্ত হবে যে, বর্তমানে এশিয়ার দেশগুলোতে শিল্প ও কারিগারির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পেটেন্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হচ্ছে তা ইয়োরোপ ও আমেরিকার মিলিত রেজিষ্ট্রীকৃত পেটেন্ট এর থেকে বেশী। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম দেয়। কাজেই আশা করা যায় যে, আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে এশিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে ভারত ও চীন, বিশ্বরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের কাছে এটা নিঃসন্দেহে একটা সুখের খবর, কারণ বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপের লোকেরা তাদের দেশকে বলপূর্বক দখল করে লুণ্ঠন করেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে তাদের সম্পদ লুঠ করে নিজেরা বড়লোক হয়েছে। প্রথমেই মনে আসে আফ্রিকার অধিবাসীদের কথা। রাতের অন্ধকারে গ্রামকে গ্রাম ঘিরে ফেলে সেখানকার মানুষজনকে বন্দী করে পায়ে শিকল পরিয়ে আমেরিকার বাজারে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করে তৎকালীন বৃটিশ সরকার কোটি কোটি পাউণ্ড মুনাফা করেছে। আমেরিকা মহাদেশ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের পশুর মত গুলি করে হত্যা করে তাদের জমি জায়গা আত্মসাৎ করেছে এবং তারাই আজ নিজেদের সব থেকে সভ্য বলে চীৎকার করছে।

পলাশী যুদ্ধের পর অন্যায় জোরজুলুমের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ ও বেগমদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে কত সোনা ও মহামূল্য ধনরত্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যায় ঐতিহাসিক শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৯০০ সালের মূল্যমানে তা হিসাব করে দেখেছেন যে কম করে হলেও তার মূল্য ৩০০ কোটি টাকা হবে। কাজেই আজকের বাজার দর অনুযায়ী তা কত হাজার কোটি টাকা হবে তা সহজেই অনুমান করা চলে। নীল চাষের আমলে নীলকর সাহেবরা আমাদের কৃষকদের উপর যে অন্যায় জুলুম ও অত্যাচার করেছে তা ভুলবার নয়। সে অত্যাচারও উৎপীড়নের দ্বারা ইংরেজরা বাংলার মসলীন শিল্পকে নষ্ট করেছে এবং কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দুটি আকালের দ্বারা যে লক্ষ লক্ষ লোককে তারা না খাইয়ে মেরেছে তাও ভুলবার কথা নয়।

কিন্তু সুখের কথা হল, দিন বদলাতে শুরু করেছে। ইয়োরোপের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি আজ কমন ইয়োরোপিয়ান মার্কেট'এর মাধ্যমে বাঁচবার চেষ্টা করছে এবং যুক্তরাষ্ট্র বাঁচতে চাইছে গ্যাট চুক্তি ও WTO 'এর মাধ্যমে। ১৯৯৪ সালে ঘাটতি বাণিজ্য হিসাবে জাপানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ ছিল ৬,৫৯০ কোটি ডলার এবং বর্তমানে তা আরও বেড়েছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান ঘাটতি বাণিজে কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নিজের তৈরী WTO 'এর নিয়মকানুন নির্লজ্জের মত পদদলিত করে জাপানী গাড়ীর আমদানীর উপর ১০০ শতাংশ হারে আমদানী শুল্ক বসাতে হয়েছে। ঘাটতি বাণিজ্যের ফলে আমেরিকা আজ চীনের কাছেও ঋণী এবং বর্তমানে এই ঋণ ১০০০ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের রমরমার দিন

শেষ হয়ে যাওয়ায় যুক্তরাজ্যে ভেঙে যাচ্ছে। স্কটল্যাণ্ড আগেই আলাদা হয়ে গেছে এবং গত মাসে অনুষ্ঠিত গণভোটে ওয়েলস্'-এর ৬৬ শতাংশ মানুষ যুক্তরাজ্য থেকে আলাদা হয়ে পৃথক সরকার গড়ার পক্ষে মত দিয়েছে।

বর্তমানে আমেরিকার বহুজাতিক করপোরেশনগুলো আমেরিকায় তাদের ব্যবসা সঙ্কুচিত (down size) করছে এবং হাজার হাজার কোটি ডলার নিয়ে এশিয়ায় চলে আসছে বিনিয়োগ করার জন্য। এর ফলে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান বেকার হচ্ছে ও আমেরিকার জীবনযাত্রার মান নেমে যাচ্ছে। অর্থনীতির পণ্ডিতদের মতে এশিয়ায় "অটো-বুম" বা মোট গাড়ী তৈরী ও কেনাবেচার রমরমা হতে চলেছে যা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইয়োরোপ ও আমেংরিকায় হয়েছিল। এই কারণে আমেরিকার ডেট্রয়েট 'এর "চার বিশাল" (Four-big) এবং জার্মানী, ইতালী ও ফ্রান্সের বড় বড় মোটর গাড়ীর কোম্পানীগুলো হাজার হাজার কোটি ডলার নিয়ে এশিয়ায় চলে আসতে শুরু করেছে। কাজেই বলা চলে যে, ২১শ শতাব্দী হবে এশিয়াবাসীদের প্রাচুর্যের শতাব্দী এবং ইউরোপয়ীদের ক্ষেত্রে পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্যের শতাব্দী। রাণী এলিজাবেথের জালিয়ানওয়ালাবাগ ভ্রমণ ও দুঃখ প্রকাশ তারই পদধ্বনি।

গান্ধীর দেশের মানুষই গান্ধীবাদী মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাকে খারিজ করে দিল

গত বছর ২৭শে ফেব্রুয়ারী, প্রায় দু হাজার সশস্ত্র মুসলমান গুণ্ডা যখন গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কোচে আগুন লাগিয়ে ৫৯ জন হিন্দু রামসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল, আমাদের তথাকথিত সেকুলার রাজনীতিক ও তাদের চ্যালাচামুণ্ডারা এবং সেকুলার সংবাদ মাধ্যমে মুসলমানদের সেই জঘন্য অপরাধ আড়াল করার জন্য তৎক্ষণাৎ ময়দানে নেমে পড়ল। উপরন্তু তারা আক্রান্ত হিন্দুদেরই দোষারোপ করতে শুরু করে দিল, বলতে লাগল যে রামসেবকরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম কটূক্তি করে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢাকার এই প্রচেষ্টায় সেই তথাকথিত সেকুলার সংবাদ মাধ্যমকে শেষ পর্যন্ত এমন জায়গায় যেতে হল যে, তাকে বলতে হল, পুরো ব্যাপারটাই বিজেপি তথা সঙ্ঘপরিবারের একটি চক্রান্ত মাত্র। তারাই পরিকল্পিতভাবে ট্রেনে আগুন দিয়ে হিন্দু রামসেবকদের পুড়িয়ে মেরেছে। উদ্দেশ্য, মুসলমানদের ওপর দোষ চাপিয়ে একটা ঘৃণার বাতাবরণ তৈরি করা এবং এইভাবে হিন্দুভোটারদের জোটবদ্ধ করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জয়যুক্ত করা। অথচ এই ঘটনার সত্য উদ্ঘাটনের জন্য যে তদন্ত কমিটি ঘটিত হয়েছিল, সেই কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল যে, দুই কামরার মধ্যে লোক চলাচলের জন্য যে ভেস্টিবিউল থাকে, তার প্লাস্টিকের আচ্ছাদন ভেঙে মুসলমান আক্রমণকারীরা পেট্রল ও কেরোসিন নিয়ে কামরায় ঢোকে এবং আগুন দেয়।

আমাদের তথাকথিত সংবাদ মাধ্যম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণও সযত্নে এড়িয়ে যায়। এই প্রত্যক্ষদর্শী তার বিবরণে বলেছিল যে, মারমুখী মুসলমানরা যখন আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন স্থানীয় একটি মসজিদ তাদের উৎসাহিত করেছিল। মসজিদের লাউডস্পীকার থেকে বলা হচ্ছিল—'ইসলাম খতরে মে হ্যায়, কাফেরোঁকো মার ডালো''। অর্থাৎ, ''ইসলাম বিপদগ্রস্ত, কাফেরদের হত্যা কর।' সব থেকে বড় কথা হল, সেকুলারবাদী সংবাদ মাধ্যমের উপরিউক্ত জঘন্য ভূমিকার ফলে, আর যাই হোক না, সাধারণ মানুষের কাছে সে যে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

এই সব ঘটনা থেকে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আজ এটাও পরিষ্কার হয়েছে যে, সেকুলারবাদ বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই দেশে আজ কি চলছে। তাদের কাছে আজ এটা দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়েছে যে, এই মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার আসল লক্ষ্য হল দলবদ্ধ মুসলমান-ভোট পাবার উদ্দেশ্যে নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের সমস্ত জঘন্য অপরাধকে আড়াল করা, বদলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হোক, তাদের সেই সব অপরাধের জন্য আক্রান্ত হিন্দুদেরই দোষারোপ করা, গালমন্দ করা। নির্লজ্জভাবে মুসলমান তোষণ করে মেকি-সেকুলারবাদী রাজনীতিকদের মুসলীম ভোট পাবার ব্যবস্থা করা।

হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ নয়। তাদের কেউ কংগ্রেস, কেউ সমাজবাদী, কেউ কমিউনিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। তার ওপরে রয়েছে জাত-পাতের বিভিন্নতা, অথবা জনজাতি জনিত ভাগাভাগি। সর্বোপরি, হিন্দুরা ভোট দেয় নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত, আদর্শ, বিশ্বাস ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। মুসলমানদের মত মোল্লা-মৌলবীর ফতোয়া অনুসারে তারা দলবদ্ধভাবে ভোট দেয় না। কাজেই সেকুলারবাদী সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই এটা নিশ্চিত যে, হিন্দুদের একটা অংশের ভোট তারা পাবেই। তাই তাদের স্বার্থ রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। ভোটের আগে কিছু সত্য-মিথ্যা বলে তাদের ভোট অবশ্যই আদায় করা যাবে। তাই এই মেকি-সেকুলারবাদীদের আপ্রাণ চেষ্টা হল মুসলমানদের ভোট আদায় করা এবং এই জন্য যত রকমভাবে পারা যায় তাদের তোয়াজ করা। তাদের সমস্ত রকম অন্যায় ও অপরাধকে, এমন কি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ কর্মকেও আড়াল করা।

তাই বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য এই মেকি-সেকুলরবাদীরা কাঁদে না। কাশ্মীরে মুসলমান আতঙ্কবাদীরা প্রায় প্রতিদিন নিরীহ হিন্দুদের গুলি করে মারছে, মন্দির আক্রমণ করে নিরীহ হিন্দু ভক্তদের হত্যা করছে, অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের হত্যা করছে। কিন্তু তাতে তাদের মনে বিন্দুমাত্র দুঃখের উদয় হয় না। এই ধারা অনুসরণ করেই গোধরায় ৫৯ জন রামসেবককে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় তাদের মনে দুঃখের উদয় হল না।

কিন্তু আক্রান্ত ও নির্যাতিত হিন্দুরা যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য মুসলমানদের আক্রমণ করে, তাহলে এই সেকুলারবাদীরা কাঁদতে বসে। তাই গুজরাটের হিন্দুরা যখন গোধরায় নারকীয় হিন্দু হত্যার প্রতিশোধ নিতে শুরু করল, তখন এই সেকুলারবাদীর দল চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিতে শুরু করল। দুঃখে বুক চাপড়াতে শুরু করে দিল। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অতিরঞ্জিত মুসলমান নির্যাতনের খবর প্রচার করতে সুরু করে দিল। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতাদের কান্না আর সবাইকে ছাপিয়ে গেল। তাঁরা শুধু কান্নাকানিট করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, গুজরাটের ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় অর্থ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। কিন্তু বাংলাদেশের নির্যাতিত

হিন্দুদের জন্য, বা গোধরায় নিহত হিন্দুদের পরিবারদের জন্য বা পুলিশের গুলি ও মুসমানদের চাকুতে নিহত গুজরাটের হিন্দুদেরও যে সাহায্যের প্রয়োজন, তা তাঁরা দরকার মনে করলেন না।

এই সমস্ত কারণে এই দেশের সেকুলারবাদীদের ভণ্ডামী বুঝতে আর কারও বাকী নেই। বুঝতে বাকী নেই যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এদেশে যা চলছে তা হল, সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুর চরম উপেক্ষা এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ তোষণ।

বর্তমানে এই সেকুলারবাদের সঙ্গে অরেকটি মাত্রা যোগ হয়েছে, তা হল সঙ্ঘপরিবারকে যথেচ্ছ গালমন্দ করা। সঙ্ঘপরিবার সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এই সর্বৈ মিথ্যা প্রচার করা। অথচ যেই আরবী তত্ত্ব চরম ঘৃণা-বিদ্বেষের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই তত্ত্ব সম্পর্কে নীরব থাকা। যেই তত্ত্ব বলছে যে, পৃথিবীর সমস্ত অ-মুসলমান কাফেরদের নির্বিচারে হত্যা করে সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেই তত্ত্বের অনুগামীরা যে হাজার হাজার মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ জিহাদী তৈরী করে চলেছে, সে ব্যাপারে নীরব থাকা।

আমাদেরএকজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তাঁর একটি সাম্প্রতিক লেখার (India Today–30.12.2002) মধ্য দিয়ে সঙ্ঘপরিবারের উদ্দেশ্যে যত রকম গালিগালাজ ডিক্সনারীতে পাওয়া সম্ভব তা সবই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু একজন নির্ভেজাল সেকুলারবাদীর মতই তিনি লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ ইত্যাদি জিহাদী সংস্থাগুলোর কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যবহার করেননি। তারা যে সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি দারুল-ইসলাম-এ পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নীরব থেকে পক্ষান্তরে তাদের জিহাদী কাজকর্মকে সমর্থন করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

তবে সুখের কথা হল, গুজরাটের হিন্দুরা এই সব সেকুলারবাদীদের মুখের মত জবাব দিয়ে দিয়েছে। সেকুলারবাদীদের ভণ্ডামীকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছে। সারা দেশের মানুষের সামনে সেকুলারবাদীদের ভণ্ডামীর মুখোসটাকে খুলে দিয়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, যেই গুজরাট আজ সেকুলারবাদীদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে, সেই গুজরাটেরই এক ব্যক্তি মুসলমান তোষণকারী এই ভণ্ড সেকুলারবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর নাম শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। আর একটু ভিতরে গিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, হিন্দুর চরম সর্বনাশকারী তাঁর বিচিত্র অহিংসার তত্ত্বই আজকের এই বিচিত্র সেকুলারবাদের জন্মদাত্রী।

প্রথমেই বলে রাখা উচিত হবে যে, গান্ধীর এই অহিংসার তত্ত্ব শুধু হিন্দুদেরই পালনীয় বা হিন্দুদের পক্ষেই প্রযোজ্য, মুসলমানদের জন্য নয়। ১৯৩৯ সালের ৭ই

অক্টোবর 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন, "এই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই হল অহিংসা পালনের উপযুক্ত দেশ এবং ভারতের মধ্যে শুধু হিন্দুরাই অহিংসা পালনের যোগ্য ব্যক্তি।" এই কারণে তিনি মনে করতেন যে, ভারতের পক্ষে কোন যুদ্ধ করা অত্যন্ত অনুচিত। এমন কি সীমান্ত সুরক্ষার জন্যও ভারতের যুদ্ধ করা উচিত নয়। কারণ ভারত যুদ্ধ করলে তার অহিংসার তত্ত্বের উল্লঙ্ঘন হবে এবং ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা এজন্য তাঁকে দোষারোপ করবে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর এই সমস্ত কথাবার্তার মূল উদ্দেশ্য হল—হিন্দুরা কঠোরভাবে অহিংসা পালন করবে এবং মুসলমানদের অত্যন্ত বর্বরোচিত আক্রমণেরও কোন প্রতিবাদ করবে না বা প্রতিশোধ নেবে না।" ছাগলরা অহিংসা পালন করবে, এবং হায়নাদের আক্রমণ প্রতিহত করবে না, এই হল গান্ধীর মূল শিক্ষা। আর এই-ই হল চরম জ্ঞান বা পরম প্রজ্ঞা, যা গান্ধী আজকের সেকুলারবাদীদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন।

তিনি আরও বলতেন যে, তার অহিংসা-নীতির স্বার্থে হিন্দুদের সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। এই উক্তির পরোক্ষ অর্থ হল এই যে, ভারতের সেনা বাহিনীকে একটি মুসলমান সেনা বাহিনীতে পরিণত করা। যাই হোক, সুখের বিষয় হল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪০ সালে গান্ধীর এই সমস্ত পাগলের প্রলাপকে প্রকাশ্যে খারিজ করে দেয়। কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হয় যে, গান্ধীর কাছে অহিংসার তত্ত্ব নীতি (creed) হতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস দলের কাছে তা একটি কৌশল (policy) মাত্র।

অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ১৯০৮ সালে গান্ধী তাঁর এই মুসলমান তোষণকারী বিচিত্র অহিংসার তত্ত্বকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। ওই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ সরকার সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপর বছরে তিন পাউণ্ড অতিরিক্ত কর ধার্য করে এবং গান্ধী এ ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সঙ্গে কিছু বাক্যালাপ চালান। কিন্তু তাঁর এই আলাপ-আলোচনা মুসলমানদের মনঃপূত না হবার ফলে তারা কিছুটা রুষ্ট হয়। সেই সময় গান্ধী একটি সভায় হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টমত ও ইসলামের এক তুলনামূলক বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তুও মুসলমানদের ক্রুদ্ধ করে তোলে।

এর কয়েকদিন পরে, ১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, কতিপয় মুসলমানের একটি দল মীর আলম নামে এক পাঠানের নেতৃত্বে গান্ধীর ওপর চড়াও হয়। মুসলমান আক্রমণকারীরা গান্ধীকে যথেচ্ছ কিল, চড়, ঘুষি মারে এবং লাঠি দিয়ে পেটায়। গান্ধী মাটিতে পরে গেলে তাঁরা তাকে যথেচ্ছ লাথি মারে এবং যাবার সময় প্রাণনাশের হুমকী দেয়। ডাঃ বি আর আম্বেদকরের মতে, এই ঘটনার পর থেকেই গান্ধী ইসলাম তথা

মুসলমানদের কোন রকমের সমালোচনা করা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। এবং এই ঘটনাকে তিনি গান্ধীর জীবনের একটি mile-stone বলে বর্ণনা করেন। ডাঃ আম্বেদকরের মতে গান্ধী ছিলেন 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম', এবং এই ঘটনার পর থেকে তিনি মুসলমানদের অত্যন্ত গর্হিত অপরাধকেও আর অপরাধ বলে মনে করতেন না।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। ১৯২৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আব্দুল রশিদ নামে এক মুসলমান আততায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বুকে ছুরি মেরে তাঁকে হত্যা করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এটা হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন 'আর্য সমাজ'-এর এক জন প্রচারক এবং তিনি ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি 'শুদ্ধিযজ্ঞ' চালু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি গোঁড়া মুসলমানদের বিরাগভাজন হন।

এই ঘটনার মাস দুয়েক আগে একজন মুসলমান মহিলা তাঁর সন্তান সন্ততি নিয়ে স্বামীজির শরণাপন্ন হন এবং তাদের জন্য শুদ্ধিযজ্ঞ করে তাদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে বলেন। কিন্তু মহিলাটির স্বামী আদালতে মামলা করে এবং স্বামীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ওই মহিলাকে অপহরণ করেছেন। কিন্তু আদালত ওই অভিযোগ খারিজ করে দেয় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে সসম্মানে মুক্তি দেয়। এর ফলে গোঁড়া মুসলমানের দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আব্দুল রশিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পরেই গৌহাটীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। স্বামীজীর এই করুণ পরিণতির জন্য পরিবেশ ছিল খুবই শোকাহত ও স্তব্ধ। কিন্তু গান্ধী বক্তৃতা করতে উঠেই সেই আততায়ী ও খুনী আব্দুল রশিদকে 'ভাই আব্দুল রশিদ' বলে সম্বোধন করলেন। **তাঁর এই আচরণ উপস্থিত অন্যান্য নেতাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। কিন্তু গান্ধী সে সব তোয়াক্কা না করে বলতে থাকলেন, "এখন হয় তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, কেন আমি আব্দুল রশিদকে 'ভাই আব্দুল রশিদ' বলেছি**। এবং আমি বারবার ওই একই কথা বলবো। আমি এ কথাও বলবো না যে, আব্দুল রশিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে খুন করার অপরাধে অপরাধী নয়। প্রকৃত দোষী হল তারা, যারা একের মনে অন্যের প্রতি ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তোলে।" অর্থাৎ প্রকারান্তরে গান্ধী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকেই তাঁর মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন, কারণ গান্ধীর মতে তিনি তাঁর শুদ্ধিযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ঘৃণা প্রচার করছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীর শোকবার্তায় গান্ধী লিখলেন, "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পর্কে আমি একটি কথাই বলবো, তিনি বীরের জীবনযাপন করেছেন এবং বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন।" অর্থাৎ, কোন

মুসলমানের হাতে কোন হিন্দু খুন হলে হিন্দুদের উচিত সেই মৃত্যুকে বীরের মত মৃত্যু বরণ বলে মনে করা।

এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, মুসলমান তোষণ করার এই গান্ধীবাদী অহিংসা তথা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিই দেশবিভাগ ও পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গান্ধী দেশভাগের বিরোধী ছিলেন, অথবা গান্ধী দেশভাগের দোষে অপরাধী নন্। এই বিশ্বাসের কারণ হল গান্ধী প্রকাশ্য সভায় সব সময় বলতেন, "দেশ দ্বিখণ্ডিত করার আগে আমাকে দ্বিখণ্ডিত কর" (vivisect me before you vivisect India)।

যখন প্রকাশ্য সভায় তিনি ওই সব কথা বলছিলেন, ঠিক একই সময় তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করছিলেন। পাঠকের হয়তো স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৯৪০ সালের ২৬শে মার্চের বৈঠকে মুসলীম লিগের নেতারা সর্বপ্রথম দেশভাগ ও পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করে। তাদের সেই দাবিকে সমর্থ করে গান্ধী দিন দশেক পরে ৬ই এপ্রিলের 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন, "**দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। বর্তমানে আমরা একটা যৌথ পরিবারের মতই বসবাস করছি। তাই এর কোন এক শরিক ভিন্ন হতে চাইতেই পারে।**" বছর দুই বাদে, ১৯৪২ সালের ১৮ই এপ্রিলের 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি আবার লিখলেন, "**যদি ভারতের বেশিরভাগ মুসলমান এই মত পোষণ করে যে মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি, যাদের সঙ্গে হিন্দু বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কোন মিল নেই, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে সেই চিন্তাভাবনা থেকে তাদের বিরত করতে পারে। এবং সেই ভিত্তিতে তারা যদি দেশবিভাগ চায় তবে অবশ্যই দেশভাগ করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে হিন্দুরা তার বিরোধিতা করতে পারে।**"

এ ব্যাপারে পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার ১৯৪৭ সালের ১২ই জুনের বৈঠকে দেশবিভাগের প্রস্তাব আনে এবং পরবর্তী ১৪ই ও ১৫ই জুনের বৈঠকে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি সেই প্রস্তাব অনুমোদন করে। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উপরিউক্ত ১৪ জুনে বৈঠকে কংগ্রেসের অনেক বিশিষ্ট নেতা, যেমন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, গোবিন্দবল্লভ পন্ত, চৈতরাম গিদোয়ানি, ডঃ এস কিচলু প্রভৃতি, দেশভাগের প্রস্তাবকে প্রবলভাবে বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর গান্ধী এই সব নেতাদের থামিয়ে দিয়ে দেশভাগের সপক্ষে ৪৫ মিনিট ধরে এক জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, কংগ্রেসর দেশভাগ মেনে না নিলে দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা দেবে এবং দেশের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাত থেকে অন্য কোন দলের বা ব্যক্তির নেতৃত্বে চলে যাবে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর বক্তব্যের

মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের খুশি করা এবং কংগ্রেস দেশভাগের প্রস্তাব না নিলে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করতে মুসলমানদের প্ররোচিত করা।

দেশভাগের প্রস্তাবের ব্যাপারে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল ছিলেন দ্বিধাগ্রস্থ। কিন্তু গান্ধীর ৪৫ মিনিটের বক্তৃতায় তিনি এতটাই মোহিত হয়ে পড়লেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি দেশভাগের প্রবল সমর্থক হয়ে গেলেন। এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য দ্বিধাগ্রস্ত নেতারাও দেশভাগের সপক্ষে রায় দিলেন। ফলে দেশভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল (History of Freedom Movement in India, R. C. Majumdar, Vol-III, p-670)।

অহিংসা ও সেকুলারবাদের আড়ালে গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতি শুধু দেশভাগ করেই ক্ষান্ত থেকেছে তা নয়। ওই নীতি স্বাধীনতার পরেও দেশের সমূহ ক্ষতিসাধন করেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং এই ২৩ শতাংশ মুসলমান দেশের ৩২ শতাংশ জমি পৃথক করে পাকিস্তান হিসাবে পেয়েছিল। কাজেই সেই সময় সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ ছিল বিভক্ত ভারতের সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দুকে ভারতে নিয়ে আসা। কিন্তু গান্ধী এই গণ-বিনিময় বা poplation exchange-এর প্রবল বিরোধিতা করে বললেন যে,এটা এক অলীক ও অবাস্তব প্রস্তাব। তৎকালীন বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও এই গণ-বিনিময়-এর সমর্থক ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে সেই কাজ সমাধা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নেহরুও আর গণ-বিনিময়ের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করলে, সেই সময় গণ-বিনিময় অত্যন্ত জরুরী ছিল এবং তা হলে আজকের বহু সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতির ফলে মুসলমানরা বহাল তবিয়তে এদেশেই থেকে গেল, কিন্তু হিন্দুদের সবকিছু হারিয়ে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হিসাবে চলে আসতে হল।

এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, গান্ধীর প্রবল বিরোধিতার ফলেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারেনি। এককালে গান্ধী 'বন্দে মারতম্' গানের ভক্ত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন, ১৯০৫ সালের ২রা ডিসেম্বরের 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন, "এর (অর্থাৎ বন্দেমাতরমের) আবেদন খুবই মহৎ এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় তা শুনতেই অনেক সুমধুর। অনেক দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে অন্যান্য দেশের প্রতি কটাক্ষ করা হয় এবং নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বন্দেমাতরম্ সেই সব দোষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।"

কিন্তু পরবর্তীকালে যেই মাত্র তিনি বুঝতে পারলেন যে মুসলমানরা গানটি পছন্দ করে না। তৎক্ষণাৎ তিনি বন্দে মারতম্ গাওয়া বা আবৃত্তি করা যেখানে পারলেন বন্ধ করে দিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই স্বাধীনতার পর জহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টায় 'জন গণ মন' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হল। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি-তে বিতর্কের সময় নেহরু এই যুক্তি দেখালেন যে, সামরিক বাহিনীর বাজনার সঙ্গে বন্দে মারতম সুর মিল খায় না, কিন্তু জন গণ মন-র বেলায় সেই অসুবিধা নেই।

বর্তমান প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার যে, সেই তিরঙ্গা পতাকা আজ জাতীয় পতাকার মর্যাদার পেয়েছে, সেই পতাকাও গান্ধীর অপছন্দ ছিল। কারণ ওই পতাকা মুসলমানরা পছন্দ করত না। এ ব্যাপারে শ্রী নাথুরাম গডসে তাঁর 'Why I Assassinated Gandhi' গ্রন্থে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী গডসে লিখছেন, "১৯৪৬ সালে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের গণহত্যার ঠিক পরে গান্ধী যখন নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ভ্রমণ করছিলেন, তখন (নোয়াখালিতে) তাঁর সাময়িক বাসগৃহের মাথায় স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা তিরঙ্গা পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যেই মাত্র একজন সামান্য পথচারী মুসলমান গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে ওই পতাকার ব্যাপারে আপত্তি জানাল, গান্ধী তৎক্ষণাৎ তা নামিয়ে নেবার হুকুম দিলেন। লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসকর্মীর শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু যে পতাকা তাকে এক মিনিটের মধ্যে গান্ধী অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন, কারণ একজন অশিক্ষিত গোঁড়া গ্রাম্য মুসলমান তাতে খুশি হবে" (পৃষ্ঠা-৭৫, ৭৬)।

এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলার আছে। প্রথম দিকে গান্ধী হিন্দী ভাষার খুব ভক্ত ছিলেন এবং বলতেন যে, হিন্দী ভাষাই সর্বভারতীয় ভাষা হবার উপযুক্ত। কিন্তু পরে মুসলমানদের খুশি করার জন্য 'হিন্দুস্থানী' নামের আড়ালে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য দাবি করতে থাকেন (Koenraad Elst, Gandhi and Godse, Voice India, p-89)

দেশভাগের কয়েক মাস আগে যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পূর্বপাঞ্জাব ও দিল্লীতে আসতে শুরু করল, তখন গান্ধী সেইসব বিপন্ন হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "Hindus should never be angry against the Muslims even if the latter might make up their minds to undo their (Hindus) existence. If they pull all of us to the sword, we should court death bravely. ...We are destined to be born and die, then why need we feel gloomy over it?" —অর্থাৎ, "মুসলমানরা যদি হিন্দুদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলে, তবুও হিন্দুদের কখনোই উচিত হবে না মুসলমানদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করা। যদি তারা

আমাদের সবাইকে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলে, তবে আমাদের উচিত হবে বীরের মত সেই মৃত্যুকে বরণ করা।...আমাদের জন্ম এবং মৃত্যু অদৃষ্টের লিখন, তাই তা নিয়ে এত মন খারাপের কি আছে?" (৬/৪/১৯৪৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)।

এ ব্যাপারে তিনি আরও বললেন, "The few gentlemen from Rewalpindi who called upon me, asked me, what about those who still remain in Pakistan. I asked, why they all came here (Delhi)? Why they did not die there? I still hold on to the belief that we should stick to the place where we happen to live, even if we are cruelly treated there, and even killed. Let us die if the people kill us, but we should die bravely with the name of God on our tongue." অর্থাৎ, "রাওয়ালপিন্ডি থেকে যে সব লোকরা পালিয়ে বসেছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল, যে সমস্ত লোক (হিন্দু) এখনও পাকিস্তানে পড়ে রয়েছে তাদের কি হবে? আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, তোমরা কেন এখানে (দিল্লীতে) চলে এসেছো? কেন তোমরা সেখানে মরে গেলে না? আমি এখনও বিশ্বাস করি যে,আমরা যে যেখানে বসবাস করেছি, সে স্থান আমাদের কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়, এমন কি সেখানকার লোকদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলে বা মৃত্যু নিশ্চিত হলেও না। যদি সেই লোকেরা আমাদের হত্যা করে, তবে যাও, মুখে ভগবানের নাম নিতে নিতে তাদের হাতে বীরের মৃত্যু বরণ কর।" "Even if our men are killed, why should we feel angry with anybody? You should realise that even if they are killed, they have had a good and proper end." অর্থাৎ, "যদি আমাদের লোকদের (হিন্দুদের) হত্যা করা হয়, তবে কেন আমরা অন্য কারও (মুসলমানদের) ওপর ক্রুদ্ধ হব? যদি তাদের হত্যা করা হয় তবে তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে, তারা আকাঙ্ক্ষিত উত্তম গতিই লাভ করেছে। (২৩/৯/১৯৪৭ তারিখের ভাষণ)।

গান্ধী এ ব্যাপারে আরও বললেন, "If those killed have died bravely, they have not lost anything but earned something. ...They should not be afraid of death. After all, the killers will be none other than our Muslim brothers". অর্থাৎ, "যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা যদি সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে থাকে, তবে তারা কিছুই হারায়নি, বরং কিছু অর্জন করেছে। ...মৃত্যুর জন্য তাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা হত্যা করছে তারা তো আমাদেরই ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। তারা আমাদেরই মুসলমান ভাই।" (Shri Nathuram Godse, Why

I Assasssinated Gandhi, p-92 & 93; as quoted by Koenraad Elst in Gandhi and Godse, Voice of India, p-121).

এ প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা চলতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চলে আসা কয়েকজন উদ্বাস্তু হিন্দু গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলে গান্ধী আবার তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাবার উপদেশ দেন। যদিও ফিরে অর্থ ছিল নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি তাদের বলেন, "If all the Punjabis were to die to the last man without killing (a single Muslim). Punjab will be imortal. Offer yourselves as nonviolent willing sacrifices." অর্থাৎ, "(একটি মুসলমানকেও) হত্যা না করে, শেষ মানুষটি পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাবী (হিন্দু) যদি নিহত হয়, তবে পাঞ্জাব অমর হবে। তোমরা যাও, এবং অহিংসার স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত বলি হও।" (Collins and Lapierre, Freedom at Midnight, p-385). গান্ধীর এই সমস্ত কথাবার্তা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁকে 'মহাত্মা' আখ্যায় ভূষিত করা যতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে এবং আজও তাঁকে 'জাতির পিতা' বা 'মহাত্মা' হিসাবে মাথায় করে রাখা কতখানি যুক্তিযুক্ত হচ্ছে।

গান্ধীর মতে, মুসলমানরা হল হিন্দুর ভাই। তাই কোন হিন্দুর উচিত নয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে তিনি রাণা প্রতাপ, গুরুগোবিন্দ সিংহ, রাজা রণজিৎ সিংহ ও রাজা শিবাজীর নিন্দা করেন এবং বলেন, "they were misguided patriots" বা "তাঁরা ছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট দেশপ্রেমিক।" গান্ধী মনে করতেন যে, এই পৃথিবীতে একমাত্র তিনিই ছিলেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবিশিষ্ট দেশপ্রেমিক এবং আর সকলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। এবং তাঁর বিচারে জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, কামাল পাশা, ডি ভ্যালেরা, লেনিন ইত্যাদি সকলেই ছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট (Young India–9/4/1925)। কারণ এঁরা সকলেই হিংসায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।

তাঁর এই সব মন্তব্যের ফলে নতুন এক বিপদ দেখা দিল। দেশের এই সমস্ত হিন্দুবীরদের লক্ষ্যভ্রষ্ট বলার ফলে অনেক হিন্দুর মনে গান্ধীর প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হল। বিশেষ করে শিবাজীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বলার ফলে মারাঠীদের মধ্যে মহা অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাঁরা গান্ধীর ওপর ভয়ানক ক্ষেপে যান। পরে জহরলাল নেহরুকে গান্ধীর হয়ে ক্ষমা চাইতে হয় এবং এর ফলে তাঁদের অসন্তোষ কিছুটা হ্রাস পায়।

মুসলমানরা যখন হিন্দু বা অন্য কোন কাফের জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ চালায় তখন মার-দাঙ্গা, হত্যা, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির সাথে সাথে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে হিন্দু বা কাফের রমণীদের ওপর বলাৎকারও করে থাকে। আল্লার আদেশ, তথা কোরানের

নির্দেশ অনুসারেই তারা এই সমস্ত পাশবিক কাজ করে থাকে। ভারতে মুসলমান শাসনের আমলে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু নারী ধর্ষণ এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। লম্পট মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার বা মান-সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষার জন্যই তখন হিন্দু রমণীরা দলে দলে জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সতী হতেন।

দেশ বিভাগের আগে ও পরে পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর মুসলমানরা যে হামলা চালায়, হিন্দু-নারী ধর্ষণ তার একটা আবিশ্যক অঙ্গ ছিল। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে যে হিন্দু-নিধন যজ্ঞ হয়, তখনও হাজার হাজার হিন্দু রমণী ধর্ষিতা হন। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে, মুসলমানদের এই জঘন্য কাজের ব্যাপারে গান্ধী কি মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯২৬ সালের ৬ই জুলাইয়ের 'নবজীবন' পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন যে, "তিনি তাঁর বোনের সতীত্ব নষ্টকারী মুসলমানের পায়ে চুমু খাবেন" ("he will kiss the fact of the (Muslim) violator of the modesty of sister." (as quoted by Dhanajay Keer in his 'Mahatma Gandhi', p-473)।

দেশ বিভাগের প্রাক্কালে যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ মহিলারা মুসলমানদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ধর্ষিতা হচ্ছিলেন তখন গান্ধী তাদের বলেন, **কোন মুসলমান যদি কোন পাঞ্জাবী মহিলাকে ধর্ষণ করতে চায় তবে তাঁর উচিত হবে সেই মুসলমানের সঙ্গে সহযোগিতা করা, দাঁতের মধ্যে জিভ কামড়ে মরার মত শুয়ে থাকা।** (D Lapierre & L Collins, Freedom at Midnight, Vikas, p-479)

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন হিন্দু ও শিখরা উদ্বাস্তু হয়ে দিল্লীতে আসে তখন দেখা যায় যে, ৭৫০০০ কুমারী মহিলা অন্তঃসত্ত্বা। দিল্লীর কাপুর ক্লিনিকে এদের গর্ভপাত করানো হয়। যদিও সেই সময় ভারতীয় আইনে গর্ভপাত বে-আইনী ছিল তা সত্ত্বেও ভারত সরকার সমস্ত খরচা বহন করে। (The Other Side of Silence, Urvashi Butalia, Penguin Books.)

উপরিউক্ত সমস্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দুর দুঃখে গান্ধীর মন সামান্য পরিমাণেও বিচলিত হত না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য তাঁর প্রাণ সর্বদাই কাঁদত। তাঁর হিন্দু মুসলমানের মিলনের তত্ত্ব ছিল সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। এজন্য হিন্দুরাই সমস্তরকম ত্যাগ স্বীকার করবে, মুসলমানদের সমস্ত দুষ্কর্ম, অত্যন্ত গর্হিত অপরাধও হিন্দুরা মুখ বুঁজে সহ্য করবে। এটাই হল গান্ধীবাদী অহিংসা তথা সেকুলারবাদের মূল কথা।

বৃটিশ আমলে আজকের কেরালা রাজ্যের নাম ছিল ত্রিবাঙ্কুর এবং তা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। মালাবার ছিল এই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি ছোট জেলা, যার লোকসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। এই জেলায় বসবাসকারী মুসলমানদের 'মোপলা' বলা

হত এবং এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে, এক কালে আরবের বণিক, নাবিক ও মাঝিমাল্লাদের কিছু অংশ এই মালাবার জেলায় বসবাস করতে শুরু করে এবং তারা স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে এই মোপলা জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। বর্তমান লেখকের অনুমান যে, মোপলা শব্দটি মোল্লা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এই মোপলারা ছিল দরিদ্র এবং এরা প্রায় সকলেই নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের খেত-খামারে মজুরের কাজ করত। চরিত্রের দিক দিয়ে এরা ছিল খুবই হিংস্র এবং কারণে অকারণে এরা হিন্দুদের ওপর জিহাদ করত বা আক্রমণ চালাত। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে তারা ৩৫ বার হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়।

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে, গান্ধী যখন আসাম, শ্রীহট্ট, শিলচর ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় মোপলারা আবার হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালায়। আগস্ট মাসের ২০ তারিখে তারা বিনা প্ররোচনায় নিরীহ হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা, রক্তপাত, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, মন্দির অপবিত্রকরণ ইত্যাদি আসুরিক কাজকর্ম অবাধে চলতে থাকে। এই আক্রমণের নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, বীভৎসতা ও ব্যাপকতা ছিল অচিন্ত্যনীয়। হিন্দুদের সামনে তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ, নয় মৃত্যু)।

আলি মুসালিয়ার নামে এক জল্লাদ এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল। আক্রমণ বন্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর, এই ৫ মাস ধরে তা চলতে থাকে। সরকারকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ রাখতে হয়। সরকারি হিসাব মতে ২৩০০ হিন্দু নিহত এবং ১৬৫০ হিন্দু আহত হয়, যদিও বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা ছিল এর দ্বিগুণেরও বেশি।

গান্ধী বহু ক্ষেত্রে বলপূর্বক ধর্মন্তরকরণকে ভয়ঙ্কর কাজ বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু মোপলাদের বেলায় তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থেকেছেন। উপরন্তু তিনি তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এই মিথ্যা প্রচার করেছেন যে, মোপলাদের আক্রমণের সময় মাত্র একটি ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটেছিল। সব থেকে লজ্জার কথা হল, মোপলাদের নিরীহ হিন্দু হত্যাকে তিনি বীরত্বের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মোপলারা হল বীর (bullies) আর হিন্দুরা হল কাপুরুষ (Cowards)। মোপলাদের দোষ ঢাকার জন্য গান্ধী বলতেন যে, এর জন্য হিন্দুরাই দায়ী। তারাই মোপলাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তাই তারা বাধ্য হয়ে হিন্দুদের হত্যা করেছে। উপরন্তু তিনি মানবিকতার দোহাই দিয়ে হিন্দুদের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টাকে দমিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, মোপলাদের এ ভাবে নৈতিক সমর্থন দিয়ে তাদের রক্ষা করার ফলেই পরবর্তীকালে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা করতে উৎসাহিত হয়েছিল।

আরও চরম লজ্জার কথা হল, মোপলাদের এই জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে গান্ধী তার নিন্দা করেছেন। বৃটিশের সঙ্গে দাঙ্গাকারী মোপলাদের সংঘর্ষকে তিনি মোপলাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "মোপলারা হল ভারতের অন্যতম এক সাহসী জাতি। তারা ঈশ্বরভীরু এবং তারা যে সাহসিকতা দেখিয়েছে সেজন্য তাদের সোনা পুরস্কার দেওয়া উচিত (Dhanaujay Keer, Mahatma Gahdhi, p-402)। গান্ধীর এই মুসলমান তোষণকারী মিথ্যা প্রচারের ফলেই যে সব মোপলা দস্যু সেই সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হয়, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ আখ্যা দেওয়া হয়। সেই ধারা অনুসরণ করে আজও মুম্বাই-এর সেকুলার ও কমিউনিস্ট রাজনীতিকরা প্রতি বছর মোপলা দিবস পালন করে এবং মিটিং মিছিল করে।

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না, গান্ধী বেঁচে থাকলে আজ মুসলমান আতঙ্কবাদীদের দ্বারা কাশ্মীরের নিরীহ হিন্দু হত্যা, তাদের হিন্দু মন্দির আক্রমণ ও নিরীহ হিন্দু ভক্তদের হত্যা এবং অমরনাথগামী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের হত্যাকে তিনি মুসলমানদের বীরত্বের কাজ বলে বর্ণনা করতেন এবং আক্রান্ত হিন্দুদের কাপুরুষ আখ্যা দিতেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতিকে অনুসরণ করেই আজকের সেকুলার রাজনীতিক ও সেকুলার সংবাদ মাধ্যম গোধরায় হিন্দু হত্যাকারী মুসলমানদের দোষ ঢাকতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতিকে অনুসরণ করেই আজকের সেকুলার রাজনীতিক ও সেকুলার সংবাদ মাধ্যম গোধরায় হিন্দু হত্যাকারী মুসলমানদের দোষ ঢাকতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর অত্যন্ত হীন ও গর্হিত মুসলমান তোষণের নীতি অনুসরণ করেই আজকের সেকুলার সংবাদ মাধ্যম গোধরার আক্রান্ত হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। গান্ধী আক্রান্ত হিন্দুদের জন্য নয়, আক্রমণকারী মোপালাদের জন্য চাঁদা তুলে তহবিল তৈরি করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর সেই ধারা অনুসরণ করেই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা বাংলাদেশ বা কাশ্মীর বা গোধরায় নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য নয়, গুজরাটের ক্ষতিগ্রস্থ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য রাস্তায় নেমে চাঁদা তুলেছিল। তহবিল তৈরি করেছিল।

গান্ধী ও তাঁর মুসলমান তোষণকারী অহিংসার তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ এক সময় বলেন, "India will be free to the extent it succeeds in shaking off the spell of Gandhism". অর্থাৎ, "ভারতবর্ষ ততখানিই স্বাধীন হবে, গান্ধীবাদের যাদুকে সে যতখানি ঝেড়ে ফলতে পারবে" (as quoted by Ashutosh Lahiry in his "Gandhi in Indian Politics", p-221)। আজ

শ্রীঅরবিন্দের স্বর্গস্থ আত্মা অবশ্যই এটা দেখে পুলকিত হয়েছেন যে, ভারতের অন্ততঃপক্ষে একটি রাজ্যের হিন্দুরা অভিশপ্ত সেই গান্ধীবাদী যাদু মন্ত্রকে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে।

আজ গুজরাট যে রাস্তা দেখিয়েছে, ভারতের সমস্ত হিন্দুর কাছে সেটাই একমাত্র পথ। দেশের সমস্ত হিন্দুকে গান্ধীবাদী নপুংসতাকে জঞ্জালের মতই পরিত্যাগ করে শ্রীরামের লঙ্কা বিজয়ের আদর্শে জেগে উঠতে হবে। শ্রীশ্রীদুর্গার অসুর নিধনের মন্ত্রে জেগে উঠতে হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব ধ্বংসকারী পান্ডবের আদর্শকে সামনে রেখে জেগে উঠতে হবে। নির্বীর্জকারী গান্ধীবাদকে পরিত্যাগ করে মহারাণা প্রতাপ সিংহ, মহারানা সংগ্রাম সিংহ, গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাজা রণজিৎ সিংহ ও রাজা শিবাজীর আদর্শে দেশের হিন্দুকে প্রবল প্রতাপে হুঙ্কার দিয়ে জেগে উঠতে হবে। তবেই এই ভারতবর্ষ একদিন বীর্যবান, শক্তিমান ও বৈভবশালী ভারতবর্ষ হয়ে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে। কারণ মাননীয় ডাক্তারজী বলে গিয়েছেন, "হিন্দু জাগে তো দেশ জাগে।" সেই অমোঘ বাণী মিথ্যা হবার নয়। সেই বাণীকে আজ সাকার করার সময় উপস্থিত হয়েছে।

তড়িৎ-চুম্বকীয় বোমা ঃ আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডারে নবীনতম সংযোজন

বিগত ১৯০৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেনরি রুডলফ্ হার্জ দ্বারা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের আবিষ্কার যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন যুগেরসূচনা করেছে তা বলাইবাহুল্য। প্রথমে বেতার ও রাডার এবং বর্তমানে টেলিভিশন ও টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ য বিপ্লব এনে দিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সামরিক এবং অসামরিক, দুই ক্ষেত্রেই এর ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু বিগত ১৯৬০-এর দশকের আগে কারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব হয়নি যে, এই নিতান্ত নিরীহ জিনিসটাকে মানুষ মারার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে। বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, মানুষকে ভাজা করে মেরে ফেলা যেতে পারে। অত্যন্ত গোপন হলেও, বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এই অস্ত্র ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে। গত ২০০২ সালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমেরিকার তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামস্ফেল্ডের মুখ ফসকে এই গোপন সংবাদ কিছুটা প্রকাশ হয়ে যায়।

অনেকদিন আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা লক্ষ করে আসছেন যে, সৌর কলঙ্গ বা Sun-spot activity বেড়ে গেলে সূর্য থেকে নির্গত শক্তিশালী তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ, বিমান নিয়ন্ত্রণ ও আবহাওয়ার পূর্বানুমানের যন্ত্রপাতির কাজ বিঘ্নিত করে। কিন্তু এটা কল্পনা করা সম্ভব হয়নি যে, মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ওই রকমের শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ তৈরি করে যন্ত্রপাতির কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

১৯৬২ সালে আমেরিকা জমি থেকে ৩০ কিমি (প্রায় ১৯ মাইল) ওপরে একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এবং এর ফলে যে উচ্চশক্তির তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা ১২০০ কিমি দূরে অবস্থিত বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানকে বিঘ্নিত করে। এই ঘটনার পর থেকেই সামরিক কাজে উচ্চশক্তির বেতারতরঙ্গের ব্যবহারের জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ছাড়া অন্য কিভাবে উচ্চশক্তির বেতারতরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়.,তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। তখন [illegible]ই আমেরিকার নিউ টেক্সাস রাজ্যের কার্টল্যান্ড বিমানঘাঁটিতে অবস্থিত ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে কাজ করে চলেছেন। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয় বলে সেখানে ঠিক কোন্ কোন্ বিষয়ে কাজ হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে

অস্ট্রেলিয়ার বিমান বাহিনীর বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে, মার্কিন বিজ্ঞানীরা "হাই-পাওয়ার্ড মাইক্রো-ওয়েভ" বা HPM তৈরি করতে সক্ষম "ভারকেটর" (Vircator) নামে একটি অস্ত্র ইতিমধ্যে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁরা HPM তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেই বিষয়টা বর্তমান প্রসঙ্গে অতটা গুরুত্বপর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সেই উচ্চশক্তিসম্পন্ন বেতার তরঙ্গ বা HPM প্রয়োগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর কী ক্ষতি করা যায়। তবে এটুকু জানা দরকার যে, "ভারকেটর"-কে কাজ করাতে স্বল্পশক্তির একটা বিস্ফোরণের দরকার এবং বিমান বা ক্ষেপনাস্ত্রের দ্বারা একে লক্ষ্যস্থল নিয়ে যাওয়া চলে।

আজ উন্নতমানের যত সমরাস্ত্র আছে তাকে চালিত করে অতিসূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক কন্ট্রোলার বা নিয়ন্ত্রক। এইসব নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতির সূক্ষ্মতা আজ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, দু-একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। আজ দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত পাইলটবিহীন মার্কিন বিমান ইরাক ও আফগানিস্তানের লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তাদের লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করছে, যা মাটির তলায় গিয়ে বাংকার ধ্বংস করে জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের মেরে ফেলছে। গত বছর এই রকম একটি পাইলটবীন বিমান ইয়েমেনে আলকায়দা জঙ্গিদের একটি জিপকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয় ও সব জেহাদীকে হত্যা করে। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, "ভারকেটর" বা তা থেকে নির্গত HPM এর সাহায্যে অতিশয় সূক্ষ্ম ওইসব স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে অকেজো করে দেওয়া সম্ভব।

এই সমস্ত কথাবার্তার পিছনে যে মূল উদ্দেশ্য আছে তা হল, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ করার জন্যও প্রয়োজন হয় অতি সূক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। কাজেই HPM প্রয়োগ করে ওইসব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে বিকল করে দিতে পারলে পারমাণবিক বোমাটাই অকেজো হয়ে যাবে। যেসব দেশের পারমাণবিক অস্ত্র আছে তারা সেই অস্ত্রকে সাধারণত মাটির অনেকনীচে বাংকার তৈরি করে সেখানে সুরক্ষিত করে রাখে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, যে কোনও বেতার তরঙ্গ বিদ্যুতে অপরিবাহী সমস্ত বাধাকে ভেদ করে যেতে পারে। কাজেই HPM -এরপক্ষে মাটির নীচে সুরক্ষিত সেই পারমাণবিক অস্ত্রকে বিকল করে দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, HPM -র গোয়েন্দারা যদি আবিষ্কার করতে পারে যে, পাকিস্তান ঠিক কোন জায়গায় তার পারমাণবিক অস্ত্র সুরক্ষিত করে রেখেছে তবে জাহাজ, বিমান বা ক্ষেপনাস্ত্রের সাহায্যে সেখানে "ভারকেটর"-এর বিস্ফোরণ ঘটালে তা থেকে নির্গত HPM সেই মজুদ অস্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে। তবে এ ব্যাপারে তেমন উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই, কারণ আমাদের অস্ত্রও পাকিস্তান বিকল করে দিতে পারে।

এসবের পিছনে রয়েছে আরও একটি সমস্যা। আগেই বলা হয়েছে যে, বর্তমানে আমেরিকাই যুদ্ধের কাজে সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চলেছে। কাজেই ভয়ের ব্যাপার হল, আমেরিকা অন্য কারও ওপর HPM বোমা ব্যবহার করলে তা আমেরিকার

নিজের যন্ত্রপাতিকেও অকেজো করে দিতে পারে। সামরিক ভাষায় একে "ভ্রাতৃঘাতী আঘাত" বলে। এ ব্যাপারটা নতুন নয়। বড় বড় জেট বিমানকে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষিত করারজন্য যে ব্যবস্থা করা হয় এটা তারই অনুরূপ। এইসব বিমানের বাইরের ধাতুর আচ্ছাদনই তাকে HPM -এর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। বিমানের অভ্যন্তর থেকে HPM প্রয়োগ করে খুব সহজেই তাকে কাবু করা চলে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। এমন কি, কোনও সন্ত্রাসবাসী ছোট মাপের কোনও যন্ত্রের সাহায্যে HPM প্রয়োগ করে যেকোনও যাত্রী বিমানকে ভূপাতিত করতে পারে।

এ ব্যাপারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, উচ্চ শক্তির HPM প্রয়োগ করে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সঙ্গে মানুষকেও অকেজো করা বা হত্যা করা সম্ভব। আজকাল আমাদের দেশেও মাইক্রোওয়েভ ওভেন-এর সাহায্যে খাবার গরম করা জনপ্রিয় হচ্ছে। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে খাবার গরম করা হয় সেই একই পদ্ধতিতে HPM প্রয়োগ করে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া চলে। মার্কিন সামরিক বিভাগ এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত যেসব গবেষণা করেছে তাতে দেখা গেছে যে, মিলিমিটার মাপের HPM ব্যবহার করে কোনও একজন মানুষের তাপমাত্রা ৭৫০ মিটার দূর থেকে ৫৫ ডিগ্রিত সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া চলে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কাছ থেকে প্রয়োগ করলে তা কোনও মানুষকে ভাজা করে ফেলতে সক্ষম।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাড়িঘর, দেওয়াল, বাংকার ইত্যাদি দ্বারা HPM কে রোখা যায় না। তাই HPM প্রয়োগ করে ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থাকা কোনও লোককে ভাজা করা চলে। তাই এই যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে গোপন জায়গায় লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের কাবু করা সম্ভব হবে। কাজেই কোনও বাড়ি বা এলাকাকে সন্ত্রাসবাদী মুক্ত করতে ঘরে ঘরে গিয়ে তল্লাশি চালাবার আর প্রয়োজন হবে না। ওইসব কাজে রত সৈন্যদের মৃত্যুর হারও অনেক কমে যাবে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই কাজে প্রয়োগ করার জন্য যে যন্ত্রটি তৈরি করেছেন, তার নাম "সেলফ্ ডিনায়েল" (Self Denial) বা SD।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আরও উন্নতমানের SD তৈরির চেষ্টা করছেন, যা আরও দূর থেকে প্রয়োগ করা চলবে এবং প্রয়োগ করলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সাময়িকভাবে অকেজো হয়ে যাবে। অথবা সাময়িকভাবে তার মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। কিন্তু এইসব অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যাপারে মানবাধিকার কমিশনের কার্যকর্তারা আপত্তি করতে শুরু করেছেন। তাঁরা বলেছেন, HPM বা SD-এর দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কিছু কিছু শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। তাই তা প্রয়োগ করা বেআইনি।

বর্তমানে পৃথিবীতে সব থেকে ভয়ের ব্যাপার হল, অনেক নীতিহীন (rogue) রাষ্ট্র দুরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ও পারমাণবিক বোমা মজুদ করে ফেলেছে। আমেরিকা যদি তার তড়িৎচুম্বকীয় বোমা ব্যবহার করে ওইসব মারণাস্ত্রকে অকেজো করে দিতে পারে তবে ওইসব ভয়ঙ্কর অস্ত্রের মজুত ভাণ্ডার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

হিন্দুর শোক দিবস ১৫ আগস্ট

আবার এসে গেল ১৫ আগস্ট, ইংরাজ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবার দিন। ১৫ আগস্ট তাই খুসির দিন, সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু হিন্দুর কাছে ১৫ আগস্ট কি শুধু আনন্দ উৎসব করার দিন, না ওই দিনটি শোকের দিন এবং কাঁদবার দিনও বটে। কারণ ওই দিন দেশমাতৃকাকে কেটে তিন টুকরো করা হয়েছিল। খণ্ডিত মায়ের রক্তাক্ত শরীরের ওপর দিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। কোটি কোটি হিন্দু ভিটেমাটি ও সর্বস্ব খুইয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল নতুন ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু রমণীর কান্না ও আর্তনাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল সেই পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেই পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর রক্তে কর্দমাক্ত হয়েছিল পাকিস্তানের মাটি। তাই হিন্দুর কাছে ১৫ আগস্টের স্মৃতি মধুর স্মৃতি, সুখের স্মৃতি হতে পারে না। সেই স্মৃতি হল করুণ এক ভাগ্য বিপর্যয়ের স্মৃতি। যতদিন এই খণ্ডিত দেশ আবার জোড়া না লাগছে ততদিন কোটি কোটি হিন্দুর জন্মস্থান হয়ে থাকবে বিদেশ। সেখানে যাবার তার অধিকার থাকবে না, এই বেদনার কথা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে?

কিন্তু কেন হয়েছিল এই দেশভাগ? কারা করেছিল এই দেশভাগ? কারা দেশ মাকে খণ্ডিত করার দাবি করেছিল, আর কারা মেনে নিয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সেই অযৌক্তিক দাবি? ইতিহাসের পাতা থেকে উধাও করে দেওয়া হচ্ছে সেইসব চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দুর প্রতি চরম অবজ্ঞার সেই সব কাহিনী। মুছে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুকে প্রতারিত করা, প্রবঞ্চনা করার সেইসব করুণ ইতিহাস। তাই হিন্দু আজ বিভ্রান্ত। এইসব প্রতাকরদের, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের সনাক্ত করতে সে ভ্রমসঙ্কুল। কারও মতে, দেশভাগ বৃটিশ চক্রান্তের ফল। কারও মতে, দেশভাগের জন্য দায়ী হল কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা। আজও হিন্দু আঙুল তুলে সমস্বরে বলছে না যে, দেশ ভাগের জন্য মূলতঃ দায়ী হল আরবের এক অসহিষ্ণু তত্ত্ব, যার নাম ইসলাম এবং আরবের এক গ্রন্থ, যার নাম কোরান। দায়ী সেই গ্রন্থের প্রভাবে বিকৃত মস্তিষ্ক এই দেশেরই এক ধরণের মানুষ, যাদের নাম মুসলমান।

আরও আশ্চর্যের ব্যপার হল, আজও অনেক হিন্দু বিশ্বাস করে যে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা গান্ধীর মতকে উপেক্ষা করেই দেশভাগ মেনে নয়েছিলেন। তাদের এই বিশ্বাস কতটা

সত্য তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হল, সেইসময় গান্ধী প্রকাশ্য সভায় বলতেন, "vivisect me before you vivisect India"—অর্থাৎ 'দেশকে খণ্ডিত করার আগে আমাকে খণ্ডিত কর।' আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই যে, সভা সমিতিতে গান্ধী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেছিলেন।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ, লাহোর বৈঠকে মুসলিম লিগের নেতারা সর্বপ্রতম দেশভাগ ও পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করে। তাদের সেই দাবিকে সমর্থন করে গান্ধী দিন দশ পরে, ৬ এপ্রিলের 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছেন—"দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। বর্তমানে আমরা একটা যৌথ পরিবারের মতই বসবাস করছি। তাই মুসলমান এই মত পোষণ করে যে মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি, যাদের সঙ্গে হিন্দু বা অন্য জনগোষ্ঠীর কোন মিল নেই, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে তাদের বিরত করতে পারে। এবং সেই ভিত্তিতে তারা যদি দেশ বিভাগ চায় তবে অবশ্যই দেশভাগ করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে হিন্দুরা তার বিরোধিতা করতে পারে।"

পাঠকের হয়তো স্মরণ অছে যে, ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন দেশ বিভাগের সম্যসা প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিল, তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার ১২ জুনের বৈঠকে স্থির করে যে, অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ১৪ ও ১৫ জুনের অধিবেশনে দেশবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। সেই অনুসারে ১৪ জুন নতুন দিল্লিতে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দেশ বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসের অনেক বিশিষ্ট নেতা, যেমন পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, চৈতরাম গিদোয়ানি, ডাঃ এস কিচলু প্রমুখেরা দেশ ভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এই সময় গান্ধী সবাইকে থামিয়ে দেশ ভাগের স্বপক্ষে ৪৫ মিনিট ধরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তার বক্তব্যের মূল বিন্দু ছিল দুটি। প্রথমত, দেশভাগ মেনে না নিলে দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা দেবে (অর্থাৎ মুসলমালরা অসন্তুষ্ট হবে এবং দেশব্যাপী দাঙ্গা শুরু করবে) এবং দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের হাত থেকে অন্য কোন দল বা ব্যক্তি (অর্থাৎ নেতাজীর হাতে নেতৃত্ব যাবে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, তার বক্তব্যের মূল সুর ছিল দেশভাগ মেনে নিয়ে মুসলমানদের খুশি করা। অন্যথায় দেশব্যাপী দাঙ্গা শুরু করতে মুসলমানদের প্ররোচিত করা।

যাই হোক, দেশ বিভাগের প্রশ্নে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ছিলেন তখনও দ্বিধাগ্রস্ত এবং গান্ধীর ৪৫ মিনিট ভাষণে তিনি এতটাই মোহিত হয়ে পড়লেন যে তখনই তিনি দেশ ভাগের একজন প্রবল সমর্থক হয়ে গেলেন। এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য দ্বিধাগ্রস্ত নেতারাও দেশ ভাগের পক্ষে রায় দিলেন। ফলে দেশভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল।

অহিংসা ও সেকুলারবাদের আড়ালে গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতি শুধু দেশভাগ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। স্বাধীনতার পরেও তা হিন্দুর প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে এবং এখনও করছে। সেই সময় অবিভক্ত ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং এই ২৩ শতাংশ মুসলমান দেশের ৩২ শতাংশ জমি পাকিস্তান হিসাবে পেয়ে যায়। কাজেই তখন সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ ছিল খণ্ডিত ভারতের সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দুকে ভারতে নিয়ে আসা। কিন্তু গান্ধী এই জন-বিনিময়-এর প্রবল বিরোধিতা করে বলেন যে,—"এটা এক অলীক ও অবাস্তব প্রস্তাব।" তৎকালীন বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনও এই জন-বিনিময়ের সমর্থক ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে এই কাজ সমাধা করতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু গান্ধীর প্রবল বিরোধিতার ফলে নেহরু কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। অথচ বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে সেই সময় জন-বিনিময় ছিল একান্ত জরুরি। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরা দাঙ্গা শুরু করলে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাঞ্জাবে ও দিল্লিতে আসতে শুরু করে। তখন গান্ধী সেইসব বিপন্ন হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "মুসলমানরা যদি হিন্দুদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলে, তবুও হিন্দুদের কখনোই উচিত হবে না মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা। যদি তারা আমাদের সবাইকে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলে, তবে আমাদের উচিত হবে বীরের মতো সেই মৃত্যুকে বরণ করা। জন্ম-মৃত্যু অদৃষ্টের লিখন, তাই নিয়ে এত মন খারাপের কি আছে?" (৬.৪.১৯৪৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)।

এব্যাপারে তিনি আরও বললেন, "রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যেসব লোকেরা পালিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, যে সমস্ত লোক (হিন্দু) এখনও পাকিস্তানে পড়ে রয়েছে, তাদের কি হবে? আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, তোমরা কেন এখানে (দিল্লিতে) চলে এসেছো? কেন তোমরা সেখানে মরে গেলে না? আমি এখনও বিশ্বাস করি আমরা যে যেখানেজন্মেছি এবং বসবাস করেছি, সে স্থান আমাদের কখনও ত্যাগ করা উচিত না, এমন কি সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে নিষ্ঠুরব্যবহার পেলে বা মৃত্যু নিশ্চিত হলেও না। যদি সেই লোকেরা তোমাদের হত্যা করে, তবে যাও, মুখে ভগবানের নাম নিতে নিতে তাদের হাতে বীরের মৃত্যু বরণ কর। যদি আমাদের লোকেদের (হিন্দুদের) হত্যা করা হয়, তবে কেন আমরা অন্য কারও (মুসলমানদের) ওপর ক্রুদ্ধ হব? যদি তাদের হত্যা করা হয় তবে তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে,তারা আকাঙ্খিত উত্তম গতিই লাভ করেছে।" (২৩.৯.১৯৪৭ তারিখের ভাষণ)।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, "যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা যদি সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে থাকে, তবে তারা কিছুই হারায়নি, বরং কিছু অর্জন করেছে। মৃত্যুর জন্য আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়, প্রকৃতপক্ষে যারা হত্যা করছে তারা তো আমাদের ভাই

ছাড়া আর কেউ নয়। তারা তো আমাদেরই মুসলমান ভাই।" (Gandhi and Gose, Koenraad Elst, Vioce of India, P-121)। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চলে আসা কয়েকজন হিন্দু গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলে গান্ধী তাদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে উপদেশ দেন এবং বলেন, "একটি মুসলমানকেও হত্যা না করে শেষ মানুষটি পর্যন্ত সকল পাঞ্জাবী (হিন্দু) যদি নিহত হয়, তবে পাঞ্জাব অমর হবে। তোমরা ফিরে যাও এবং অহিংসার স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত বলি হও" (Freedom of Midnight; Colins and Lapierre, P-385)।

গান্ধী ও তাঁর মুসলমান তোষণকারী অহিংসার তত্ত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ বলেন, India will be free to the extent it, succeeds in shaking off the spell of Gandhism অর্থাৎ, 'ভারতবর্ষ ততখানিই স্বাধীন হবে, গান্ধীবাদের যাদুমন্ত্রকে সে যতখানি ঝেড়ে ফেলতে পারবে' (Gandhi in Indian Politics, Ashutosh Lahiry, P-221)। তাই এই ১৫ আগস্টের দিনে সমস্ত হিন্দুকে সেই গান্ধীবাদের যাদুকে ঝেড়ে ফেলার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে এবং তা হলেই ভারতবর্ষ এক স্বাভিমানী ও বীর্যবান হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ অসন লাভ করার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

ইউরো-র আবির্ভাব ঃ ডলারের বিশ্বজোড়া আধিপত্যের অবসানের ইঙ্গিত

গত ইংরেজি নববর্ষের দিন (১৯৯৯) ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে চালু হয় এক নতুন মুদ্রা, নাম ইউরো। মোট ১৫টি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত, তারমধ্যে ১২টি নতুন নাম পেল—ইউরো জোন বা ইউরো-১২। এই ইউরো চালু করার জন্য ঢালাই করা হয়েছে ৫০০০ কোটি ধাতুর মুদ্রা এবং ছাপানো হয়েছে ১৪৫০ কোটি কাগজের নোট। উপরিউক্ত ইউরো-১২ দেশগুলোর ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ লোক গত পয়লা জানুয়ারি থেকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে এইসব নতুন নোট ও খুচরা মুদ্রা।

প্রথম দুই মাস লোকেরা নতুন ও পুরনো, দুই রকমের মুদ্রা ও নোট ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুরনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, ইতালির লিরা, জার্মানির মার্ক, স্পেনের লেসেটা, নেদারল্যান্ডের গিলডার, সবই ইতিহাসেপর্যবসিত হবে। থাকবে শুধু ইউরো।

এই নতুন মুদ্রা চালু হওয়ার ফলে ইউরো-১২ দেশগুলোর খুবই সুবিধা হল। এখন তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে গেলে মুদ্রার বদল করতে হবে না। এই ইউরো দিয়েই তারা যেকোনো দেশে বেচাকেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে। কিন্তু তারচেয়েও একটা বড় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ইউরোপের নেতাদের বিশ্বাস যে, এক মুদ্রা চালু করার ফলে ওই দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যবন্ধন বাড়বে। ফলে জন্ম নেবে এক ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ। ভবিষ্যতে এই ঐক্যবন্ধন অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে খুবই উপকারী হবে।

সকলের জন্য এক মুদ্রা চালু করার মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ে তোলার চিন্তা সর্বপ্রথম মাথায় আসে দুই রাষ্ট্র প্রধানের। এঁরা হলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতেরোঁ এবং জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোল। গত ১৯৮৯ সালে এই দুই নেতা ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ১৫টি সদস্য দেশের কাছে তাঁদের পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। তখন ১৫টির মধ্যে ১১টি দেশ এই প্রস্তাবে সম্মতি জানায়। যে ৪টি দেশ অসম্মতি জানায় তারা হল সুইডেন, ডেনমার্ক, ব্রিটেন ও গ্রিস। পরে অবশ্য গ্রিস তার মত বদল করে এবং ইউরো জোটে যোগ দিতে রাজি হয়।

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, হঠাৎ এক ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ে তোলার চিন্তা ওইসব নেতাদের মাথায় এল কেন? জবাবে এটাই বলতে হয় যে, এর কারণ নিহিত রয়েছে অনেক গভীরে। এক সময় এইসব দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ এবং সমগ্র আমেরিকা ও সমগ্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ গায়ের জোরে দখল করে নিজ নিজ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সেইসব অধীনস্থ দেশ লুণ্ঠন করে তারা তখন ফুলে-ফেঁপে মোটা হয়েছিল। অধীনস্থ সেই সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে তখন তাদের মধ্যে চলত কাড়াকাড়ি, মারামারি। চলত নিয়ত সংঘাত। এই কাড়াকাড়িকে কেন্দ্র করেই তাঁরা দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ করেছিল। তখন এইসব দেশের মধ্যে ছিল চরম শত্রুতার সম্পর্ক।

কিন্তু সেই চিত্র আজ বদলে গিয়েছে। বিদেশী সাম্রাজ্য ও তার লুণ্ঠনের অবসানের ফলে তারা হারিয়েছে তাদের আর্থিক প্রাধান্য। হারিয়েছে বিশ্বে আধিপত্য করার শক্তি। পক্ষান্তরে জেগে উঠেছে এশিয়া। আর্থিক ক্ষমতা ও সামরিক শক্তিকেন্দ্র পশ্চিম থেকে ক্রমে সরে আসছে পূর্বে। পূর্বের এই আর্থিক ও সামরিক শক্তিকে আজ বিচ্ছিন্নভাবে ইউরোপের কোনও একটি দেশের পক্ষে মোকাবিলা করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী আমলের সমস্ত তিক্ততা ভুলে গিয়ে তাদের কাছে আজ জরুরী হয়ে পড়েছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

যাইহোক, রাষ্ট্রপতি মিতেরোঁ ও চ্যান্সেলর কোল-এর চেষ্টার ফলে সকলের জন্য এক মুদ্রা প্রচলনের কাজ এগিয়ে চলতে থাকে। এর সূত্র ধরেই গত ১৯৯৯ সালের পয়লা জানুয়ারি খাতায় কলমে ইউরো মুদ্রা চালু হয়। ওইদিন ইউরো জোন-এর ১১ দেশের নেতারা ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর রাজধানী ব্রাসেলস্-এ মিলিত হয়ে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থিত ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা ই সি বি-কে সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে মেনে নেয় এবং মুদ্রা সংক্রান্ত সমস্ত দায়দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেয়। তখন স্থির হয় যে আগামী ৩ বছরের মধ্যে ই সি বি ইউরো নোট ও খুচরো মুদ্রা বাজারে ছাড়বে এবং ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব মুদ্রার সঙ্গে ইউরো-র একটা নির্দিষ্ট বিনিময় হার অনুসারে কাজ চলতে থাকবে।

ওইদিনই ইউরোজোন-এর ১১টি দেশ তাদের হিসাবপত্র, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট, জিনিসপত্রের দাম, শেয়ারের দাম ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউরো ব্যবহার করা শুরু করে। ফলে ওইদিনই ইউরো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুদ্রা ব্যবস্থার মর্যাদা লাভ করে। আমেরিকার ডলারের পরেই ইউরো তার স্থান করে নেয়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ইউরো ডলারকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থান দখল করতে পারবে কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করতেও ইউরো কতটা সফল হবে, সে ব্যাপারে নানামুনির নানা মত। আয়ারল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ চার্লস ম্যাকক্রিভি বলেন, 'এটা একটা পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ এবং কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে, এই পদক্ষেপ কতটা সফল হবে।' ইতালির অর্থনীতিবিদ কার্লো সিয়াম্পি বলেন, "রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে এটা

একটা প্রাথমিক, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপ।' ই সি বি-র ডিরেক্টর উইম ডুইসেনবার্গ বলেন, 'ইউরো শুধু একটা মুদ্রা মাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। ইউরো হল ইউরোপীয় ঐকক্যের প্রতীক।" তবে জার্মানির অর্থমন্ত্রী ওয়ার্নার মুলার দুঃখ করে বলেন, "ব্রিটেনের মতো একটি প্রভাবশালী দেশ যোগ না দেওয়ার ফলে ইউরোপীয় ঐক্য মার খাবে।"

আর্থিক মানদণ্ডে বিচার করলে ১২টি দেশের ইউরোজোন-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমকক্ষ বলা চলে। গত ২০০০ সালে আমেরিকার মোট উৎপন্ন সম্পদ (জি ডি পি) ছিল ৯.২ লক্ষ কোটি ডলার। সেখানে ইউরোজোন-এর ১২টি দেশের মিলিত মোট উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭.৯ লক্ষ কোটি ডলার। ওই বছরেই আমেরিকা বাণিজ্য করেছে মোট বিশ্ব বাণিজ্যের ১৭ শতাংশ। কিন্তু ইউরো-১২ দেশগুলো বাণিজ্য করেছে ১৯ শতাংশ। কাজেই বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলার যে প্রাধান্য ভোগ করছে তা আমেরিকার বাণিজ্যের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডলারের প্রাধান্য কতটা, এ ব্যাপারে ব্যাঙ্ক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট একটা সমীক্ষা চালায়। তাতে দেখা যায় যে, বিশ্বের ৮৭ শতাংশ আন্তর্জাতিক বেচাকেনা এবং ৪৫ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ ডলারে হয়। তছাড়া বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোতে যত বৈদেশিক মুদ্রা মজুদ আছে, তার ৫০ শতাংশ রয়েছে ডলারে।

বিশ্বব্যাপী ডলারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আমেরিকা আজ নানাভাবে লাভবান হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে ডলারের যত নোট আদান-প্রদান হচ্ছে একমাত্র আমেরিকাই তা ছেপে বের করার অধিকারী। এই কাজে কী বিশাল পরিমাণ নোটের প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা চলে। বইপত্র ছাপানোর মতো কাগজের নোট ছাপানোও একটা ব্যবসা যাকে 'সিগনোরেজ' বলে। এই 'সিগনোরেজ' থেকে প্রতি বছর আমেরিকার প্রায় ৮০০ কোটি ডলার আয় হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে সরকারি স্তরে যে ঋণ দেওয়া নেওয়া হয়, তারজন্য একজন গ্যারান্টার দরকার। যেহেতু ডলার সকলের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য তাই ডলারের দেশ আমেরিকা ওইসব ঋণ পত্রে গ্যারান্টার হিসাবে সই করে থাকে। এই কাজের জন্য ঋণের একটা অংশ তাকে দিতে হয়। আন্তর্জাতিকভাবে একে বলে বন্ড বাজার। লন্ডন বিজনেস স্কুলের রিচার্ড লোর্টেস এবং লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর হেলেন রে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই বন্ড-বাজার থেকে প্রতি বছর আমেরিকার ৫০০ কোটি থেকে ১০০০ কোটি ডলার আয় হয়।

ডলারের বিশ্বজনীনতার জন্য আমেরিকা সব থেকে বড় যে সুবিধা ভোগ করে তাহল, কোনও দেশের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক ঘাটতি হলে নিজের ঘরোয়া মুদ্রা ডলার দিয়েই তা পরিশোধ করতে পারে। দু'বছর আগে চীনের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যিক ঘাটতি ১০০

কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। আমেরিকা এই ঘাটতি তার নিজস্ব মুদ্রা ডলার দিয়েই পরিশোধ করতে সক্ষম। কিন্তু এই বাণিজ্যিক ঘাটতি চীনের হলে সে তার ঘরোয়া মুদ্রা ইউয়ান দিয়ে তা শোধ করতে পারত না। সেই রকম, ইউরো-১২ দেশগুলোর সঙ্গে আমেরিকার আজ যে বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে তা যদি তাকে ইউরো-তে শোধ করতে বলা হয় তা হলে বাজার থেকে ইউরো কিনে তা শোধ করতে হবে।

কাজেই ইউরো-র আবির্ভাব যে আমেরিকার এইসব সুযোগ সুবিধার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে তা বলাই বাহুল্য। ইউরো যত শীঘ্র নিজেকে বিশ্বের এক অন্যতম বৃহৎ ও স্থিতিশীল মুদ্রা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি ডলারের বিশ্বজোড়া আধিপত্য ও প্রাধান্য খর্ব হবে। এব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ইনষ্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকনমিজ-এর ডিরেক্টর ফ্রেড বার্গষ্টেন বলেন, "খুবই শীঘ্রই আমরা ডলারের আধিপত্যকে খর্ব করে ইউরোকে তুলে ধরতে পারব।"

বার্গষ্টেন-এর উপরিউক্ত মন্তব্যকে খুব একটা তাচ্ছিল্য করা চলে না। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে ইউরোর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটতে শুরু করবে। প্রথমত, ইউরোজোনের ১২টি দেশের মধ্যেকার বাণিজ্য আর বৈদেশিক বাণিজ্য থাকবে না। ইউরোর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তা আন্তবার্ণিজ্যে পরিণত হবে। ফলে ওইসব দেশের ব্যাঙ্কগুলোকে আর আগের মত ডলার মজুদ করে রাখার প্রয়োজন হবে না। পোর্টেস-এর মতে, এরফলে বিশ্বের মুদ্রা বাজারে ৫০০০ কোটি থেকে ২৩০০০ কোটি উদ্বৃত্ত ডলার এসে যাবে। ফলে ডলারের দাম কমে যাবে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আজ যে বৈদেশিক বাণিজ্য করছে, তা সবই করছে ডলারের মাধ্যমে। কিন্তু ইউরো এসে যাওয়ার ফলে ইউরো-১২ দেশগুলোর সঙ্গে তারা ইউরোর মাধ্যমে বাণিজ্য করতে পারবে। ফলে ওইসব দেশগুলো ডলারের মজুদ কিছু কমিয়ে ইউরোর মজুদ গড়ে তুলবে।

পোর্টেসের মতে, এরফলে আরও প্রায় ৭৭৫০ কোটি উদ্বৃত্ত ডলার বিশ্বের মুদ্রা বাজারে এসে যাবে। ফলে ডলারের দাম আরও কমে যাবে। পোর্টেস-এর অনুমান, উপরিউক্ত কারণগুলোর জন্য বিশ্ব বাজারে ডলারের দাম অন্তত পক্ষে ৪০ শতাংশ কমে যাবে।

আজ ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের সব দেশগুলোকেই বৈদেশিক ঋণের সুদ এবং ঋণ পরিশোধের কিস্তি, সবই ডলারে দিতে হয়। কাজেই ডলারের দাম ৪০ শতাংশ কমে গেল উপরিউক্ত সুদ ও ঋণের কিস্তির মূল্যমানও ৪০ শতাংশ কমে যাবে। অর্থাৎ এক কথায়, বৈদেশিক ঋণের পরিমাণও ৪০ শতাংশ কমে যাবে। তাই শক্তিশালী ও স্থিতিশীল মুদ্রা হিসাবে আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরোর আধিপত্য বাড়লে ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে তা হবে এক আশীর্বাদ।

বিষয়সূচী

ও

ক

গ

চ

জ

ব

ভ

ম

এই লেখকের অন্যান্য বই

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা	১২০.০০
মার্কস ও মার্কসবাদীদের অজ্ঞতা	২৫.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম	১২.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা	১০.০০
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ ঃ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা	৩৫.০০
এক নজরে ইসলাম	৩০.০০
Three Decrees of Islam	১০.০০
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত (বাংলা)	৫.০০
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত (হিন্দী)	১৫.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি	৫০.০০

Muslim Magazine upholds Author's View
Indo-pak Friendship : Muslims' Psyche is Responsible
Dr. R. Brahmachari

I appreciate the noble efforts of the organisers of the "Pakistan-India People's Forum for peace and democracy (PIPFPD)" for holding its two-day convention on November 21-22,1998, in Peshwar, Pakistan. There is no doubt that every peace- loving citizen of India and Pakistan would hail their endeavour to establish peace and amity between the people of these two neighbouring countries. The address of Mr. IA Rahaman, Chairman of the Pakistan chapter of the forum, on this occasion urging the two governments to put an end to further conduct of nuclear tests and consequent nuclear arms race, is also extremely praiseworthy (Islamic Voice, Jan. 1999).

But I would like to draw your attention to the dark and gloomy side of the affair. The November 30,1998 edition of time carries interviews with the Indian defense minister George Femandes and the Pakistan nuclear scientist Abdul Quadeer Khan, which are worth mentioning in the present context. While commenting on the present Indo-Pak relation, Fernandes said, "I look at a Pakistani as the flesh of our flesh and the blood of our blood. We are two different nations but one people". But in his reply to a similar question. Abdul Qadeer Khan said, "There are some similarities. But we are basically different. We are Muslims and they are Hindus. We eat cows. They worship cows. That we lived on the same land and spoke the same language does not make us the same people." While the comment of Fernandes reflects an attitude of tolerance, love and unification, friendship and peace, that of Khan reflects extremely harmful, sinister and secessionist Muslim psycho-profile. The above comment of Abdul Quadeer Khan also shows to what extent the faith in Islam can distort the thought process of even a highly educated scientist like him.

There is no doubt that this secessionist Muslim mindset has given birth to the "Two Nation Theory" that culminated in the division of this great ancient. country into three pieces through fratricidal blood-bath and the bitterness thus generated is now proceeding towards a nuclear conclusion. And the history of the forth-coming days will have no other alternative than to accuse the said secessionist Islamist tendency for all these grave consequences. So it appears that, unless the Pakistanis mend their thought process, all the noble efforts of PIPFPD is destined to be confined to rhetoric alone without yielding anything in practice. So long as the doctrine of hatred continues to guide the people of Pakistan, a real friendship and amity between the people of these two nations would remain a mirage. That is the reason for which the Pakistani delegate Dr. Abdul Karimn Naik quoted Upanishad and said that, only the message of the Upanishads are capable of removing discriminations among the human race created on the basis of religion and nationality. Only Upanishads consider the entire humanity as a family and every person living in this world as a member of the world family.

In this present context, it would be relevent to quote what the Pakistani Journalist Zafar Adeen says in this regard. He writes, "We have never been able to understand that, if 50 years were not sufficient to make Pakistan fit for receving a perfect Islamic system, then where was the need to create it all? If the Islamic system cannot be enforced, then why not we go back to the original system, the united India? There is still a heart-warming and soul-stirring call coming from across the borders devoid of any sectarian heat. The great land of India is a wonderful gift of God, made fertile and creatrive by nature in every respect. It is a cradle of a variety of religious and beliefs and a shinning example of unity in deversity which our Mumalkat-e-Khudad lacks" (organiser: 18.1.98). A real frienship and amity between the people of Pakistan and India would be establish only when the people of Pakistan gather under the banner of Zafar Adeem.

(The author is the Professor, Dept. of Applied Physics, University of Calcutta)

(Islamic voice, (Bangalore), March, 1999.)